বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা

— এস.এম.লুৎফর রহমান

বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/জুন ২০০৩

বাএ ৪৩৬০

[২০০২-২০০৩ গসফো : ফোকলোর ৯]

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মূল্য : ২২০.০০

BANGLADESHI LOKOCHIKITSHA [Folk Medicine of Bangladesh] by Dr. S. M. Lutfor Rahman. Published by Muhammad Seraj Uddin, Director (incharge), Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition : June 2003. Price : Taka 220.00 Only. US $ 5

ISBN 984-07-4369-4

লোক-চিকিৎসার মাধ্যমে

শৈশব-কৈশোরের পরিচর্যাকারী

আমার নানী-আম্মার

স্মৃতি-স্মরণে

ভূমিকা

মূলতঃ বৃহত্তর যশোর জেলাকে কেন্দ্র ক'রেই এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয় ১৯৮১ সালে। আজও অপ্রকাশিত এ-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বাংলাদেশে ও ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় রচিত 'লোক-চিকিৎসা' সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির ওপর বিস্তৃত আলোকপাত করা হ'য়েছে। ঐ সব গ্রন্থে 'লোক-চিকিৎসা' সম্বন্ধে কি ধরনের আলোচনা করা হ'য়েছে, তারও পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। সেই সঙ্গে সে-সব রচনার অপূর্ণতার কথা তুলে ধরা হ'য়েছে। তারপর বলা হ'য়েছে—বর্তমান গ্রন্থ-রচনার দৃষ্টিভঙ্গির কথা।

'উপক্রমণিকা' সমাপ্তির, পর গ্রন্থটির তিনভাগ-এর প্রথম ভাগে 'চিকিৎসার ইতিহাস' আলোচিত। এ-আলোচনা তিনটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে—বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির ইতিহাস-এর পরিপ্রেক্ষিতে 'লোক-চিকিৎসা'র ইতিহাস সন্ধান করা হ'য়েছে। সেজন্য 'আয়ুর্বেদী চিকিৎসা', 'হেকিমী চিকিৎসা', 'অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা' ও 'বায়োকেমিক চিকিৎসা'র ইতিহাস আলোচনার পর—'লোক-চিকিৎসা'র ইতিহাস নির্মাণ করা হ'য়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেকটি বিশিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতির ইতিহাসের মত 'লোক-চিকিৎসা'রও সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। যদিও কেউ তা এ-পর্যন্ত লেখার প্রয়াস পাননি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হ'য়েছে—"বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসক" সম্পর্কে। বাংলাদেশে লোক-চিকিৎসার যে-ঐতিহ্য, সমাজে ও সাহিত্যে বিদ্যমান তা' আলোচনা করার পর—এদেশের লোক-চিকিৎসকদের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। ঐ সব লোক-চিকিৎসকের মধ্যে আছেন—'গুণীন', 'ওঝা', 'বদ্যি', 'হাকিম', 'দাই', 'ফকীর', 'পীর', 'দরবেশ', 'সন্ন্যাসী', 'পুরোহিত' প্রভৃতি। বিভিন্ন স্থানে দরগা, আখড়া, পীরবাড়ী ইত্যাদির পরিচয় দেবার জন্য এগুলো সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম লোক-চিকিৎসক ভেদে, আলাদা আলাদা আলোচনা করা হ'য়েছে। মূলতঃ পূর্বতন বৃহত্তর যশোর জেলা-ভিত্তিক আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধান সীমিত থাকায় ঐ জেলার বিভিন্ন মুসলিম লোক-চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং হিন্দু লোক-চিকিৎসা-কেন্দ্রের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। তারপর আলোচনা করা হ'য়েছে, ঐ জেলার 'মুসলিম লোক-চিকিৎসক' ও 'হিন্দু-লোক-চিকিৎসক'দের কিছু সংখ্যকের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং জীবন-জীবিকার কথা।

এই ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হ'য়েছে—বিশ্বব্যাপী বর্তমানে লোক-চিকিৎসার প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—তার কথা। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে লোক-চিকিৎসার কি অবস্থা বিরাজ ক'রছে—তাও আলোচনা করা হ'য়েছে। আলোচ্য অংশে আফ্রিকার লোক-চিকিৎসা, অস্ট্রেলিয়ার লোক-চিকিৎসা, আমেরিকার লোক-চিকিৎসা, ইউরোপীয় (তুর্কী) লোক-চিকিৎসা, এশীয় (চৈনিক) লোক-চিকিৎসা, ভারতীয় লোক-চিকিৎসা ও বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে।

অতঃপর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ-এ "চিকিৎসা-বিজ্ঞান" সম্পর্কীয় আলোচনায় বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে 'লৌকিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান'-এর বৈজ্ঞানিক রূপটি কি রকম—তা ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির আলোকে "লোক-চিকিৎসা-পরিচয়"-এর এ-আলোচনায় "রোগ-বিজ্ঞান", "ঔষধ-বিজ্ঞান" ও "চিকিৎসা-বিজ্ঞান" সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। এ-অংশে তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখানো হ'য়েছে যে, অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতই লোক-চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও আছে 'রোগ ও স্বাস্থ্য' সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য। রোগের উৎপত্তি বা কারণ সম্পর্কে লোক-চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের মতই একটি স্বতন্ত্র ধারণার বশবর্তী। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের মতই লোক-চিকিৎসকও বিভিন্ন রোগীর নানাবিধ রোগের নির্দিষ্ট কারণ এবং নিদর্শন সন্ধান করেন। তাঁরা 'ডায়াগনোসিস' বা রোগ-নিরূপণ এবং 'প্রোগনোসিস' বা রোগের অবশ্যম্ভাবী গতি-পরিণতি সম্পর্কেও ধারণা ক'রে থাকেন। রোগের শ্রেণীগত বিবরণও দিতে পারেন লোক-চিকিৎসক। আর এই সব মিলিয়ে লোক-চিকিৎসক পরিচালিত হন—একটি বিশেষ চিকিৎসা-দর্শন অনুযায়ী। তার সঙ্গে অন্য মতের চিকিৎসা-পদ্ধতির আদৌ কোন ঐক্য নেই সত্য, কিন্তু যত আদিম এবং অপূর্ণই হোক, লোক-চিকিৎসকের 'রোগ-বিজ্ঞান' সম্পর্কীয় মতামতকে উপেক্ষা করা যেতে পারে, অশ্রদ্ধা করা যাবে না।

লোক-চিকিৎসার 'ঔষধ-বিজ্ঞান'-বিষয়ক পরবর্তী আলোচনাংশে অন্যান্য পদ্ধতির চিকিৎসার মতই এই চিকিৎসাও যে, বনরাজ্য, প্রাণীরাজ্য, মণিকরাজ্য এবং কারখানাজাত ঔষধ ব্যবহার করে, তা আলোচনা করা হ'য়েছে। ওষুধের শ্রেণী-বিভাগ সাপেক্ষে বিনা যন্ত্রপাতি ও সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত ওষুধেরও বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে।

অতঃপর আলোচনা করা হ'য়েছে—'চিকিৎসা-বিজ্ঞান' তথা 'লৌকিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান' সম্পর্কে। এ অংশে লোক-চিকিৎসক প্রদত্ত ওষুধ-প্রয়োগের-রীতির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। বিশেষতঃ লোক-ঔষধের মাত্রা নিরূপণ, তার ব্যবহার-বিধি, পুনঃপ্রয়োগের কাল-ব্যবধান, ঔষধের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য, বিষ-চিকিৎসা এবং খুব-ই সীমিত অর্থে লৌকিক অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে—ঔষধের 'প্রয়োগ ফল' সম্পর্কেও। আর এখানেই সমাপ্ত হ'য়েছে চতুর্থ অধ্যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ-এ দেওয়া হ'য়েছে রোগানুযায়ী ওষুধের বিবরণ। তাই এটিকে বলা হয়েছে 'ঔষধকোষ'। আলোচ্য ভাগের অন্তর্ভুক্ত গোটা পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বমোট একশ' রকম রোগের বিভিন্ন ধরনের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। ঐ সব ওষুধের প্রয়োগ-ফল আমি নিজে পরীক্ষা ক'রেছি এবং অন্য যারা ওগুলো ব্যবহার ক'রে নিরাময় ফল লাভ ক'রেছেন—সে সব ওষুধের বিবরণের নিম্নে 'পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ' ব'লে মন্তব্য করা হ'য়েছে। আর যেগুলো পরীক্ষা করা হয়নি, সেগুলোর শুধু বিবরণদান করা হ'য়েছে। এসব চিকিৎসা-উপকরণের (ওষুধের) মধ্যে র'য়েছে মন্ত্র, লতা-গুল্ম, শিকড়-বাকড়, পাতা, ফুল, নির্যাস, জাব, চুন, লোহা, তামা প্রভৃতি।

সর্বশেষে পরিশিষ্ট যোজনা করা হ'য়েছে। উক্ত পরিশিষ্টে বর্তমান গ্রন্থে যে-সব গাছ-গাছড়া ও লতা-গুল্মাদির উল্লেখ করা হ'য়েছে—সেগুলোর লৌকিক নাম, সাহিত্যোধৃত নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম (গোত্র-পরিচয় সহ) প্রদত্ত হ'য়েছে।

অতঃপর 'গ্রন্থ-পঞ্জী' সংযোজিত হ'য়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য-নির্ভরভাবে লোক-চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হ'য়েছে।

তারপর বলা দরকার যে, ১৯৮১ সালে "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন" এর অর্থায়নে আমি এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন করি। 'কমিশন' থেকে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়। এজন্য আমি কমিশনের তৎকালীন সকল কর্মকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আলোচ্য গ্রন্থের শেষ ভাগে লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত গাছ-গাছালির ছবি তুলে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ জনাব আবদুর রশীদ (গ্রাম—গোয়ালখালি, ডাকঘর—ছান্দড়া, জেলা—মাগুরা)। আর সরে জমিনে গাছগাছালি চিনতে সহায়তা দিয়েছেন কবিরাজ শ্রী কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস (গ্রাম—পাথর ঘাটা, ডাকঘর—ছান্দড়া, জেলা—মাগুরা)।

এ-গ্রন্থের বানানের দিকে সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তাহ'ল—"বাঙলাদেশ" শব্দের বানান "বাংলাদেশ" করা হ'য়েছে—"বাংলা একাডেমী"র সাথে মিল রাখার প্রয়োজনে। আমি নিজে এ বানানকে ভুল ব'লে মনে করি। এছাড়া এ-গ্রন্থে অধুনা-উপেক্ষিত 'উপরি কমা' ও হাইফেন প্রচুর ব্যবহার করা হ'য়েছে—উচ্চারণ ঠিক রাখার প্রয়োজনে। যেমন—"করে" এবং "কোরে"। দ্বিতীয় রূপটি বোঝাতে কো না দিয়ে ক-এর পরে, একটি উপরি কমা বসিয়ে 'কো' ('ক') নির্দেশ করা হ'য়েছে। এক-ই ভাবে হ'য়ে, ধ'রে, স'রে, ম'রে শব্দে উপরি কমার ব্যবহার দেখা যাবে।

আলোচ্য গ্রন্থের বাক্য-লেখনে হাইফেন ও ড্যাস-এর পার্থক্যও দেখানো হ'য়েছে। হাইফেন-এর আকার ছোট, ড্যাসের আকার বড়। হাইফেন যে-দুটো বা তিনটে শব্দের মাঝে এক বা দু'বার ব্যবহার করা হ'য়েছে, সেদু'টো বা তিনটে শব্দকে এক শব্দ ব'লে গণ্য ক'রতে হবে এবং সে-ভাবেই প'ড়তে হবে। তাহ'লে উচ্চারণ ও অর্থ-বোধ ঠিক থাকবে অন্যান্য বানানের ক্ষেত্রে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-রীতি অনুসরণ করা হ'য়েছে।

গ্রন্থখানি প্রকাশ, মুদ্রণ ও চিত্র-সংযোগে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার জন্য বিশেষ সহযোগিতা দিয়েছেন—বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপ-বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব শফিুকর রহমান চৌধুরী। এছাড়া সহযোগিতা দিয়েছেন 'গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগে'র পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মহোদয় আমার সহকর্মী অধ্যাপক মনসুর মুসা এ-গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা দানের জন্য তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির প্রুফ-সংশোধনে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মিস অনুপা পারভীন, সেজ কন্যা মিস শুক্তি জেস্‌মিন এবং স্নেহাস্পদ ছাত্র আফজাল হোসেন রতনের অবদানও অনেক।

এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা পৃষ্ঠা ১–১৯

প্রথম ভাগ
চিকিৎসার ইতিহাস
(The History of Medicine)

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্নচিকিৎসা-পদ্ধতির ইতিহাস ও লোক-চিকিৎসা : পৃষ্ঠা ২৩–৮৪

আয়ুর্বেদী চিকিৎসা—হেকিমী চিকিৎসা—অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—বায়োকেমিক চিকিৎসা—লোক-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৮৫–১০৯

বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসক।

বাংলাদেশে লোক-চিকিৎসার ঐতিহ্য—লোক-চিকিৎসক :
গুণীন—ওঝা—বদ্দি—হাজাম—দাই—ফকীর—পীর—দরবেশ—
সন্ন্যাসী—পুরোহিত। যশোর জেলার লোক-চিকিৎসা-কেন্দ্র :
মুসলিম লোক-চিকিৎসা কেন্দ্র—হিন্দু লোক-চিকিৎসা-কেন্দ্র।
যশোর জেলার লোক-চিকিৎসক : মুসলিম লোক-চিকিৎসক—হিন্দু লোক-চিকিৎসক।

তৃতীয় অধ্যায়

লোক-চিকিৎসার প্রতি বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি : পৃষ্ঠা ১১০–১৩১

বিভিন্ন দেশে লোক-চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা : আফ্রিকার লোক-চিকিৎসা—অস্ট্রেলিয়ার লোক-চিকিৎসা—আমেরিকার লোক-চিকিৎসা—ইউরোপীয় (তুর্কী) লোক-চিকিৎসা—এশীয় (চৈনিক) লোক-চিকিৎসা—ভারতীয় লোক-চিকিৎসা—বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ
চিকিৎসা-বিজ্ঞান
(The Science of Medicine)

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির আলোকে লোক-চিকিৎসার পরিচয় : পৃষ্ঠা ১৩৫–১৭৯

রোগ-বিজ্ঞান : রোগ ও স্বাস্থ্য—রোগ, দেহ, মন ও তাদের সম্পর্ক—রোগের উৎপত্তি বা কারণ—রোগের নিদর্শন—রোগ নিরূপণ—রোগের শ্রেণীগত বিবরণ—চিকিৎসা-দর্শন।

ঔষধ-বিজ্ঞান : ঔষধের উৎস—বনরাজ্য—প্রাণী রাজ্য—মণিক রাজ্য—কারখানাজাত ঔষধ—ঔষধের শ্রেণী-বিভাগ—বিনা যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ; সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান : ঔষধ-প্রয়োগ রীতি—ঔষধের প্রয়োগ ফল।

তৃতীয় ভাগ
ঔষধ-কোষ
(The Materia Medica)

পঞ্চম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৮৩–২৭২

ভূমিকা। অগ্নিদগ্ধ—অঞ্জনি—অরুচি—অর্শ—আমাশয়—আমবাত—আঞ্জনি—আঁচিল—অ্যাড়া বিষ—উঁকুন—উদরাময়—কান-পাকা—কান-ব্যথা—কানের মধ্যে শব্দ—কানে কম শোনা—কাঁটা সরানো—কাশি—কোমরে বেদনা—কোষ্ঠবদ্ধতা—কলেরা—কেটে যাওয়া—কৃমি—গরম লাগা—গরল লাগা—গর্ভপাতরোধ—গর্ভমোচন—গলা ফোলা—গর্মী বা গরমাই—গোঁদ—'ঘা' বা ক্ষত—চক্ষুরোগ—চর্মরোগ—চুলকানি—চোঁয়াল ফোলা—জণ্ডিস বা কামোল—জ্বর—জোঁক লাগা—জিয়ল মাছের কাঁটার আঘাত—টিকা—ঠোঁট ফাঁটা—দাদ—দাঁতের পোকা—দাঁতের যন্ত্রণা—ধাতু-দুর্বলতা—নিউমোনিয়া—পক্ষাঘাত—পাঁকুই—পাঁচড়া—পাথরী—পিত্তপ্রকোপ—পিপাসা-নিবারণ—পেটের পীড়া—পোকা-মাকড়ের কামড়—প্রদর—প্রমেহ—প্রস্রাব বন্ধ—ফিট—ফোলা—ফোঁড়া—বমন—বমি বমি ভাব—বসন্ত—বহুমূত্র—ব্রণ—বাত—বাতাস লাগা—বাণ ফেরানো—ব্যথা-বেদনা—বিছানায় প্রস্রাব—বুকের দুধ বৃদ্ধি—বাধক বেদনা—বুকের দোষ— মচ্‌কা—ভাঙা—মাথার চুল ওঠা—মাথার যন্ত্রণা—মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্রপাথরী—মূত্রশূল—রজঃস্রাব—রক্তপড়া নিবারণ—রক্তপিত্ত—রক্তপ্রস্রাব—রক্তভাঙা—রক্তশূন্যতা—রক্তাতিসার—শোথরোগ—শূলবেদনা—শ্লেষ্মানিবারণ—সর্দিকাশি—সর্পদংশন—স্বপ্নদোষ—সান্নিক—সূতিকা—স্বপ্নে খাওয়া—স্তন্য প্রদাহ—স্ত্রীরোগ—হজম শক্তি-বৃদ্ধি—হাঁফানি—হামজ্বর—হাড় ভাঙা।

বর্তমান গ্রন্থ-ধৃত ঔষধির বৈজ্ঞানিক নাম-পরিচয় পৃষ্ঠা ২৭৩–২৮৬

গ্রন্থপঞ্জী পৃষ্ঠা ২৮৭–২৯৩

শুদ্ধি-পত্র পৃষ্ঠা ২৯৪

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। ইংরেজি ভাষাতেও নয়। তবে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাংলায় লোক-চিকিৎসার নানা আংশিক বিবরণ, নানা নামে, নানা ভাবে—বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। তার অধিকাংশই লোক-চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, লোক-চিকিৎসার দিকে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য নয়, বরং লোক-জীবনের কুসংস্কারমূলক প্রবণতার পরিচয় হিসেবে লোক-চিকিৎসাকে পরিচিহ্নিত ক'রার উদ্দেশ্যে লিখিত। তাই ঐ সব আলোচনা সাধারণতঃ 'লোক-ঔষধ', 'টোটকা চিকিৎসা', 'বনৌষধি', 'গাছ-গাছড়ার চিকিৎসা', 'তাবিজ-কবচ', 'মন্তর-তন্তর', 'সাপালি-ভূতালি-ওঝালি', ইত্যাদি শিরোনাম কিংবা উপশিরোনামে চিহ্নিত। তাছাড়া কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ নয়।

(১)

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে যে সব আলোচনা প্রকাশিত হ'য়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত লোকসাহিত্য নামক সংকলনের উল্লেখ ক'রা আবশ্যক। আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থ-মালার ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ খণ্ডে লোক-চিকিৎসামূলক উপাদান সন্নিবেশিত হ'য়েছে।"[১]

'লোক-সাহিত্য' ত্রয়োদশ-খণ্ড 'মন্ত্র' নামে নির্দেশিত। অর্থাৎ এটি শুধু 'মন্ত্রে'র-ই সংকলন। এ সংকলনে ঢাকা, রংপুর, মোমেনশাহী, সিলেট, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ক সর্বমোট তিন'শ ছাপ্পান্নটি মন্ত্র সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ ক'রা হ'য়েছে। তার মধ্যে রোগ-চিকিৎসামূলক মন্ত্রও বিদ্যমান। ঐসব মন্ত্র যে যে রোগে ব্যবহার্য—তা হ'ল কু-নজর, চোখের রোগ, গলায় ব্যথা, গলায় (মাছের) কাঁটা আটকানো, গা ফোলা, গা ব্যথা, গায়ের বিষ ঝাড়া, পেট ব্যথা, ভূত-পেত্নীর আছর, বাওলাগা, বাণ ফিরানো, বিষ ঝাড়া, ভয় নিবারণ, সর্প দংশন, শিশুরোগ, মাথাধরা, কীট-পতংগের দংশন, বিছের হুল লাগা, শিয়াল-কুকুরের দংশন, সুতিকা, প্রসব-কষ্ট, অতিসার, একশিরা, জ্বর, ফোড়া, বিষলাগা, বাধক বেদনা, শিং মাছের বিষ, হাড়মচ্‌কা ও হাঁপানি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক সাহেব যেহেতু মন্ত্রে'র-ই নমুনা উপস্থাপন ক'রতে চেয়েছেন—লোক-চিকিৎসার পরিচয় যথাযথভাবে পরিচিহ্নিত ক'রার প্রয়োজনবোধ ক'রেননি, সেজন্য নির্দিষ্ট রূপে প্রায় কোন মন্ত্রের-ই সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ-রীতি, আনুষঙ্গিক বিধি ও পালনীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ

ক'রেননি। ভূমিকায় তিনি মন্ত্র-ব্যবহারের সাধারণ চারিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে কিছু কিছু বিধি-বিধানের উল্লেখ ক'রলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অপর্যাপ্ত। যেমন 'নবজাত শিশুর দুধ খাওয়াবার মন্ত্রে'র ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বদিউজ্জামান সাহেব লিখেছেন—"সর্ষের তেল মন্ত্রপূত ক'রে শিশুর সমস্ত গায়ে-পায়ে মালিশ ক'রলে শিশু ভালভাবে দুধ খায়।[২]" এক্ষেত্রে মন্ত্রটি ক'বার পড়ে সর্ষের তেলে ক'টা ফুঁ দিতে হবে, সেকথা বলা হয়নি। ফলে এসব মন্ত্র দিয়ে কিভাবে চিকিৎসা ক'রা হয়—সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ ক'রা যায় না।

'লোক-সাহিত্য' সপ্তদশ খণ্ড সম্পাদনা ক'রেছেন জনাব আলমগীর জলিল ও জনাব সামীযুল ইসলাম। খণ্ডটি—'লোক-সংস্কার : রোগের উৎপত্তি ও লোক-চিকিৎসা' নামে চিহ্নিত। নাম থেকেই স্পষ্ট—সম্পাদকদ্বয়ের নিকট লোক-চিকিৎসা 'তুচ্ছ সংস্কার' মাত্র। আলোচ্য খণ্ডের 'প্রসঙ্গকথা'য় একাডেমীর মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী স্পষ্টই এগুলোকে 'লোক-বিশ্বাস' ব'লে অভিহিত ক'রেছেন।"[৩] একথা অস্বীকার ক'রা যায়না যে, লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার ও বিশ্বাসের স্থান অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু সেটাই লোক-চিকিৎসার কিংবা লোকৌষধের সমগ্র পরিচয় নয়। এমনকি লোক-চিকিৎসার মধ্যে এমন কতক উপাদান আছে—যা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিচারে অর্থহীন, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত, কার্যকারণ সম্পর্করহিত, অব্যাখ্যেয় ও অবাস্তব ব'লে মনে হ'লেও স্পষ্টত ফলদায়ক। কাজেই সমস্ত লোক-বিশ্বাসকে ঢালাওভাবে কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যে অযৌক্তিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোক-চিকিৎসার প্রতি অপ্রসন্ন মনোভাব ও খণ্ডিত এবং অসম্যক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আলোচ্য খণ্ডটির তিরাশী পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংখ্যক লোক-চিকিৎসার উপাদান সন্নিবেশিত হ'য়েছে। বাকি আর যা কিছু মুদ্রিত হ'য়েছে—তা সবই অপ্রাসঙ্গিক লোকাচার বা লোক-বিশ্বাস মাত্র। বস্তুত আচার-আচরণমূলক লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে রোগোৎপত্তিমূলক লোক-বিশ্বাসের পার্থক্য ক'রতে অসমর্থ হওয়ার জন্যই এরূপ হ'য়েছে।"[৪]

'লোক-সাহিত্য' সপ্তদশ খণ্ডের পূর্বোক্ত উনিশ পৃষ্ঠায় গাছ-গাছড়া ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসাযোগ্য যেসব রোগের নিরাময়-বিধি বর্ণিত হ'য়েছে সেগুলোর মধ্যে আমাশয়, ক্রিমি, ললার রোগ, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, উদরাময়, বমি, বসন্ত, বহুমূত্র, বাত, ব্রণ, বাগী, মৃগী, বিছানায় প্রস্রাব, রক্তপাত, শোথ, শ্বেতি, সর্দি, স্তন-প্রদাহ, হাড়ভাঙ্গা, হাঁপানি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য সংকলনে লোক-চিকিৎসার অন্যতম অপরিহার্য অবলম্বন মন্ত্রের কোন উল্লেখই ক'রা হয়নি। অথচ লোক-জীবনে, লোক-চিকিৎসার বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে নানাবিধ মন্ত্রের ব্যবহার এখনও সুপরিজ্ঞাত।

সম্পাদকগণের উল্লেখ থেকে জানা যায়, প্রধানত: গাছ-গাছড়া ভিত্তিক মুদ্রিত উপাদানগুলো সংগৃহীত হ'য়েছে-পাবনা, নোয়াখালী, রংপুর, সিলেট ও ঢাকা থেকে। সংকলনটির প্রথমাংশে 'রোগের উৎপত্তি' শীর্ষক যে-সব তথ্য উপস্থাপন ক'রা হ'য়েছে—তার

অধিকাংশই রোগ-কেন্দ্রিক আচার-আচরণমূলক লোক-বিশ্বাস বা লোক-সংস্কার মাত্র ; এর সঙ্গে ব্যাধির উৎপত্তি ও তা' নিরাময়ে লোক-চিকিৎসার কোন সম্পর্ক প্রায় নেই ব'ললেই চ'লে। কেননা ঐসব বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে লৌকিক চিকিৎসকের বক্তব্যের পার্থক্য র'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এ-সংকলনে ধৃত চতুর্দশ সংখ্যক 'রোগের উৎপত্তি বিষয়ক' লোক-বিশ্বাসটির উল্লেখ ক'রা যায়। পাবনা থেকে সংগৃহীত এই উপকরণটিতে বলা হ'য়েছে—"সন্ধ্যার সুমায় কুত্তায় কানলে কলেরা আসে।"[৫] অর্থাৎ উক্ত বক্তব্য অনুযারী কুকুরের ক্রন্দন-ই কলেরা রূপ মহামারীর উৎস। কিন্তু কে না জানে যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, এদেশের সাধারণ মানুষের নিকট কলেরা রোগের কারণ কুকুরের ক্রন্দন নয়, বরং 'ওলা দেবী বা ওলী বিবি'? সাধারণ মানুষ তাই কলেরা রোগ নিরোধের জন্য গ্রামবন্ধ দেয়, দোয়া-তাবিজ ধারণ ক'রে কিংবা হিন্দু হলে পূজো দেয়। কেউ-ই কুকুরকে পূজোও দিতে যায় না। তার গলায় দোয়া-তাবিজও বাঁধেনা। কিংবা কুকুরকে মহামারীর সময় পিটিয়েও গ্রাম-ছাড়া ক'রে না। অতএব ঐটি দৈব-দুর্ঘটনা বিষয়ক লোক-বিশ্বাস মাত্র। উক্ত বিশ্বাসটির লিখিত রূপ-এরকম হওয়া উচিত ছিল—

'সন্ধ্যের সুমায় কুহুর কান্দা (কাঁদা) খারাপ। কলেরা অয়', ব'লে লোক-বিশ্বাস।"[৬] অথবা তা' যে-কোন রকম দৈব-দুর্বিপাক আসার পূর্ব-সংকেত। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।"[৭]

বস্তুতঃ' চিকিৎসা-কেন্দ্রিক লোক-বিস্বাস সর্বদাই কোননা-কোন রূপ কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই যে রোগের কারণ হিসেবে যে বস্তুর প্রতি লোক-মানসের স্বীকৃতি ও ভীতি থাকে—রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে বা রোগাক্রান্ত হ'লে—তারা সেই বস্তুকে সন্তুষ্ট, বশীভূত কিংবা দূরীভূত ক'রার প্রয়াস পায়। দৈব দুর্ঘটনা বিষয়ক কিংবা আচার-আচরণমূলক লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা কেন্দ্রিক লোক-বিশ্বাসের এখানেই পার্থক্য।

কিন্তু উক্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতন না থাকায়, আলমগীর জলিল ও সামীয়ুল ইসলাম-সম্পাদিত এখণ্ডে, লোক-চিকিৎসার সমগ্ররূপ পরিচিহ্নিত হ'তে পারেনি। লোকৌষধের নানা বৈচিত্র্য সম্পর্কেও এ সংকলন থেকে বিশেষ কোন ধারণা জন্মে না। এমনকি বিবৃত চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধ-প্রয়োগ-রীতি, আনুষঙ্গিক বিধি কিংবা পালনীয় নিয়মাবলী সম্পর্কেও কোন কিছু উল্লেখ ক'রা হয়নি। ফলে এ সংকলনের সাহায্যে বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসার যথার্থ পরিচয় লাভ ক'রা যায়না। সংগৃহীত উপাদানও সুবিন্যস্ত নয়।

অতঃপর ড: আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক-সাহিত্য', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা ক'রা আবশ্যক। ড: সিদ্দিকীর এই গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'মন্ত্র' সম্পর্কীয় আলোচনায় সর্প-দংশন চিকিৎসার দু'একটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র ; লোক-চিকিৎসার কোন বিবরণ নেই।"[৭]

কিন্তু তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'লোক-ঔষধ' সম্বন্ধে একটি সুবিস্তৃত অধ্যায় সংযোজিত হ'য়েছে। উক্ত অধ্যায়ে তিনি লোক-চিকিৎসার প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা ক'রেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথাও ব'লেছেন। কিন্তু একটি স্বতন্ত্র

চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে লোক-চিকিৎসাকে তিনি পরিচিহ্নিত ক'রেননি। তিনি চোখ ওঠা, পেট ফাঁপা, ক্রিমি, সর্দি, চষীপোকা, দুধতোলা, দাঁতওঠা, উদরাময়, আমাশয়, হিক্কা ও বমি, প্রস্রাববন্ধ, লালপড়া, নাভিক্ষত, হাত-পা কাটা, ঘামাচি, মুখে ঘা, কাশি, ইত্যাদি বহুরকম রোগ ও তার ওষুধের উল্লেখ ক'রেছেন।"[৮] কিন্তু ঐসব রোগের নিদান বা 'হেতু', রোগ নিরূপণ, নিরাময় ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্যাদি উপস্থাপন ক'রেননি। ওষুধের মাত্রা, সেবনকাল, সেবনবিধি এবং তার সঙ্গে পালনীয় নিয়মাদিও তিনি সামান্যই উল্লেখ ক'রেছেন। তাছাড়া লোক-চিকিৎসার প্রকরণগত বৈচিত্র্যেরও তিনি কোন আলোচনা ক'রেননি। অধিকন্তু তাঁর বিবৃত গাছ-গাছড়া কেন্দ্রিক ওষুধের ও অনেকাংশই লোকৌষধ নয়, কবিরাজি ওষুধ মাত্র। পড়লে বোঝা যায়, ঐ সব বিবরণে অধিকাংশই লোক মুখ থেকে সংগৃহীত নয়, কবিরাজি চটি বই থেকে চিত্র। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসারও কিছু কিছু উপাদান—যেমন সাপের বিষের সিরাপ, পেট্রোল, স্পিরিট', অ্যামোনিয়া, পটাশ পারমাঙ্গানেট, অলিভওয়েল, সার্জিক্যাল স্পিরিট, ইত্যাদি ব্যবহারের কথাও তিনি লোক-চিকিৎসার প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ ক'রেছেন। অথচ এগুলো যে আদৌ লোক-চিকিৎসার উপকরণ নয়-তা' বলাই বাহুল্য। এজন্য ড: সিদ্দিকীর এ গ্রন্থে লোক-চিকিৎসার সমগ্র রূপের পরিচয় তো পাওয়াই যায়না, এমনকি, তাঁর বিবৃত রূপটি সর্বাংশে লৌকিক নয়, তিনি দেশীয় কবিরাজী চিকিৎসার সঙ্গে লোক-চিকিৎসার পার্থক্যও চিহ্নিত ক'রতে সমর্থ হননি।

বাংলাদেশের অপর লোক-সাহিত্যবিদ্ ড: ওয়াকিল আহমদ-এর গবেষণা-গ্রন্থ 'বাংলার লোক-সংস্কৃতিতেও 'লোকাচার' প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়-এ 'ব্যাধি ও মৃত্যু' উপশিরোনামে এবং সপ্তম অধ্যায়ে 'লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' শিরোনামে লোক-চিকিৎসা সম্পর্কীয় কিছু কিছু উপাদান আলোচিত হ'য়েছে। ড: আহমদ যেহেতু 'লোকাচার', 'লোক-বিশ্বাস' ও 'লোক-সংস্কারে'রই পরিচয় তুলে ধ'রতে চেয়েছেন—'লোক-চিকিৎসা'র নয় ; সেজন্য এ—গ্রন্থ থেকেও লোক-চিকিৎসার পদ্ধতিগত কোন বিশেষ পরিচয় লাভ ক'রা যায় না। তবে তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নানাবিধ মন্ত্রের এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছেন। একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে লোক-চিকিৎসা এ-গ্রন্থেও আত্মপরিচয় দিতে পারেনি কিংবা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিচিহ্নিত ক'রতে পারেনি। জনাব ওয়াকিল আহমদ দাঁতের ব্যথা, গলায় ব্যথা, চোখের টুসি পোকা, আধ-কপালী মাথা ব্যথা, সেপ্‌টিক বা তেল বিষ, কুকুর দংশন, প্লীহা, প্রসব-কস্ট ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চোরধরা, নারী বশীকরণ, পুরুষ বশীকরণ, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বশীকরণ, বাণমারা ইত্যাদি রোগের (?) ও লোকৌষধের উল্লেখ ক'রেছেন।"[৯] স্পষ্টতই একমাত্র রোগ-নিরাময়ে লোক-চিকিৎসার স্বরূপ নির্দেশের প্রতি তাঁর দৃষ্টি না থাকায় এ-গ্রন্থ থেকে লোক-চিকিৎসার সমগ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২)

বাংলাদেশে প্রবন্ধাদি মারফত বাংলা ভাষার লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে যেসব আলোচনা বিদ্যমান—সেগুলোও একই রকম অপূর্ণ ও একদেশদর্শী। এ সবের মধ্যে ১৯৭৪ সালের

নভেম্বর মাসে, মাসিক 'পূর্বাচল' পত্রিকায় প্রকাশিত এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম-লিখিত "ফইকরালী ঝাড়-ফোঁক" শীর্ষক রচনাটির নাম উল্লেখযোগ্য। শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট, লেখক লোক-চিকিৎসার সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ না ক'রে তার একটি অংশের মাত্র পরিচয় দিতে চেয়েছেন। 'লোক-চিকিৎসাকে, কেউ কেউ 'ফকিরী চিকিৎসা'ও ব'লে থাকেন এবং ঝাড়-ফুঁক লোক-চিকিৎসার একটি অঙ্গ বটে ; কিন্তু এটুকুই সব নয়। ঝাড়-ফুঁক ছাড়া, লোক-চিকিৎসার আরও অনেক উপায় র'য়েছে। কিন্তু জনাব সামীয়ুল ইসলাম সে সবের কোন উল্লেখ ক'রেননি। তিনি তাঁর প্রবন্ধে লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধু মন্ত্রের ওপর-ই অধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন এবং 'সর্প-দংশন', 'স্তন-প্রদাহ', 'প্রসব', 'শিশুদের ক্রন্দন', 'ভাংগা-মচ্‌কা', 'ব্যথা', 'বিছা লাগা', 'চোখে ধূলিপড়া' ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত কতিপয় মন্ত্রের উল্লেখ ক'রেছেন। লেখক 'বশীকরণ', 'চোরবন্ধ', 'মৌমাছি বন্ধ' প্রভৃতি বিষয়ক মন্ত্রেরও পরিচয় দিয়েছেন।[১০] কিন্তু সে সব, লোক-চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া ঝাড়-ফুঁকের প্রতিই অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ থাকায়, লোক-চিকিৎসার সমগ্র রূপেরও কোন পরিচয় তিনি দিতে সমর্থ হননি।

উক্ত লেখকের আর একটি প্রবন্ধ "লোক-বিশ্বাস একদিকে আইন অন্যদিকে সুষ্ঠু জীবন যাত্রার প্রতীক"-এর মধ্যেও লোক-চিকিৎসার সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত, এ প্রবন্ধে জনাব সামীয়ুল ইসলাম লোক-চিকিৎসাকে 'লোক-বিশ্বাস' ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। লিখেছেন—"স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার ক'রাই ছিল অবৈজ্ঞানিক যুগের (?) ডাক্তার বা কবিরাজদের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তারা নানাবিধ চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার ক'রে। তাদের আবিষ্কৃত সেই চিকিৎসা প্রণালীগুলোই বর্তমানে লোক-চিকিৎসা নামক লোক-বিশ্বাসে পরিণত হ'য়েছে।'[১১] উল্লেখযোগ্য যে, আদিম যুগের লোক-চিকিৎসকরা, ডাক্তার বা কবিরাজ নন। সাধারণত: হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক ও বায়োকেমিক মতের চিকিৎসকদের ডাক্তার বলা হয় ; আয়ুর্বেদী পন্থায় চিকিৎসাকারীরা কবিরাজ বা বৈদ্য নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট লোক-চিকিৎসকদের বলা হয়—পীর, ফকীর, ওঝা, গুণীন ইত্যাদি। অঞ্চল বিশেষে এসব নামের বিভিন্নতাও আছে। 'লোক-চিকিৎসা'—"নানাবিধ চিকিৎসা প্রণালীর সমাহার"ও নয়। বরং লোক-চিকিৎসা একটি বিশেষ প্রণালীর চিকিৎসা এবং তার পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য আছে। যেমন আছে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার নানা শাখাপ্রশাখা ও বৈচিত্র্য। তৃতীয়ত লোক-চিকিৎসা'ও 'লোক-বিশ্বাস' যে অভিন্ন নয়, সেকথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। 'লোক-চিকিৎসাকে তাই 'লোক-বিশ্বাস' নির্দেশ ক'রা অসঙ্গত। লোক-চিকিৎসার একটি বিশেষ শাখা দৈবী চিকিৎসার ক্ষেত্রেই মাত্র এর পূর্ণ পরিচয় লাভ ক'রা যায় ; অন্যত্র নয়।

বস্তুত: লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে লেখকের সম্যক ধারণা না থাকায় তিনি লিখেছেন—"কি ক'রে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয় এবং কি ক'রে সেই সব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—এই হ'ল লোক-চিকিৎসা নামক লোক-বিশ্বাসগুলোর মূল উদ্দেশ্য।"[১২] বলা বাহুল্য, লোক-চিকিৎসার উদ্দেশ্য হ'ল-রোগ-নিরাময়, আর লোক-বিশ্বাস হ'ল—বিশেষ বিশেষ

ধারণাকে সংরক্ষণ ক'রা, স্বীকার ক'রা এবং মেনে চলা। দুটি বিষয় অভিন্ন নয়। এজন্য লোক-চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও লোক-বিশ্বাসের তাৎপর্য এক হ'তে পারে না। লোক-চিকিৎসার বৃত্ত শুধু রোগের কারণ নির্ণয় এবং চিকিৎসার মধ্যেই সীমিত নয়। এছাড়াও আছে রোগের উৎস, রোগ-লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, ভাবীফল ইত্যাদি সম্পর্কে বিশিষ্ট ধারণা, যা লোক-চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।"[১৩]

এরূপে লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণার অভাবে, লেখকের এ রচনাতেও লোক-চিকিৎসার কোন স্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং তিনি এ চিকিৎসাধারা এখন আর জনসমাজে প্রচলিত নেই ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। লিখেছেন—"তদানীন্তন যুগে (?) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা ক'রার ও রোগ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত ক'রার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তদানীন্তন যুগের (?) কবিরাজ ও ডাক্তারগণ বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছড়ার ছাল, লতাপাতা, ফুল-ফল ও শিকড়ের রস খাওয়ায়ে এবং জলজ ও স্থলজ প্রাণীর রক্ত-মাংস, হাড়-গুল্ম প্রভৃতি রোগীর মাথায়, কোমরে, হাতে ও পায়ে লাগায়ে অথবা বেঁধে দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতো। তাদের এই চিকিৎসা শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। তারা কখনো কর্কশ কথা, গালি-গালাজ, চপেটাঘাত এমনকি লাঠিপেটা ক'রে রোগীদের চিকিৎসা ক'রতো। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসারতার ফলে (?) জনগণ আস্তে আস্তে তা বর্জন ক'রে। এবং এগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হ'তে থাকে (?)। এমনিভাবে চ'লতে চ'লতে বর্তমানে এগুলো লোক-বিশ্বাস বা লোক-সংস্কারে (?) পরিণত হ'য়েছে।"[১৪] সত্যই কি লোক-চিকিৎসা বর্জিত হ'য়েছে? বর্তমানে জনসমাজে কি লোক-চিকিসার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই? লেখকেরই পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধে বরং এর বিপরীত কথাই বলা হ'য়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-"আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ফইকরালী ও ঝাড়ু-ফুঁকে যদিও তেমন আস্থা নেই; কিন্তু পল্লীর সরল জনসাধারণের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব র'য়েছে। তাই গ্রামে ফইকরালী ও ঝাড়-ফুঁকের কদর অত্যন্ত বেশি।"[১৫] বস্তুত বর্তমান যুগে লোক-চিকিৎসার পরিধি সংকুচিত এবং আদর-কদর হ্রাস পেলেও-এ চিকিৎসা পদ্ধতি কোথাও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আমাদের দেশেও নয়, অন্যদেশেও নয়। এমনকি আমাদের দেশে তো বটেই, অন্যান্য দেশে, উন্নত শহর জীবনেও কিছুনা কিছু লোক-রীতির চিকিৎসার প্রচলন র'য়েছে।

লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে অপরিণত ধারণার জন্যই জনাব সামীয়ুল ইসলামের শেষোক্ত রচনায় একমাত্র ভূত ছাড়ানো ও জ্বীন তাড়ানোর উল্লেখ ব্যতীত, আর সমস্ত আলোচনাই লোক-বিশ্বাসের নির্দেশ। তা থেকে লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ ক'রা যায় না।

(৩)

অনেকে মনে ক'রেন, রোগারোগ্য, গাছ-গাছড়ার স্থূল প্রয়োগই লোক-চিকিৎসা। কেউ কেউ একে 'দেশীয় চিকিৎসা' নামেও অভিমিত ক'রেন। তাঁরা তথাকথিত 'দেশীয় চিকিৎসা' বা 'লোক-চিকিৎসার সম্যক পরিচয় দানের নিমিত্ত নয়, বরং ঐ সব গাছ-গাছড়ার আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক প্রয়োগকে উৎসাহিত ক'রার উদ্দেশ্যেই ছিটেফোঁটা আলোচনা ক'রেছেন।

এধরনের আলোচনার মধ্যে, সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত অনুক্ত-নাম লেখকের "ঔষধি প্রকৃতির অবদান" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং ঐ পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের ১৭ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত আহমেদ নূরে আলম এবং ইফতেখারুল ইসলাম-এর "বাংলাদেশের বনৌষধি" শীর্ষক নিবন্ধ দুটির নাম উল্লেখ ক'রা যায়।

প্রথম প্রবন্ধে প্রকৃতিজাত গাছপালা থেকে প্রাপ্ত ওষুধের প্রতি বিশ্বব্যাপী আগ্রহের পরিচয় তুলে ধ'রা হ'য়েছে এবং গাছ-গাছড়া থেকে জাত ওষুধের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রা হ'য়েছে।"[১৬] দ্বিতীয় প্রবন্ধেও ঐ একই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন বিদ্যমান। আহমেদ নূরে আলম 'দেশীয় চিকিৎসা' ব'লতে 'লোক-চিকিৎসা'কে বোঝাননি। তিনি সঠিকভাবেই আয়ুর্বেদী ও ইউনানী বা হেকিমী চিকিৎসাকেই দেশীয় চিকিৎসা ব'লেছেন। তিনি এ লেখায় 'ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ'-এর উল্লেখ ক'রলেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে, জনজীবনে সে-সবের ভূমিকার কোন পরিচয় দেননি।"[১৭] মূলত: হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদী, হেকিমী ইত্যাদি চিকিৎসা-পদ্ধতির অনুরূপ 'লোক-চিকিৎসা'ও যে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি এবং গাছ-গাছড়ার ব্যবহার তার অন্যতম অঙ্গ সে সম্পর্কে, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের কোন সুষ্ঠু চেতনার পরিচয় লাভ ক'রা যায় না। এজন্য তিনি 'দেশীয় চিকিৎসার ও মূল ধারাটিকেই চিহ্নিত ক'রতে পারেননি। ইফতেখারুল ইসলাম-লিখিত নিবন্ধেও "দেশজ চিকিৎসার পরিচয় স্বরূপ আয়ুর্বেদী চিকিৎসাকেই নির্দেশ ক'রা হ'য়েছে এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ গাছ-গাছড়ার লৌকিক প্রয়োগের উল্লেখ ক'রা হ'য়েছে। তিনি 'লোক-চিকিৎসা'র কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রেননি।[১৮] ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে "সচিত্র বাংলাদেশ" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত জনাব মতিউর রহমান ভূঁইয়ার 'দেশজ চিকিৎসা/বনজ ঔষধি' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদনটিও লোক-চিকিৎসা নয়, ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসার পরিচয় দানের নিমিত্ত লিখিত।"[১৯]

(৪)

বাংলাদেশে বাংলাভাষায় লিখিত আর এক শ্রেণীর লোক-চিকিৎসার বই-এর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যথা,—

১। দোয়া-তাবিজের কেতাব ও

২। মন্ত্র-তন্ত্র এবং গাছ-গাছালির দ্বারা টোট্কা চিকিৎসার বই।

প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলো মূলত হেকিমী-পীরালী-ফকিরী চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বই ওঝা-বৈদ্য-ফকিরী চিকিৎসা-ধারার সঙ্গে জড়িত।

দোয়া-তাবিজের কেতাব-এর মধ্যে ছৈয়দ শাহ্ ছাদত আলী সাহেব-প্রণীত 'ছহি এলাজে লোকমানি বা লজ্জতে দুনিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এতে ধাতু-দৌর্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, বীর্যস্তম্ভন, বাগী, গর্মী, উপদংশ, নানা রকম ক্ষত, শোথ, অগ্নিদাহ, সূতিকা, আমাশয়, সর্দি, অম্লপিত্ত, জোঁক লাগা, উকুণ মারা, কুজ ভাল হওয়া' ইত্যাদি বিমারীর এলাজ বা ওষুধের

বিবরণ র'য়েছে। লেখক যে ইউনানী চিকিৎসা দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে এ কেতাব রচনা ক'রেছেন—তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত যৌন-মিলন সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ, নারী-বশীকরণ ইত্যাদিও আলোচিত হ'য়েছে।[২০]

এই শ্রেণীর অপর গ্রন্থ মুন্সি মরহুম আবদুল গনি সাহেবের 'ছহি বড় তাজ ছোলেমানি'তে আছে যুবক-যুবতীর বিবাহ না হওয়া-রোগ থেকে শুরু ক'রে আকর্ষণ, মারণ, উচাটন, জ্বর, কানপাকা, দাঁতে পোকা, পেটের পীড়া, প্লীহা, ক্রিমি, জিহ্বায় ঘা, আমাশা, রক্ত ওঠা, কলেরা, বসন্ত, সাপ-বিছা-ইঁদুর-শিয়াল-শূকর-কুকুর ইত্যাদির দংশন ও উৎপাৎ, শিশুরোগ, বালা রোগ, সুখ-প্রসব প্রভৃতি পর্যন্ত বিদ্যমান। চিকিৎসার জন্য কবি এর প্রত্যেকটির এক বা একাধিক দোয়া-দাওয়া ও তদ্বিরের উল্লেখ ক'রেছেন। রোগ-নিরাময়ের জন্য তিনি দোয়া-তাবিজ ছাড়াও মালিশ, ফুলপড়া, পানপড়া, পশু-পাখী-মাটি-বন প্রভৃতি সূত্রে প্রাপ্ত নানাবিধ দ্রব্য ব্যবহারেরও উপায় বাৎলে দিয়েছেন। আলোচ্য কেতাবে ইউনানী-পীরালি চিকিৎসার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। 'তাজ ছোলেমানি'তে চিকিৎসা ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণাও ক'রা হ'য়েছে।[২১]

অনুরূপ আর একটি কেতাব মুনশী আশরাফ উদ্দিন সাহেব প্রণীত 'ছহি আজাএব ছোলেমানি ও তাবিজাত ফালনামা'। আলোচ্য কেতাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'অবনিবনা', 'যাদু-টোনা', 'পেট দরদ', (ব্যথা), 'মাথা-দরদ', 'ভূতের আসর', 'শিশুর ক্রন্দন', 'পাথরী', 'স্তন-দুগ্ধ হ্রাস', 'শরীরক্ষয়', 'কলেরা', 'কানে ব্যথা', 'ধাতুদুর্বলতা', 'কুকুর-দংশন' প্রভৃতি রোগের দোয়া (কোরানের আয়াত), তাবিজের নক্সা এবং কিছু কিছু রোগের কবিরাজি ওষুধের বিবরণ বিদ্যমান। এছাড়া 'জোলাপ', 'পাচন', 'বটিকা', ও লৌকিক নানা রকম টোট্‌কা চিকিৎসার কথাও লিখিত হ'য়েছে। সেই সঙ্গে আছে অবান্তর কিছু কিছু বিষয়। যেমন 'হুলিয়া নামা', 'রাশি বিবরণ' ইত্যাদি।"[২২]

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম আলী-প্রণীত 'ছহি তেলেছমাত ছোলেমানী', মওলানা রুহুল আমীন সাহেবের 'তাবিজাতে রুহুল্লা', মওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ছাহেব কর্তৃক উর্দু থেকে অনুদিত 'নাফেউল খালায়েক' প্রভৃতি কেতাবও একই রকম দোয়া-তাবিজের বই।"[২৩] এগুলোর কোনটি 'নাফেউল খালায়েক'-এর মত সম্পূর্ণরূপে কোরান শরীফের আয়াত ও আরবী সংখ্যা-নির্ভর পীরালি চিকিৎসার আকর ; কোনটি 'আজাএবে ছোলেমানী'র মত হেকিমী-পীরালি-কবিরাজি-ওঝালি-ফকিরী ডাক্তারী চিকিৎসার গ্রন্থ। এসব রচনার সঙ্গে লোক-চিকিৎসার সম্পর্ক আছে ; কিন্তু লোক-চিকিৎসার অধিকাংশ রূপ এইসব গ্রন্থে নিহিত থাকলেও সমগ্র রূপ বর্তমান নেই।

আর দ্বিতীয় ধরনের গ্রন্থের মধ্যে মতিলাল ওঝার 'কামরূপী মন্ত্র বা গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা' অন্যতম। এতে জ্বর, বাতাস লাগা, পেটকামড়ানি, শিরঃপীড়া, প্লীহা, মচকা, গরমলাগা, আগুনে পোড়া, অতিসার, রক্তামাশায়, ফিক্‌বেদনা, ঋতু-বেদনা, বাধক বেদনা, গর্ভরক্ষা, মৃতবৎসা-দোষমোচন, বন্ধ্যাত্বমোচন, সুপ্রসব ইত্যাদি রোগের-ফুল, জল, লবণ, আদা, ঘৃত পড়া মন্ত্রাদির উল্লেখ ক'রা হ'য়েছে। কোন কোন রোগে সংস্কৃত মন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত রূপ

আলতা দিয়ে ভূর্জপত্রে লিখে তা মাদুলিতে পুরে ধারণ করবার কথাও আছে। এছাড়া আছে– তান্ত্রিক আভিচারিক নানা ক্রিয়া এবং 'বশীকরণ', 'শত্রুতাসাধন' প্রভৃতির উপায় নির্দেশ।"[২৪] এরকম আরও কিছু কিছু তন্ত্র-মন্ত্রের বই আছে। কিন্তু তানসেন-লিখিত 'কামরূপী টোট্‌কা চিকিৎসা', কবিরাজ আস্রাব আলীর 'সহজ লতাপাতার গুণ', কবিরাজ ফজলুর রহমানের 'সহজ টোট্‌কা চিকিৎসা', কবিরাজ এম.এ. চৌধুরীর 'লতাপাতার গুণ', রমেশ কবিরাজ-এর 'সহজ কবিরাজি শিক্ষা', ডাক্তার কে.এম. বশির উদ্দিন-এর 'বাজারের সেরা লতাপাতার গুণ', 'অব্যর্থ মুষ্টিযোগ', ডাক্তার রায়-এর 'অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালী', প্রভৃতি একমাত্র গাছ-গাছড়া ভিত্তিক লোক-চিকিৎসার 'চটি বই'। এসব বইয়ের কোন কোনটিতে ফজলুর রহমানের টোট্‌কা চিকিৎসার মত রোগ-অনুযায়ী চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হ'য়েছে। আর কোন কোনটিতে ডাক্তার খোন্দকার মোহাম্মদ বশির উদ্দীনের 'বাজারের সেরা লতা-পাতার গুণ' এর মত বনৌষধির তালিকা অনুযায়ী, সেগুলোর ব্যবহার বিধি লিখিত হ'য়েছে। কোন-কোনটিতে উভয় রীতির মিশ্রণও দুর্লক্ষ্য নয়।

আলোচ্য 'চটিবই'সমূহে কবিরাজি চিকিৎসার ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এগুলোতে বহু লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিও বর্ণিত হ'য়েছে। কিন্তু লৌকিক চিকিৎসা রীতির সমগ্র উপায় এগুলোর কোনটিতেই দৃশ্যমান নয়। লৌকিক চিকিৎসা রীতির কোন প্রসঙ্গ এ'রা কেউ উল্লেখ ক'রেননি।"[২৫]

ভারতীয় বাংলা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ-প্রবন্ধাদিতেও লোক-চিকিৎসার সুষ্ঠু বিবরণ দুর্লভ। একমাত্র শোভারাণী চক্রবর্তীর গবেষণা-গ্রন্থ "বর্তমান বঙ্গ সমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা"-তে লোক-চিকিৎসার সামান্য সচিত্র পরিচয় বিদ্যমান। এগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখিকা "বাস্তব পটভূমিকায় লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা" শিরোনামে অশরীরী আত্মাকে অপসারণ 'ক'রা', তার "আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রা" "সর্প ও সকল প্রকার জীবজন্তুর দংশন", "রোগ ভাল ক'রা", "গরু ও নারীর বুকে দুধ আনা" সম্পর্কে শুধুমাত্র মন্ত্রাদি প্রয়োগের উল্লেখ ক'রেছেন। মন্ত্রপ্রয়োগ অবশ্যই লোক-চিকিৎসার অন্তর্গত। কিন্তু লোক-চিকিৎসা, শুধু মন্ত্র-প্রয়োগেই সীমিত নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে "সাপালী", "ভূতালি" এবং "রোগারোগ্যর"ও কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রা হ'য়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও লোক-চিকিৎসার সমগ্র রূপটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি।"[২৬] কেননা লেখিকার মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় বাংলার বর্তমান হিন্দু সমাজে নির্মিত যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের পরিচয় দান, লোক-চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নির্দেশ নয়। এজন্য এ গ্রন্থ থেকেও লোক-চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় লাভ ক'রা যায় না।

ভারতীয় বাংলা থেকে প্রকাশিত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর "বাংলার লৌকিক দেবতা" গ্রন্থেও কিছু কিছু লোক-চিকিৎসার উপকরণ বিদ্যমান বটে ; তবে লেখক শুধু লৌকিক দেবদেবীর পরিচয় ও বিবরণ সংগ্রহের প্রতিই অধিক মনোযোগ দান ক'রায়, লৌকিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন ক'রেননি।"[২৭] ফলে এ গ্রন্থেও লোক-চিকিৎসার সমগ্র রূপের বিবরণ বিধৃত হয়নি।

অনেকের ধারণা, আচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য কর্তৃক সর্বমোট ছ'খণ্ডে লিখিত "চিরঞ্জীব বনৌষধি"—লোক-চিকিৎসার গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ছ'খণ্ডে লিখিত "ভারতীয় বনৌষধি"—গ্রন্থটিও তাঁদের মতে লোক-চিকিৎসার বই।

কিন্তু এরকম ধারণা আদৌ সঠিক নয়। ভারতীয় জাতির বর্তমান নতুন সাংগঠনিক অবস্থায়—বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব-নির্দেশ, বেদ-সংহিতা, উপনিষদ-যাসক-যাজ্ঞবল্ক্যে ইত্যাদির মহিমা প্রচার, চরক-চক্রদত্ত-বঙাসেন-ভাবমিশ্র প্রভৃতি বৈদ্যগণের বৈদিক ধারায় আয়ুর্বেদ চর্চার রূপরেখা অঙ্কন এবং এই ধারার পুনর্জাগরণ ও প্রসারণ কামনায়ই 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র আত্মপ্রকাশ। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির-ই অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী, বেদ-ব্রাহ্মণ-সংহিতাই যে তাদের মূল অবলম্বন, চরক-সুশ্রুতের যুগ থেকে ভাবমিশ্রের যুগ পর্যন্ত যে ভারতে উদ্ভিদবিদ্যার রীতিমত "সমীক্ষা" বা 'রিসার্স' হ'য়েছে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন স্বাতন্ত্র কিংবা বৈশিষ্ট্য নেই ; সে কথাই তিনি তুলে ধ'রতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের নব অভ্যুত্থান কামনায়, ভারতবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চেতনার আবহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে লিখিত। সেজন্য, বেদ-ব্রাহ্মণ-সংহিতা-উপনিষদ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ক'রা যায়, চরক ও সুশ্রুতে-চক্রদত্তে ভাবপ্রকাশে উক্ত-এমন লতা-বৃক্ষ-গুল্ম প্রভৃতির বিবরণ-ই মাত্র 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র বিভিন্ন খণ্ডে বিধৃত। লেখকের দৃষ্টি একটি বিশেষ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকায়—তিনি আলোচিত বৃক্ষ-ইত্যাদির ইউনানী ব্যবহারের কোন উল্লেখ ক'রেননি কিংবা সেগুলোর বৈদিকম, সংস্কৃত, হিন্দী ও ল্যাটিন নামের সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফার্সী-আরবী বা উইনানী চিকিৎসা গ্রন্থে প্রদত্ত নামেরও উল্লেখ ক'রেননি। গাছ-পালাসমূহের লৌকিক নামেরও উল্লেখ ক'রেছেন অতি সামান্যই। ফলে, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থের ভাষায়—"এই সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রতিটি ভেষজের সুপ্রাচীন, বৈদিক রূপ, মধ্যযুগীয় ভৈষজ্য চিন্তা, আর বর্তমান যুগে এসে সেই সব ভেষজের দ্বারাই যে নবসঞ্জীবিত রসায়ন বিজ্ঞানের সমাবেশেই আমাদের ভেষজবিশ্বকে গড়ে তোলা যায়, সেটি চমৎকার তুলে ধরা হ'য়েছে।"[২৮] এ বিচার -বিশ্লেষণে লৌকিক কিংবা হেকিমী চিন্তাধারার কোন 'স্পর্শদোষ ঘটেনি। সেজন্য আলোচ্য গ্রন্থের অপর সমালোচক ড: এ.সি. কার যথার্থই ব'লেছেন—"This book will go a long way to place the ayurvedic system of medicine on the scientific footing. The manufacturers of ayurvedic medicine will be immensely benefited by this book."[২৯]

অতএব এটি যে লোক-চিকিৎসার গ্রন্থ নয়, আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিকোণ থেকে বনজ ঔষধির আলোচনা—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য লেখক প্রতিটি গাছ-পালার আলোচনা শেষে লোকায়তিক ব্যবহারের যে কিছু কিছু উল্লেখ ক'রেছেন—সেগুলো কবিরাজি-চিকিৎসার-ই "উপাঙ্গ" স্বরূপ "মুষ্টিযোগ" মাত্র। এর সঙ্গে লোক-চিকিৎসার "ছ্যাঁচা-গোচা"র সাদৃশ্য আছে--কিন্তু সম্পর্ক নেই। 'মুষ্টিযোগে'র মূল সম্পর্ক আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ধারাতেই তবে লোক-চিকিৎসার মধ্যে 'মুষ্টিযোগ' ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'কে তাই সর্বোতভাবে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বনৌষধির পরিচয়মূলক গ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ ক'রা উচিত,

লোক–চিকিৎসার গ্রন্থ হিসেবে নয়। এগ্রন্থে বিবৃত গাছ–গাছড়া ও লতাবৃক্ষের অতি অল্পই লোক–চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। শিবকালী বাবু গ্রন্থটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত উদ্ভিদবিদ্যার গ্রন্থের সমপর্যায়ে উত্তোলনের জন্য আলোচিত গাছ বা লতাগুলোর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম, গোত্র এবং রাসায়নিক উপাদানের নামোল্লেখ ক'রেছেন, কিন্তু তার পুষ্প–সংকেত বা ফ্লোরাল ফর্মুলা, 'পরাগস্থলী' বা 'মাইক্রোস্‌পোরঞ্জিয়া'ও 'ডিম্বক–স্থলী' বা মেগাস্–'পোরাঞ্জিয়া' বিশ্লেষণ, জুন–বিন্যাস–বির্দেশ, 'নিষেক' 'ফার্টি লাইজেশন'–এর ধরণ, ভ্রণ–বিন্যাস, জনুক্রম, জীবনচক্র প্রভৃতির উল্লেখ ক'রেননি। তিনি প্রতিটি লতা-গুল্ম বা বৃক্ষ থেকে নিষ্কাশিত রাসায়নিক উপাদানের আনবিক গঠন এরও কোন চিত্র সন্নিবেশ ক'রেননি। তথাপি একে 'লোক–চিকিৎসার বই' বলা যায় না।

অনুরূপভাবে 'ভারতীয় বনৌষধি' গ্রন্থটিও লোক–চিকিৎসা মূলক গ্রন্থ নয়। সেটি সর্বোতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত বনজ ঔষধির–ই বিবরণ। সুলিখিত এবং বিস্তৃত। আলোচ্য গ্রন্থের সুবৃহৎ ছ'টি খণ্ডে ভারতীয় বনৌষধির যে বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে, তার সঙ্গে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র অনেকটা মিল আছে। এগ্রন্থও আয়ুর্বেদ ভিত্তিক রচনা। আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত প্রত্যেকটি গাছ–গাছড়ার 'ভারতীয় নাম', নাম পর্যায়', 'গুণ পর্যায়', 'জন্মস্থান', 'বর্ণনা', উদ্ভিদটির 'ব্যবহার্য অংশ', 'মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার', 'গ্লোসারি', 'ত্বক', 'ফল', 'পত্র' ও বীজ এবং বর্ণিত উদ্ভিদটি সম্পর্কে সাধারণ 'মন্তব্য', বিদ্যমান।"[৩০]

এছাড়া ড: দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী–লিখিত 'ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ'–গ্রন্থটিতে সতেরটি বনৌষধির বিবরণ বিদ্যমান।"[৩১] আর বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের বই 'ভারতের বনৌষধি'তে কতিপয় বনৌষধির পরিচয়সহ সেগুলোর বিভিন্ন চারিত্র্য বা প্রকারভেদ, ভেষজ নির্যাস প্রণালী প্রভৃতি সংক্রান্ত আলোচনা র'য়েছে। এ পুস্তিকা রচনা ক'রেছেন—অসীমা চট্টোপাধ্যায়।"[৩২]

এরকম আরও অনেক বই ভারতীয় বাংলায় প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনদিকেই লোক–চিকিৎসার বই বলা যায় না।

(৫)

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেও লোক–চিকিৎসার সম্পূর্ণ রূপের পরিচয় কোন গ্রন্থ ও পত্র–পত্রিকায় কদাচিৎ লক্ষনীয়। এমনকি, 'অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'তে এশীয় লোক–চিকিৎসা সম্পর্কে ১৯৭৯ সালে প্রথম যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে–সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাদিতেও লোক–চিকিৎসার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ সম্মেলনে পঠিত যে সব প্রবন্ধ 'হেমিস্ফিয়ার' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলোর কোন–কোনটিতে 'দেশীয় চিকিৎসা' বা 'ট্রাডিশনাল মেডিসিন'কেই–'লোক–চিকিৎসা' বা 'ফোক মেডিসিন' ব'লে নির্দেশ ক'রা হ'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ জাঁ মূলহ'ল্যান্ড–এর লিখিত 'ঐতিহ্যবাহী থাই চিকিৎসা' বা 'ট্র্যাডিশনাল থাই চিকিৎসা'র নামোল্লেখ ক'রা যায়। লেখক থাইল্যান্ডের লোক–চিকিৎসার বিবরণ দিতে গিয়ে, যে, 'দেশীয় চিকিৎসা'র বিবরণ দিয়েছেন,[৩৩] তা' সম্পূর্ণরূপে

আয়ুর্বেদী চিকিৎসা মাত্র। ভারতীয় সূত্রে প্রাপ্ত এই চিকিৎসা-পদ্ধতি থাইল্যান্ডে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত থাকায়, একে থাইল্যান্ডের দেশীয় চিকিৎসা ব'লে নির্দেশ ক'রা যায়। কিন্তু লোক-চিকিৎসা ব'লে চিহ্নিত ক'রা যায় না। ঐ সম্মেলনে পঠিত, পাকিস্তানের হাকীম মুহম্মদ সায়ীদের 'আওয়াস ইন ট্রাস্ট ওনলি'-শীর্ষক প্রবন্ধটিও হেকিমী চিকিৎসার বিবরণ মাত্র ; লোক-চিকিৎসার নয়। আলোচ্য সম্মেলনে-পঠিত জেনিস রীড-এর রচনাটি 'উপজাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি' বা 'ট্রাইবাল মেডিসিন' সম্পর্কে লিখিত ; লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে নয়। অ্যান্থনি আর পীল-এর 'অকর অ্যাজ এ মেডিকামেন্ট',-দোলচি রেডিট-এর 'আন-রিটেন ফার্মাকোপীয়া',-লোনা কার্ট-রাইট-এর 'হেলথ ফ্রম হার্বস' ও উপজাতীয় চিকিৎসা এবং গাছ-গাছড়ার বিবরণ মাত্র ; লোক-চিকিৎসার পরিচয়বহ নয়।

আলোচ্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একমাত্র মার্গারেট বেইনব্রিজ-এর 'টার্কিশ ফোক মেডিসিন"[৩৩]-রচনাটিই যথার্থ লোক-চিকিৎসা বিষয়ক রচনা। এ লেখায় তিনি তুরস্কের জন-সমাজে প্রচলিত নানা লোকায়ত-চিকিৎসার বিবরণ দিয়েছেন।"[৩৪] কিন্তু একটা "স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি' হিসেবে, তিনি লোক-চিকিৎসার সমগ্ররূপের পরিচয় প্রদান ক'রেননি। ফলে, ঐ আন্তর্জাতিক এশীয় লোক-চিকিৎসা বিষয়ক সম্মেলন থেকেও গাছ-গাছড়া কেন্দ্রিক চিকিৎসা, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা, ইউনানী চিকিৎসাও উপজতীয় চিকিৎসার একটি জগাখিচুড়ী রূপের-ই পরিচয় মেলে ; লোক-চিকিৎসার সমগ্র রূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না।

বিদেশী রচনাদির মধ্যে ভারতের দিল্লী থেকে প্রকাশিত, ও,পি, জ্যাগ্‌গি-র রচিত 'ফোক-মেডিসিন'-এ লোক-চিকিৎসার মোটামুটি একটি সন্তোষজনক পরিচয় বিদ্যমান।"[৩৫] গ্রন্থটি 'হিস্ট্রি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইন্ডিয়া-'র তৃতীয় খণ্ড। জ্যাগ্‌গি এ গ্রন্থে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসার বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লিখেছেন—

"All of us have, at one time or another, heard of that ancient System of Medicine, the Ayurveda. But we do not know much about another type of Medicine which is more ancient, more widely practised and equally efficacious at least in the eyes of its adherents : Folk Medicine."[৩৬]

এমনিভাবে তিনি যথার্থই আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসার পার্থক্য নিরূপণ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন এবং লোক-চিকিৎসা যে আয়ুর্বেদী চিকিৎসার মতই একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি তার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তিনি লোক-চিকিৎসার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে ব'লতে গিয়ে লিখেছেন—"Folk Medicine was practised during the Ayurvedic period ; it is still practised in the twenteeth century."[৩৭] ভারতে এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে তাঁর অভিমত-"More people in India believe in Folk Medicine than all the other system of Medicine taken together."[৩৮] একথা শুধু ভারত সম্পর্কে নয়, বাংলাদেশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

ও.পি. জ্যাগগি, তাঁর গ্রন্থকে দু'ভাবে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা—

১। উপজাতীয় চিকিৎসা ও

২। গ্রামীণ চিকিৎসা।

তা থেকে মনে হয়, জ্যাগগির মতে লোক-চিকিৎসা দু'ভাগে বিভক্ত। উপজাতীয় চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসা। একথা ঠিক নয়। বস্তুতঃ উপজাতি থেকেই যদি জাতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে, তাহ'লে উপজাতীয় চিকিৎসাই আদিম এবং তা থেকে লোক-চিকিৎসার উদ্ভব। অর্থাৎ গ্রামীণ চিকিৎসাই প্রকৃতপক্ষে লোক-চিকিৎসা। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এ পার্থক্য নির্দেশ ক'রা হয়নি। ফলে এগ্রন্থে উপজাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই অধিক গুরুত্ব লাভ ক'রেছে এবং গ্রামীণ চিকিৎসা অমুসলমান সম্পর্কে আলোচনা ক'রা হ'য়েছে—সামান্যই। দ্বিতীয়ত: গ্রামীণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমান সমাজে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক আচার-আচরণ ও চিকিৎসাভেদ র'য়েছে—সেগুলোর প্রতিও লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

জ্যাগ্‌গি লোক-চিকিৎসক ব'লতে বুঝিয়েছেন-গ্রাম্য যাদুকর, সাপের ওঝা, কাঁটা উৎপাটক, স্ফোটক চিকিৎসক, হাড়জোড়াদার, বৈদ্য ও হেকিমদের।"[৩৯] বলাবাহুল্য, লোক-চিকিৎসক ব'লতে প্রকৃত পক্ষে ধরাবাঁধা কোন চিকিৎসক শ্রেণী নেই। গ্রামের প্রায় সকলেই কিছু না কিছু লোক-চিকিৎসা জানেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বেশী জানেন, কেউ কম জানেন। যাঁরা বেশী সংখ্যক রোগের চিকিৎসা জানেন, কিংবা একাধিক উপায়ে চিকিৎসা ক'রতে সমর্থ হন, তাঁরা গুরুতে পরিণত হন। এসব গুরুর নিকট দীক্ষিত হ'য়ে-স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চিকিৎসাকর্মে অধিক জ্ঞান অর্জন ক'রতে পারেন। তখন তিনি ওঝা, গুণীন, ফকীর ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। চিকিৎসাকে তিনি তখন পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রেন। পীরালী চিকিৎসা এরূপে যে-কেউ ইচ্ছে ক'রলেই গ্রহণ ক'রতে পারেন না। এটি বংশগত এবং পীর-মুরিদী পর্যায়ভুক্ত। পীরের নিকট দীক্ষিত হ'য়েই মাত্র পীরালী চিকিৎসা-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই সব লোক-চিকিৎসকদের সঙ্গে আয়ুর্বেদজ্ঞ বৈদ্য বা কবিরাজ এবং ইউনানী বিদ্যায় বিদ্বান হেকিমদের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব তাঁরা স্বতন্ত্র চিকিৎসক,-লোক-চিকিৎসক নন। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে তাই লেখকের লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ ক'রা আবশ্যক যে, ইনি অপর একটি ক্ষুদ্র রচনায় 'লোক-চিকিৎসা'কে বিশ্বাসমূলক চিকিৎসা বা "Faith Healing"-ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন।"[৪০] বলাবাহুল্য, লোক-চিকিৎসায় বিশ্বাসের অস্তিত্ব, থাকলেও-তাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সমগ্র রূপের তো নয়-ই।

জাগ্‌গি প্রথমোক্ত গ্রন্থে লোক-চিকিৎসার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"Folk Medicine hasits own concepts about the causation of disease : wrath of gods, evil spirts, magic, witchcraft etc. It has its own diagnostic tools and techniques which lean heavily on divination. Treatment is based upon removal of the causative factor through the propitiation of gods, exorcism,

counter-magic, use of charms and amulets, and of course, administration of some harbal preparations-a perfectly rational approach in so far as it is intended to remove the basic cause."[৪১]

লোক–চিকিৎসার প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক একটি ধারণা এখানে প্রকাশ লাভ ক'রলেও, জাগ্গির এই অভিমত যে কেন দৃঢ়বদ্ধ হয়নি–তা বোঝা কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য গ্রন্থে লেখক লোক–চিকিৎসার জ্ঞাতব্য সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ ক'রেননি। ফলে, লোক–চিকিৎসার বিশেষ বৈচিত্র্যসমূহ, ওষুধপ্রস্তুত–বিধি ও ওষুধের মাত্রা, প্রয়োগ–রীতি, পরিমিতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় না।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাহেব লাল শ্রীবাস্তব–এর গবেষণা গ্রন্থ 'ফোক কালচার অ্যান্ড ওরাল ট্র্যাডিশন'–এর একটি অধ্যায়ের অংশ বিশেষে, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের আসালপুর ও বরিগাঁও গ্রামদ্বয়ের লোক–চিকিৎসার ওপর কিছুটা আলোকপাত ক'রা হ'য়েছে। লেখক ঐ দুটি গ্রামের জন–সমাজের প্রচলিত–'ম্যালেরিয়া', 'কাশি', 'সর্দি', 'পায়ে ব্যথা', 'গরম লাগা', 'আমাশয়' 'উদরাময়', 'ফোঁড়া,–'শয্যামূত্র', 'আধ–কপালী মাথা ধরা', 'দাঁতে ব্যথা', 'উদরশল', 'চুক্ষপ্রদাহ', 'মৃগী', 'খিচুনি', 'জণ্ডিস', 'টাইফয়েড', 'বসন্ত', 'কলেরা', 'সর্প–দংশন', 'কুকুর–দংশন', 'ভূতে পাওয়া', ইত্যাদি রোগের লোকৌষধের বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে 'মন্ত্র' ও 'দ্রব্য' ব্যবহারেরও উল্লেখ র'য়েছে। কিন্তু শ্রীবাস্তব লোক সাধারণের সংস্কৃতি ও মৌলিক ঐতিহ্যের প্রতিই একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রায় লোক–চিকিৎসার সমগ্র রূপের পরিচয় দেননি।"[৪২]

আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ্ ও লোক–তত্ত্ববিদ্দেরও কেউ কেউ লোক–চিকিৎসার প্রতি আলোকপাতের প্রয়াস পেয়েছেন বটে ; কিন্তু এ চিকিৎসার সমগ্র রূপের যথার্থ চিত্র উপস্থাপন ক'রেনি। উদাহরণস্বরূপ এরিখ জে, ট্রিমার–এর 'মেডিকেল ফোকলোর অ্যান্ড কোয়াকারি', হ্যারল্ড এ গুড–এর 'দি ইমপ্লিকেশনস অব টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ ফর ফোক অ্যান্ড সায়েন্টিফিক মেডিসিন' এবং জর্জ এম, ফস্টার–বিরচিত 'রিলেশনশিপস বিটুইন স্প্যানিশ অ্যান্ড স্প্যানিশ–অ্যামেরিকান ফোক মেডিসিন' প্রবন্ধত্রয়ের উল্লেখ ক'রা যায়।"[৪৩] এসব প্রবন্ধেও লোক—চিকিৎসার আংশিক পরিচয় ব্যতীত—সামগ্রিক পরিচয় বিধিবদ্ধ হয়নি।

(৬)

উল্লেখযোগ্য যে, লোক–চিকিৎসার আংশিক আলোচনার এরকম নিদর্শন—স্বদেশ ও বিদেশের আরও অনেক পত্র–পত্রিকা এবং গ্রন্থাদিতে থাকতে পারে। তার সব খবর সংগ্রহ ক'রা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নেই। ও.পি. বোডিং–এর 'স্টাডিজ ইন সান্টল মেডিসিন'–এর মত কিছু কিছু গ্রন্থ উপজাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে রচিত হ'লেও 'ভিলেজ মেডিসিন' বা 'লোক–চিকিৎসা' সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখিত হয়নি। অথচ বিষয়টির গুরুত্ব

প্রায় সকলেই স্বীকার ক'রেন। এধরণের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অস্কার লুইস লিখেছেন—"The knowledge of what people believe about health and disease can be helpful in a number of ways. First of all, it may be a great aid in establishing rapport between doctor and patient...A second advantage in learning the indigenous beliefs and practices of the community is the insight gained into the worldview of the people....Concept of disease Causation are part of a society.....total worldview, which is also reflected in other spheres such as agriculture, politics, and interpersonal relations. If there is much emphasis on magical belief concerning disease, it may be predicted that the people will not interpret agricultural innovations in a truly scientific spirit."[88]

আমাদের দেশে লোক-চিকিৎসা অধ্যায়নের আরও গুরুত্ব এখানে যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিতে, মানসিকতায় ও জীবনাচরণে, কতকটা ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান কেমনভাবে সমীকৃত, স্বীকৃত ও গৃহীত হ'য়েছে তা' লোক-চিকিৎসার অধ্যয়ন থেকে জানা সম্ভব। দ্বিতীয়ত: আজও মুসলিম জনসাধারণ কতটা হিন্দুধ্যান-ধারণায় এবং হিন্দু জনসাধারণ কতটুকু ইসলামী ধ্যান-ধারণার আচ্ছন্ন র'য়েছে-তারও সঠিক 'ব্যারোমিটার' এই লোক-চিকিৎসা। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম ও রোগের নিকট মানুষের জাতি-ধর্মগত বৈষম্য না থাকায়, এসব ক্ষেত্রেই সকলের প্রকৃত মানসিকতা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়। তৃতীয়ত: আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যয়বাহুল্য, ওষুধ-সংকট ও জনসাধারণের দারিদ্র্যজনিত দুঃসময়ের মোকাবেলাতেও লোক-চিকিৎসার অধ্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ চিকিৎসার পুনরুজ্জীবন, ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় উপকার সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ। চতুর্থ: লোক-ওষুধের বিবরণ ও প্রয়োগগত তথ্য থেকে নতুনতর গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির আরও বিকাশ এবং দেশীয় কারখানাজাত ওষুধের বাজার সৃষ্টি সম্ভব। পঞ্চমত: আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার গবেষণার এবং তার ফলাফলের সমন্বয় সাধন মারফত বিশ্বের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বল্প-মূল্যে চিকিৎসার ব্যাপক সুবিধাদানও সম্ভব।

(৭)

এসব কারণে লোক-চিকিৎসার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি একান্ত আবশ্যক। এধরনের একটি গ্রন্থের অভাবে লোক-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে র'য়েছে। সংস্কার ও স্মৃতি-নির্ভর সাধারণ গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য, পীড়া ও তা' চিকিৎসার স্বরূপ সম্পর্কে সকল শিক্ষিত মানুষেরই যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও চিকিৎসা-সংকটের সঠিকরূপ নেপথ্যে থেকে যেতে বাধ্য। কাজেই গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের অসুস্থতার প্রকৃতি বা রোগ-বিবরণ এবং সেই সব রোগ

দূরীকরণে তাদের নিজেদের অবলম্বিত প্রথা–পদ্ধতির অধ্যয়ন একটি জাতীয় কর্তব্য। লক্ষ্য ক'রা আবশ্যক যে, লৌকিক ধারণায় রোগ কাকে ব'লে, রোগের কারণ কি, রোগ নিরাময়ের উপায় কি, এবং সে সব উপায়ের প্রয়োগযোগ্যতা সার্বজনীন কিনা কিংবা রোগারোগ্যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে দেশীয় পদ্ধতির কোন সংযোগ সম্ভব কি না।

বস্তুত: লোক–চিকিৎসার সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নানা উপাদানের সাহায্যে, সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক। অস্বীকার ক'রা যায় না যে, কালোচিত পরিবর্তনের ধারায় লোক–চিকিৎসার বহুমূল্যবান উপকরণ ও উপায় ক্রমে ক্রমে বিলীন হ'য়ে গেছে ও যা'চ্ছে। এখন ও আমাদের দেশের বিভিন্নজেলায়, বিভিন্ন গ্রামে ও মহল্লায় এসব গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কিছু কিছু বর্তমান র'য়েছে। সেগুলো রক্ষা ক'রার জন্য এখনই ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ না ক'রলে অচিরেই এদেশীয় সম্পদ ও তার ঐতিহ্য থেকে জাতি অনেক দূরে সরে যাবে। ইউরোপীয়দের মত তখন আর "দাদীর কেলে ওযুধের"র জন্য হাহুতোশ ক'রে কোন ফল হবে না। ফলে, ঐগুলো এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবার পূর্বেই রক্ষা ক'রা আবশ্যক।

লোক–চিকিৎসায় ব্যবহৃত বনজ লতাগুলোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকেও বহুমূল্যবান উপক্ষার বা 'অ্যালকালয়েড', টক্সিন, অ্যান্টি–টক্সিন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হ'তে পারে। সেদিকে আধুনিক ঔষধবিদ্যাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রা কর্তব্য। তাঁদের এসম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক যে, সত্য, বিজ্ঞান কিংবা কার্যকর ফলাফলের কথা শুধু ইউরো–আমেরিকানদের একচেটিয়া নয়। ইংরেজি বইয়েই মাত্র সব জ্ঞান নিহিত নেই। আমাদের দেশের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সত্য, কার্যকর ধারণা এবং বিশ্বাসের অস্তিত্ব আছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে পশ্চিমী চিকিৎসার প্রসারের পূর্বেও হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষ বেঁচে থেকেছে। তারা রুগ্ন হ'য়েছে, মৃত্যুবরণ ক'রেছে, আবার চিকিৎসিতও হ'য়েছে। সে–চিকিৎসা একেবারে 'ভূঁয়া' হ'লে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলনের দেড়শ' বছর পরেও তা' আজও টিকে থাকতে পারত না। জনপ্রিয়তা নিয়ে বেঁচে থাকা তো দূরের কথা। কাজেই লোক–চিকিৎসার অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব অথচ দৃশ্যমান বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রিয়াশীল পদ্ধতিসমূহও যথাযতভাবে অনুশীলিত, পরীক্ষিত এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া উচিত। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, "..." "mankind does not have one kind of medicine, we have different ways of treating the body....."[৪৫] এবং কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই সম্পূর্ণ নয়, কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

(৮)

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা, লোক–চিকিৎসার বিপুল উপকরণের মধ্যে একমাত্র যশোহর জেলা থেকে সংগৃহীত উপাদান অন্তর্ভুক্ত ক'রা হ'য়েছে। আর সে সব উপাদানের ভিত্তিতে লোক–চিকিৎসার একটি সংক্ষিপ্ত, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রা হ'য়েছে। বর্তমান রচনায় যশোর জেলার লোক–

চিকিৎসার সমগ্র উপকরণ সঞ্চয় ক'রা সম্ভব হয়নি। এতে শুধু ঐ জেলার কিছু সংখ্যক অকৃত্রিম উপাদানের ভিত্তিতে লোক–চিকিৎসা পদ্ধতির একটি আদর্শ পরিচয় তুলে ধ'রা হ'য়েছে। তাছাড়া লোক–চিকিৎসার সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাদৃশ ও বৈসাদৃশ্য দেখাবার জন্য আমাদের দেশে প্রচলিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রভৃতিরও ইতিহাস ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ ক'রা হ'য়েছে। তার ফলে স্বতন্ত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে 'লোক–চিকিৎসা'র সম্যক পরিচয় উপলব্ধি ক'রা সহজ হবে।

আমার অগভীর জ্ঞান ও সীমিত সামর্থ্যে সম্পাদিত এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের অকিঞ্চিৎকর আলোচনা থেকে 'লোক–চিকিৎসা' সম্পর্কে কারো যদি বিন্দুমাত্র কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, আমাদের দেশের জনগণ সম্পর্কে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, তাদের আচরিত চিকিৎসা পদ্ধতির একটাও কারো অনুশীলনের বা পরীক্ষার স্পৃহা দেখা দেয়, এদেশের লোক–চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের কিছুমাত্র আকাঙ্খা উদগ্র হ'য়ে ওঠে কিংবা সেগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে প্রয়োগের সামান্যতম প্রেরণা দেখা দেয় এবং আমার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়–তবেই শ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

তথ্য–সংকেত

১. দ্রষ্টব্য ক. বদিউজ্জামান, লোক–সাহিত্য, ১৩শ খণ্ড, (ঢাকা-১৯৭৬), পৃ. ২৪–২৬৬। খ. আলমগীর জলিল ও সামীয়ুল ইসলাম, লোক–সাহিত্য, ১৭শ খণ্ড, (ঢাকা–১৯৭৯), পৃ. ১-৮৩।

২. বদিউজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৩. দ্রষ্টব্য, ড: আশরাফ সিদ্দিকী, লোক–সাহিত্য, ১৭শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, ভূমিকা।

৪. দ্রষ্টব্য, ড: এস.এম. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশী লোক বিশ্বাস, বেতার বাংলা, (মগর্চ, প্রথম পক্ষ-১৯৮১), পৃ. ৯।

৫. দ্রষ্টব্য, লোক–সাহিত্য, ১৭শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৬. এটি যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হ'ল।

৭. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, (ঢাকা-পরিবর্ধিত সংস্করণ–১৯৭৭), পৃ. ১৩৮–২৭২।

৮. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক–সাহিত্য, ২য় খণ্ড, (ঢাকা–দ্বি. সং–১৯৮০), পৃ. ১৯৫–২১৫।

৯. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক–সংস্কৃতি, (ঢাকা-১৯৭৪), পৃ. ৩৪৫–৩৯৫।

১০. দ্রষ্টব্য, এস.এম. সামীয়ুল ইসলাম ফইকরালী ও ঝাড়–ফুঁক, পূর্বাচল, (২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, কার্তিক-১৩৮৯), পৃ. ২৮–৪৬।

১১. এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম, লোক–বিশ্বাস এক দিকে আইন অন্যদিকে সুষ্ঠু জীবন–যাত্রার প্রতীক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, (২৩শ বর্ষ, ২য়-৩য়, সংখ্যা, শ্রাবণ–পৌষ-১৩৮৫), পৃ. ১০৫।

১২. দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১০৬।

১৩. এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা ক'রা হবে।

১৪. ঐ, পৃ. ১০৬।

১৫. দ্রষ্টব্য, এস.এম. সামীয়ুল ইসলাম, ফ. ঝা. ফুঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১৬. দ্রষ্টব্য, ঔষধি : প্রকৃতির অবদান, বিচিত্রা, (৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, ২৭শে ডিসেম্বর-১৯৭৪) পৃ. ৩২–৩৩।

১৭. দ্রষ্টব্য, আহমেদ নূরে আলম, দেশীয় চিকিৎসা, বিচিত্রা, (৬ষ্ঠ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৭ই মার্চ-১৯৭৮) পৃ. ১৯-২২।

১৮. দ্রষ্টব্য, ইফতেখারুল ইসলাম, বাংলাদেশের বনৌষধি, বিচিত্রা, ৪২শ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৭।

১৯. দ্রষ্টব্য, মতিউর রহমান ভূঁইয়া, দেশজ চিকিৎসা/বন্য ঔষধি, সচিত্র বাংলাদেশ, (মে বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর-১৯৮০), পৃ. ২৪-৩১।

২০. দ্রষ্টব্য, ছৈয়দ শাম ছাদত আলী, ছহি এলাজে লোকমানি বা লজ্জতে দুনিয়া, (ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা-১৩৩৮ (?) ১-৪৪।

২১. দ্রষ্টব্য, ক) মরহুম আবদুল গনি, ছহি বড় তাজ ছোলেমানি, (আলিম লাইব্রেরী, ঢাকা-১৩৮৭), পৃ. ১-১০৮। এবং এ গ্রন্থের আলোচনা। খ) ড: এস. এম. লুৎফর রহমান, লোক-চিকিৎসার বই, বই, (১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৮১), পৃ. ৮৬-৮৭।

২২. দ্রষ্টব্য, মুনশী আশরাফ উদ্দিন, ছহি আজাএব ছোলেমানি ও তাবিজাত ফালনামা, (মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৭৫), পৃ. ১-৫৫।

২৩. দ্রষ্টব্য, ক) মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম আলী, ছহি তেলোছমাত ছোলেমানী, (হামিদিয়া লাইব্রেরী-ঢাকা-১৯৬৯), পৃ. ১-১৭১।

খ) মওলানা রুহুল আমীন, তাবিজাতে রুহুল্লা, (রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-৪র্থ সংস্করণ-১৯৮১), পৃ. ১-৩৫২।

গ) মপলানা শাহ উয়ালিউল্লাহ, নাফেউল, খালায়েক, (মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-১৯৭৫), পৃ. ১-৩৬৮। এ বই মওলানা আবদুর রহিম-এর নামে বরিশালের কোরাণ মঞ্জিল লাইব্রেরী ১০৭৯ সালে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ ক'রেছে।

২৪. দ্রষ্টব্য, মতিলাল ওঝা, কামরূপী মন্ত্র বা গুফবিদ্যা শিক্ষা, (মনোরম বুক হাউস, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৭৯), পৃ. ১-১২০।

২৫. দ্রষ্টব্য, ক) নিসেন, কামরূপী টোটকা চিকিৎসা, (নাজমা বুক ডিপো, ঢাকা) পৃ. ১-৩২।

খ) আস্রাব আলী, সহজ লতাপাতার গুণ, (মফিজ বুক হাউস, ঢাকা-১৯৬৭), পৃ. ১-৪৬।

গ) ফজলুল রহমান, সহজ টোটকা চিকিৎসা (হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৩৮৪), পৃ. ১-৬৪।

ঘ) এম.এ. চৌধুরী, লতাপাতার গুণ, (হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৩৮৪), পৃ. ১-৫৬।

ঙ) রমেশ কবিরাজ, সহজ কবিরাজী শিক্ষা, (জাহানারা বুক ডিপো, ঢাকা), পৃ. ১-৫৬।

চ) ডা: কে.এম. বশির উদ্দিন, (সালমা বুক ডিপো, ৫ম সংস্করণ, ঢাকা), পৃ. ১-৪৮।

ছ) ডা: খ: মো: বশির উদ্দিন, অব্যর্থ মুষ্টিযোগ,)পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, জাহারা পাবলিশিং হাউস, পাবনা, নভেম্বর-১৯৬১), পৃ. ১-৭৮। ইত্যাদি।

২৬. দ্রষ্টব্য, শোভারাণী চক্রবর্তী, বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা, (মেদিনীপুর-১৯৭৬), পৃ. ৬৭-২২১।

২৭. দ্রষ্টব্য, গোপেন্দ্রকৃত বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, (দে:জ সন., কলি.-'৭৮), পৃ. ৪-১৯৮।

২৮. দ্রষ্টব্য, শ্রী শ্রী জীব ন্যায়তীর্থ, আচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য-লিখিত, চিরঞ্জীব বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, (কলি.-১৯৭৮), "ভূমিকা"।

২৯. দ্রষ্টব্য, আচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধি-২য় খণ্ড, (কলি-২য় মুদ্রণ-১৯৭৯)। গ্রন্থের প্রথম ভাগে সংযোজিত শেষ অভিমত।

৩০. দ্রষ্টব্য, ড: কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, (ক.বি.দ্বি. সং-১৯৭৩), পৃ. ২৭।'দেবদারু'-র বিবরণ। ১৯৭৭ সালের মধ্যে এ বই দুখণ্ডে প্রকাশিত হ'য়েছে।

৩১. দ্রষ্টব্য, ড: দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী, ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ, (কলি,-১৯৬২), পৃ. ১-৭৪।

৩২. দ্রষ্টব্য, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ভারতের বনৌষধি, (কলি.-১৩৫৩), পৃ. ১২-৪৪।

৩৩. See, Jwan Mulholand, Traditional Medicine in Thailand, Hemisphere, Vol.25.No.4 (July-August-1979), pp. 224-229.

৩৪. See, Margaret Bainbridge, Turkish Folk Medicine, Hemisphere, op.cit. pp. 258-243.

৩৫. See, o.p. Jaggi, Folk Medicine, (Delhi-1973), Second Part. Village Medicine.

৩৬. See, O.P. JaggI, Ibid, P.1.

৩৭. o.p. Jaggi, op. Cit. p.1.

৩৮. o.p. Jaggi, op.cii., p.1.

৩৯. See, o.p Jaggi. opcit., po211.

৪০. See o.p. Jaggi, All About Allppathy, Homeopathy, Ayurveda, Unismi & Nature Bure, (Delhi-1976), p. 143-160.

৪১. o.p. Jaggi, F.M., Ibid., p.1.

৪২. See, Sahab lal Srivastava, Folk Culture And oral Tradition, (Delhi-1974), 254-271.

৪৩. See, A) Sric J. Thrimmer, Medical Folklore and Quackery, Folklore, Vol. 76 (Autumm-1965).

B) Harold A. Gould, Yhe Implications of Technological Change for Folk American Folk-Medicine, Journal pf American Folklore, Vol.66 (1955) etc.

৪৪. See, Quoted by, S.L. Srivastava,

৪৫. দ্রষ্টব্য, হাকিম মুহম্মদ সায়ীদ–এর সঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার। Hemisphere, Tbid, p.216 & 223.

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির ইতিহাস ও লোক-চিকিৎসা

মানুষের আবিষ্কৃত সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে লোক-চিকিৎসাই প্রাচীনতম। কিন্তু এই চিকিৎসার কোন লিখিত ইতিহাস না থাকায়, অনেকে একে আদৌ গুরুত্ব দেন না। এমনকি লোক-চিকিৎসার যে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে, অনেকে তাও মনে ক'রেন না। তাই বর্তমান অধ্যায়ে, বাংলাদেশে অধুনা প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে লোক-চিকিৎসার ইতিহাস আলোচনা করা হবে। উক্ত উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম আলোচিত হবে কবিরাজী বা আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ইতিহাস। তারপর একে একে হেকিমী, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক ও লোক-চিকিৎসার ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখানো হবে যে, লোক-চিকিৎসা ভুঁই ফোঁড় কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নয় ; বরং অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীর মতই তারও সত্যি সত্যি সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ঐতিহ্য র'য়েছে।

ক) আয়ুর্বেদী চিকিৎসা

পৃথিবীর উন্নত প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের অন্যতম আয়ুর্বেদী চিকিৎসা। এ চিকিৎসার 'প্রকৃত ইতিহাস' ও পৌরাণিক ইতিহাস এক নয়। আয়ুর্বেদী চিকিৎসার 'পৌরাণিক ইতিহাস', 'চরক' এবং 'সুশ্রুত' অনুযায়ী দ্বিবিধ।

'চরক-সংহিতা' অনুযায়ী স্রষ্টা ব্রহ্মাই আদি ভিষগ। তাঁর নিকট থেকে প্রজাপতি দক্ষ এবং দক্ষের নিকট থেকে দেবতাদের 'ডাক্তার' যমজ অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা ক'রেন। শেষোক্ত দুজনের নিকট থেকে অমরদের প্রভু ইন্দ্র এই 'বেদ' (জ্ঞান) লাভ ক'রেন। আর ইন্দ্রের নিকট থেকে আয়ুর্বেদ শেখেন ভরদ্বাজ মুণি। তিনি যাঁদের এবেদ শিক্ষা দেন, তাঁদের অন্যতম পুনর্বসু আত্রেয়। আত্রেয় তাঁর ছ'জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদবিদ্ হ'তে সাহায্য ক'রেন। আর তাঁদের নিকট থেকে এ বিদ্যা শেখেন অপরাপর চিকিৎসক মুণিঋষি।"[১]

কিন্তু সুশ্রুত-সংহিতার বক্তব্য ভিন্ন। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে কাশীরাজ দিবোদাস একদিন আশ্রমে ঋষিগণ কর্তৃক আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানে অনুরুদ্ধ হন। অনুরোধকারীদের অন্যতম ছিলেন সুশ্রুত। দিবোদাস শল্যজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে যে চিকিৎসার উপদেশ দেন-তাই সুশ্রুত-সংহিতার ভিত্তি। এই উপদেশ দিতে গিয়ে দিবোদাস আয়ুর্বেদের উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা সম্পর্কে ব'লেন—"ব্রহ্মা প্রথমে আয়ুর্বেদ প্রচার ক'রেন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর নিকট এই বেদ

অধ্যয়ন ক'রেন। তারপর তিনি এ জ্ঞান দান ক'রেন-অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে। তাঁদের নিকট থেকে আবার আয়ুর্বেদী জ্ঞান লাভ ক'রেন ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট থেকে আমি (দিবোদাস)। প্রথমে ব্রহ্মাই স্বর্গে এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অর্থিগণকে প্রদান ক'রেন। কিন্তু এই মর্ত্যলোকে প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি-ই প্রথমে আয়ুর্বেদ শিক্ষাভিলাষী জনগণকে এ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিব।"[২] বলাবাহুল্য, কাশীরাজ দিবোদাস কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সন্দেহ। আর তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হ'লে, তাঁর পূর্বে মর্ত্যে 'চিকিৎসাবিদ্যা'র প্রচলন ছিল না-একথা সত্য নয়। সুশ্রুতের নিকট ইনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে ব'লেছেন-"আমি সাক্ষাৎ *ধন্বন্তরি*, আমি আদি দেব, এবং আমিই অমরগণের জ্বরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নাশক। (ইহা দ্বারা এই উক্ত হইল যে, পূর্বে" দেবতাদিগেরও জ্বরাদি ছিল, আমাকর্তৃকই তাহাদিগের সেই জ্বরাদি দূরীকৃত্য হয়)। পূর্বে আমি দেবকার্য সম্পাদনায় স্বর্গে ছিলাম, এখনে আমি মনুষ্যকার্য সম্পাদনার্থে....এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি।"[৩]

চরকের কিন্তু এরকম কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধানে চরক সম্পর্কে বলা হ'য়েছে-"আয়ুর্বেদ-বেত্তা ঋষি। (ইনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, *ধন্বন্তরি*, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশের নিকট যথাক্রমে সূত্র, শারীর স্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি এই অষ্টস্থান শিক্ষা করিয়া চরক-সংহিতা নামে গ্রন্থ-প্রচার ক'রেন)।"[৪]

'ব্রহ্মবাদী' এইসব পৌরাণিক গল্পোতিহাসের হাস্যকর বিবরণ উপেক্ষণীয়। আয়ুর্বেদের প্রকৃত ইতিহাস গল্পের মধ্যে নয়—গ্রন্থের মধ্যেই নিহিত। সেদিক থেকে অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায়, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির সুপ্রাচীন নিদর্শন বেদের মধ্যেই তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্তমান। কিন্তু আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গটি 'বেদ' থেকে শুরু করার আবশ্যকতা নেই। কারণ তখনও আয়ুর্বেদের উৎপত্তি হয়নি। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে 'অথর্ববেদের পর থেকে আয়ুর্বেদের উৎপত্তিকালের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ গ্রন্থে আয়ুর্বেদের কোন উল্লেখ নেই। গো-পথ ব্রাহ্মণে 'সর্পবেদ', 'পিশাচবেদ', ও 'অসুরবেদে'র এবং 'ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে', 'অর্থবেদ', 'সর্পবিদ্যা', 'পিতৃয়বিদ্যা', 'ভূতবিদ্যা' প্রভৃতি অধ্যয়নের উল্লেখ থাকলেও আয়ুর্বেদের কোন কথা নেই। সেজন্য ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের যুগে আয়ুর্বেদ রচিত হয়নি ব'লে ধারণা করা হয়।"[৫] তদুপরি আধুনিক আয়ুর্বেদী চিকিৎসার আদিতম গ্রন্থ 'চরক-সংহিতা'র মূল রচনা খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে চরকের আবির্ভাব ব'লে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।"[৬] চরকের সমসাময়িক কিংবা কিছু পরবর্তীকালে সুশ্রুতের আবির্ভাব। তার নামে পরিচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা'ও আয়ুর্বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন গ্রন্থ।

বস্তুতঃপক্ষে চরক-সংহিতা আয়ুর্বেদী ওষুধ বা 'মেডিসিনে'র গ্রন্থ আর 'সুশ্রুত-সংহিতা' আয়ুর্বেদী শল্যবিদ্যা বা 'সার্জারী' সংক্রান্ত গ্রন্থ। দুটি গ্রন্থই আয়ুর্বেদী চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হলেও চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় দুটি বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লাভ করা যায়।

চরক-সংহিতার দার্শনিক ভাবাকাশটি যাদু-ধর্মমূলক বা magico-religious প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত। পক্ষান্তরে, সুশ্রুত-সংহিতার দার্শনিক ভিত্তি, প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী দেহাত্ম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শল্যতন্ত্রকে ভিত্তি ক'রে শুশ্রুতের আয়ুর্বেদ-রচনা তাই চরক-পরবর্তী ব'লে মনে হয় এবং এর সঙ্গে সাংখ্যদর্শন ও নয়া বৈশেষিক মতের সম্পর্ক আছে ব'লে ও.পি. জ্যাগগি যে অভিমত দিয়েছেন—তা যথার্থ ব'লে মনে করা স্বাভাবিক। জ্যাগ্‌গি ব'লেছেন—"The change in the outlook of medicine from the magico-religious to the physilogical causation and theories could be the result of the philosophical concepts of the Naya-Vaiseshika and the Samkhya on which the theoretical structure of the Ayurveda came to be based."[৭]

সুশ্রুত-সংহিতায় প্রাচীন ভারতীয় দেহাত্মবাদী দর্শনের প্রভাব এইখানে যে, বালকদের শুক্র আছে কিনা, তা' ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে সুশ্রুত ব'লেছেন-"মুকুলে গন্ধ আছেই, কারণ যাহা আছে, তাহার-ই অভিব্যক্তি হয়, যাহা নাই, তাহার অভিব্যক্তিও নাই।"[৮] এটি পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী দেহাত্মবাদ ও লোকায়ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

চরক তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী চিকিৎসা শাস্ত্রের দুটি শাখার উল্লেখ ক'রেছেন—'তন্ত্র' ও 'কল্প'। তাঁর মতে 'তন্ত্র' তিন রকম। যথা,—'অগাদাতন্ত্র', 'রসায়ন তন্ত্র', ও 'বাজীকরণ তন্ত্র',। ওষুধের বিভিন্ন বিভাগই এতন্ত্রগুলোর এক একটির বৈশিষ্ট্য। আর 'কল্প' ব'লতে ওষুধ বিজ্ঞানকে বোঝানো হ'য়েছে। যেমন যবাগুকল্প, হরিতক কল্প, চিত্রক কল্প, শিলাযুত কল্প ইত্যাদি। চরক সমস্ত আয়ুর্বেদী ওষুধকে সর্বমোট পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা,-জীবনীয়, বৃংহনীয়, লেখনীয়, ভেদনীয়, সন্ধানীয়, দীপনীয় ইত্যাদি।"[৯] তিনি অথর্ববেদের জল, বায়ু ও অগ্নিকে কক্ষ, বাত ও পিত্তে পরিবর্তিত ক'রেছেন এবং এগুলোকে ব'লেছেন 'দোষ'। কেউ কেউ এগুলোকে 'ধাতু' নামেও নির্দেশ ক'রেছেন। চরকের মূল গ্রন্থ বর্তমানে কোথাও নেই। আধুনিক চরক-সংহিতা নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরের *দুর্বল* কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত। সেজন্য মূল চরক-মত এখন দুর্জ্ঞেয়। তথাপি রোগ-নির্ণয়, রোগ-নিরাময় ইত্যাদি সম্পর্কে চরক যে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার্য। তাঁর সময় চিকিৎসা বিদ্যা যথার্থই সমৃদ্ধি অর্জন ক'রেছিল।

চরকের পর সুশ্রুত আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসার উন্নয়ন সাধন ক'রেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদী শারীর সংস্থান বিদ্যার যে পরিচয় রেখে গিয়েছেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কারণ শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন না থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃতদেহকে লোকায়ত উপায়ে উপলব্ধির চমৎকার নির্দেশ দিয়েছেন। লিখেছেন—"*শল্যাপহতা* যদি নিঃসংশয় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ক'রেন, তাহা হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সম্যকরূপ দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য।"[১০] এ ধরণের জ্ঞানার্জনের জন্য যে রূপ শব, যেরকম দর্শন করা আবশ্যক-তার বিবরণ দিতে বলা হ'য়েছে—"শবটির যেন সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধি-পীড়িত না হইয়া থাকে, শতবর্ষ বয়স্কের দেহ না

হয়। এইরূপ শবের অন্তঃপূরীয় *নিস্কাশন* করিয়া কোন নির্জন প্রদেশে তাহা একটি স্রোতোহীন জলাশয়ে *পচাইবে*। মৎস্যাদিতে *ভক্ষণ* করিতে না পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এইজন্য সেই জলাশয়ের জলের মধ্যে একটি মাচা বান্ধিয়া তাহার উপর ঐ শবকে রাখিতে হইবে এবং মুঞ্জ *বল কুশ* ও শনাদি রজ্জুর কোন রজ্জু দ্বারা তাহার সর্বায়ুরবেষ্টন করিয়া বান্ধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেনার মূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গসমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে।"[১১]

সুশ্রুত–সংহিতা অবশ্য চরক–সংহিতার মত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হ'য়েছে। কারো কারো মতে... .." চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর নাগার্জুনই সুশ্রুত–সংহিতা নূতন করিয়া লেখেন এবং মূল গ্রন্থের কিছু কিছু পরিবর্তন, সংস্কার–সাধন ও সম্প্রসারণ ক'রেন। সুশ্রুত চন্দ্রিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জুনের পাঠ বলিয়া যে পাঠটি চলিয়াছে তাহা বর্তমান সুশ্রুতেরই পাঠ।"[১২]

অতঃপর আয়ুর্বেদের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত, বাওয়ার পাণ্ডুলিপি বা 'নবনীতক'–এর নাম উল্লেখযোগ্য। সমরেন্দ্রনাথসেন লিখেছেন– "নবনীতক অনেকটা চরক–সংহিতার অনুকরণে রচিত। ইহাতে যোগ–চিকিৎসা প্রণালী ও ভেষজ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে।.......(তাছাড়া) বিবিধ চক্ষু ও চর্মরোগ ও তাহাদের চিকিৎসা হৃদরোগ, কুষ্ঠ ও ইরিসেপেলাস রোগের ঔষধ ইত্যাদি এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।"[১৩]

উল্লেখযোগ্য যে, নবনীতক খৃষ্টীয় চতুর্থ–পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তলিপিতে রচিত বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ খণ্ডিত। প্রাপ্ত রচনা ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত। এতে চরকের কোন উল্লেখ নাই।

সম্ভবত: সপ্তম শতকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন কোন সংকট দেখা দেয়। সেই সংকট উত্তরণের জন্য সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত আয়ুর্বেদী চিকিৎসক বাগভট 'অস্টাঙ্গ সংগ্রহ' রচনা ক'রেন। হয়তো চরক–সংহিতা তখন বিলুপ্ত কিংবা বিকৃত হ'য়ে পড়ে। ফলে বাগভট নতুন ক'রে আয়ুর্বেদের 'অষ্টাঙ্গ' সংগ্রহ ক'রেন এবং তা কালোপযোগী রূপ দেন। এ সম্পর্কে চৈনিক পরিব্রাজক আই সিং (৬৭৫–৬৮৫ খৃ: পর্যন্ত তিনি নালন্দায় অবস্থান ক'রেন) তাঁর 'রেকর্ডস অব বুদ্ধিস্টস প্রাক্‌টিসেস' গ্রন্থে লিখেছেন—"প্রাচীনকালে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র (আয়ুর্বেদ) আটটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি এক বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্ এই আটটি অংশকে একত্রিত করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের সর্বত্র চিকিৎসকেরা এই গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন।"[১৪] আলোচ্য গ্রন্থটি পাঁচভাগে ও এক শ' পঞ্চাশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বাগভট্ চরক ও সুশ্রুত–এর চিকিৎসা বিষয়ক দর্শন বিশেষ আমল দেননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বক্তব্য উপস্থাপন ক'রেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চরক ও সুশ্রুত অনুযায়ী 'ধাতু–সাম্য'ই স্বাস্থ্য, আর 'ধাতু–বৈষম্য'ই রোগ। পক্ষান্তরে বাগভট অনুসারে 'দোষ–সাম্য'ই স্বাস্থ্য, আর 'দোষ–বৈষম্য'ই

রোগ।"[১৫] এমনিভাবে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহে বাগভটের অনেক মৌলিক চিন্তাভাবনার নিদর্শন বিদ্যমান।

অতঃপর খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে মাধব কর 'মাধব-নিদান' রচনা ক'রেন। অদ্যাপি এ গ্রন্থই 'নিদান' নামে পরিচিত ও জনপ্রিয়। গ্রন্থটি আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য। কেননা, এগ্রন্থে রোগ ও তার কারণ বা উৎপত্তি এবং লক্ষ্মণাদি ভেদ বিশদরূপে বর্ণিত হ'য়েছে। সুচিকিৎসক হিসেবে মাধবের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর 'নিদান' সমকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন ক'রে। আরবী ভাষায় এ গ্রন্থ অনূদিত হয়। আলোচ্য শতকেই চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরব জাতির নিকট পরিচিত ক'রে তোলে। 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংগ্রহ' তিব্বতী ভাষায়ও অনূদিত হয়। এসব গ্রন্থের প্রচুর টীকাটিপ্পনিও রচিত হ'য়েছে।

অতঃপর আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাঙালী, 'বৈদ্য' চক্রপাণি দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। 'আয়ুর্বেদ দীপিকা' ও 'চক্রদত্ত' নামীয় গ্রন্থ ছাড়াও তিনি চরক ও সুশ্রুত-সংহিতার দুটি টীকা রচনা ক'রেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নাম যথাক্রমে 'চক্রতত্ত্ব দীপিকা' ও 'ভানুমতী টীকা'। তাঁর 'মুক্তাবলী' ওষুধ বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ। অরুণ কুমার চক্রবর্তী, তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন-"চক্রপাণিই প্রথম বৈদ্য যিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে খনিজ পদার্থ মিশিয়ে ওষুধ প্রস্তুত ক'রেছিলেন।"[১৬] এছাড়া "রাসায়নিক হিসেবেও চক্র পাণিদত্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল।"[১৭] ইনি গৌড়েশ্বর নয়পালের সময় (১০৩০-১০৪৫ খৃষ্টাব্দ) জীবিত ছিলেন।

ভারতীয় আয়ুর্বেদী চিকিৎসার পরবর্তী খ্যাতিমান চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ডহণ। ইনি 'নিবন্ধ'-সংগ্রহ' নামে সুশ্রুত-সংহিতার টীকা রচনা ক'রেন। দ্বাদশ শতকে জীবিত, তিষ্ঠাচার্যের 'চিকিৎসা কলিকা'-গ্রন্থেও আয়ুর্বেদের অগ্রগতির নিদর্শন লাভ করা যায়। ভারতীয় গ্রন্থকারদের রচনার মধ্যে এ গ্রন্থেই আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ-নিরূপণের জন্য নাড়ী পরীক্ষার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১৮] ত্রয়োদশ শতকে শাঙ্গধর বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে নাড়ী পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর 'শাঙ্গধর-সংহিতা' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি তিন খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থের "প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য নানারূপ রাসায়নিক ও যৌগিক মিশ্রণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত এইসব ঔষধের মধ্যে ধাতব, পারদ ও আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ উল্লেখযোগ্য। উদয় চাঁদ দত্ত তাহার 'The Materia Medica of the Hinds'- গ্রন্থে লিখিয়াছেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পারদ, তাম্র, টীন, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ভস্মীকরণ ও প্রস্তুত-প্রণালী এবং ঔষধ হিসাবে ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে শাঙ্গধরের আলোচনাই সম্ভবত প্রাচীনতম।"[১৯] কিন্তু সমরেন্দ্রনাথ সেন, এর প্রতিবাদ ক'রে লিখেছেন—"ইহা অবশ্য ঠিক নহে। শাঙ্গধরের পূর্বে চক্রপাণি বৃন্দ, বাগভট ও নাগার্জুন ঔষধার্থ ধাতব-যৌগিকের ব্যবহার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।"[২০] স্মরণীয় যে, নাগার্জুনের কোন নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ণয় করা কঠিন। চক্রপাণি দত্তের গ্রন্থে 'পারদ' এবং 'গন্ধকে'র অতি সামান্য উল্লেখ বিদ্যমান। এথেকে উদয় চাঁদ ঠিক-ই মনে

ক'রেছেন যে, সেই যুগের ভারতীয় মুসলমান ইউনানী চিকিৎসকদের প্রভাবে, এগুলো তখন সবেমাত্র চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়া শুরু ক'রে। চক্রপাণির গ্রন্থে আফিমের উল্লেখ নেই। মাধবক'রের 'নিদানে'ও আফিমের উপস্থিতি লক্ষণীয় নয়। 'শাঙ্গধরে' আফিম-ব্যবহারের নিদর্শন বিদ্যমান। অতএব শাঙ্গধরের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে এগুলোর উল্লেখ সন্দেহাতীত নয়।

ত্রয়োদশ শতকের আর একজন লেখক কাশ্মীরে বৈয়াকরণ বৈদ্য নরহরির 'রাজনিঘন্টু' বা 'অভিধান চূড়ামণি' ভেষজবিদ্যার একখানি অভিধান বিশেষ। এ গ্রন্থ বৈদ্যক মহলে আজও সমাদৃত।

ভারতীয় আয়ুর্বেদী চিকিৎসার সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ষোড়শ শতকের ভাবমিশ্র।' তিনি ছিলেন কাশীর অধিবাসী। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'ভাব-প্রকাশে' বিভিন্ন রকম নাড়ী-পরীক্ষার উল্লেখ ছাড়াও, অনেক নতুন ওষুধ ও নতুন রোগের বিবরণও বিদ্যমান। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে আফিম ও পারদের ব্যাপক ব্যবহার-এর উল্লেখ ক'রেছেন।"[২১] তাছাড়া 'সুলেমানি খেজুর', 'পারসিক বচ' প্রভৃতির প্রয়োগের কথাও ভাবমিশ্রে বিদ্যমান। তিনিই প্রথম 'ফিরিঙ্গি' (ফিরঙ্গি) বা 'সিফিলিস' রোগের উল্লেখ ক'রেছেন। এক রকম চীনা মূল বা 'তোর চিনি'র দ্বারা এরোগ তিনি নিরাময় ক'রতেন।"[২২]

ভাবমিশ্রের পর, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্তর কোন প্রতিভার জন্ম হয়নি। ইতোমধ্যে উপমহাদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসার অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা ; আয়ুর্বেদ-ইউনানী প্রভৃতি দেশীয় চিকিৎসার বিকাশ, একেবারে রুদ্ধ ক'রে দেয়।

খ) হেকিমী চিকিৎসা

'হেকিমী চিকিৎসা' বলতে 'আরবীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে'ই বোঝায়। আরবীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল-গ্রীক বা 'ইউনানী' চিকিৎসা-রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য এই চিকিৎসাকে 'ইউনানী চিকিৎসা' নামেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু গ্রীক চিকিৎসা পদ্ধতি ও পরবর্তীকালের আরব-চিকিৎসা পদ্ধতি হুবহু এক নয়, বরং অনেক পৃথক। সারা বিশ্বে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির বর্তমান রূপের প্রায় সবটাই আরবীয়, ইরানীয়, স্পেনীয়, তুর্কী ও ভারতীয় মোগল তথা মুসলিম সভ্যতার অবদান। এজন্য অধুনা এ চিকিৎসা-রীতিকে 'মুসলিম চিকিৎসা প্রণালী' কিংবা 'ইসলামী চিকিৎসা' বা 'ইসলামিক মেডিসিন'ও ব'লে।

অবশ্য চিকিৎসা একমাত্র আরবগণ কিংবা একমাত্র মুসলমানরাই হেকিমী চিকিৎসার চর্চা ও সমৃদ্ধির দাবীদার নন। আলোচ্য চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে অন-আরব মুসলমান মণীষীদের অবদান অধিক। এমনকি ইহুদী, খৃষ্টান, স্পেনিশ ও হিন্দু কোন কোন মণীষীর প্রতিভাও হেকিমী চিকিৎসাকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত যেহেতু মুসলমানরাই এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা, সে জন্য ইউনানী চিকিৎসা 'হেকিমী চিকিৎসা', 'মুসলিম চিকিৎসা' ও 'ইসলামী চিকিৎসা' সমার্থক

হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাগদাদ-কেন্দ্রিক আরব সভ্যতা আলোচ্য চিকিৎসা পদ্ধতির পুনর্গঠনে ধাত্রীর কাজ ক'রেছিল ব'লেই-একে সঙ্গতভাবেই আরবীয় চিকিৎসা-প্রণালী বলা চলে।

ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায়, মূলত আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনামলে (৭৫০--১২৫৮ খৃ:) বাগদাদকে কেন্দ্র ক'রে নবোত্থিত ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। আরবদের হাতে বাইজেণ্টাইন ও রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ফলে, প্রাচীন ইরান, মিশর ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে। তাঁরা এগুলোর চর্চায় উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন এবং গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-ই তাঁদের অধিক আকর্ষণ ক'রে। অচিরেই গ্রীক, মিশরীয়, ইরানীয় ও ভারতীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ শুরু হয়। তারপর মাত্র একশ' বছরের মধ্যেই মুসলিম মনীষীগণ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নিজস্ব অবদান রাখা শুরু ক'রেন। তাঁদের মনীষার বিশেষত্ব ক্রমশ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা সগৌরবে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরবীয় 'তিব্বে'-র ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধির জন্য একে সাধারণত: তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। যথা,-উদ্ভব যুগ (৬১০ খৃ:-৭১৮ খৃ:), বিকাশ ও বিস্তৃতির যুগ (৭১৯ খৃ:-১৭৫০ খৃ:) এবং অবক্ষয়ের যুগ (১৭৫১ খৃ:-বর্তমান কাল পর্যন্ত)। কেউ কেউ একে চারটি যুগেও বিভক্ত ক'রেছেন।"[২৫] উপর্যুক্ত তিনটি যুগকে নিম্নে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ হিসেবে আলোচনা করা হবে।

১. প্রথম যুগ (৬১০খৃ:—৭১৮ খৃ:)

উল্লেখযোগ্য যে, হজরত মুহম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের সময়ে (৬১০ খৃষ্টাব্দ থেকে আরবদেশে বিশেষত মক্কা-মদীনায় জ্ঞানচর্চার অস্তিত্ব ছিল। অভিজাত শ্রেণীর মক্কা ও মদীনাবাসীরা উৎকৃষ্ট কবিতা, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতির চর্চা ক'রতেন। ঐ সময় ইরানের অন্তর্গত জুন্দি-শাহপুর ছিল বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র। তখনকার আরব অভিজাত বংশীয়দের অনেকে শিক্ষালাভের নিমিত্ত জুন্দিশাহপুর গমণ করতেন। তথায় জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রীক মনীষীদের অবদান সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। চিকিৎসাবিদ্যাও তা' থেকে বাদ ছিল না। রসুলুল্লাহর সময়ে জীবিত পৌত্তলিক শিক্ষিত আরব-চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন-জুন্দিশাহপুর থেকে শিক্ষা-প্রাপ্ত হারিস বিন কালদাহ। ড: মুহম্মদ জুবায়ের সিদ্দিকী তাঁর সম্পর্কে 'স্ট্যাডিজ ইন অ্যারাবিক অ্যান্ড পারসিয়ান মেডিক্যাল লিটারেচার' গ্রন্থে লিখেছেন—

"According to him, Medicine should be avoided when possible, and the use of clysters is the best remady for stomach troubles. About the eye, he says that it is constituted of fat, which is the white part, of water, which is the black part, and of wind, which constituted the eyesight. All this, bizarre as it may seen to us, goes to show the acquaintance of al-Harith with the

Hippocratic system."[২৬] অতএব, জুন্দিশাহপুর-সূত্রে, পুরোপুরি গ্রীক চিকিৎসা-দর্শন, আইয়ামে জাহেলিয়াৎ-এর যুগেও যে আরবদেশে প্রচলিত ছিল তা' সত্য।

ইসলামের আবির্ভাবের পর এ প্রভাব উৎখাত হয়নি ; বরং ক্রমশ ব্যাপকতর ও গভীরতর হ'য়েছে। হজরত নিজে কোরান শরীফের কোন কোন সুরার সাহায্যে রোগ-নিরাময় করতেন। 'যাদুমুক্তি'র ক্ষেত্রে 'সুরা নাছ' ও 'সুরা ফালাকে'র ব্যবহার প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। এছাড়া ওষুধ হিসেবে তিনি মধু, তেল, সোনামুখী লতা ও পাতা, 'আন্টিমণি' ইত্যাদিও ব্যবহার করতেন এবং অন্যকেও তা প্রয়োগের উপদেশ দিতেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে, তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেও বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আরবীতে রচিত হয়নি। একমাত্র ৭১৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই আরবী ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থের প্রকাশ ঘটতে থাকে।"[২৭] পূর্বেই বলা হ'য়েছে-গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই আরবীয় দর্শন ও বিজ্ঞান-সাহিত্যের সূচনা হয়। অসকার ডেভিড নামক জনৈক ফরাসী, তাঁর ডায়রীর একস্থানে লিখেছেন-মূলত তিনটি উপায়ে চিকিৎসাবিদ্যা গ্রীস থেকে আরবে যায়। যথা,—

১. মৌখিক সূত্রে-একে অন্যকে শেখানোর মাধ্যমে

২. শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে-শিক্ষালাভের ফলে ও

৩. অনুবাদ-মাধ্যমে।"[২৮]

বস্তুত: শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে এডেসা, নিসিবিস, মার্ভ ও জুন্দিশাহপুরের প্রভাব এবং মৌখিক সূত্র অপেক্ষা অনুবাদের ভূমিকাই ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। আব্বাসীয় খলিফাদের দূরদর্শী দৃষ্টি উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা অনুবাদ কার্যে বিশেষ সহায়ক হয়। আর তার ফলেই আরবীয় চিকিৎসাবিদ্যার 'বিকাশ ও বিস্তৃতির যুগ' দ্রুত সূচিত হয়।

২. দ্বিতীয় যুগ (৭১৯—১৭৫০ খৃ:)

'আরব্য বিজ্ঞানে অনুবাদের যুগ' সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন-"৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আল মানসুর সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে জুন্দিশাহপুর বিদ্যাপীঠ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নেষ্টোরীয় (খৃষ্টান) চিকিৎসক জির্জিস ইবন বুখতিশু খলিফার চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাগদাদে আসেন এবং তাঁহার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ রাজচিকিৎসক হিসেবে বাগদাদেই থাকিয়ে যান। বাগদাদে তাঁহার আগমণ আরব্য বিজ্ঞানের উন্নতির দিক হইতে বিশেষ শুভ হইয়াছিল। তিনি আরবীয় ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ ক'রেন। জির্জিস অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার পুত্র ও জুন্দিশাহপুর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ দ্বিতীয় বুখতিশু রাজচিকিৎসক হিসাবে বাগদাদে আহুত হন। তিনি প্রথমে আল মানসুরের ও পরে হারুন-অর-রসিদের সভায় ছিলেন। দ্বিতীয় বুখতিশুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জিব্রাইল রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই জিব্রাইল-ই গ্রীক বিজ্ঞানের, বিশেষত: চিকিৎসাবিদ্যার, গ্রন্থগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি

খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেন।...জিব্রাইলের পরামর্শমত হারুন নানা বিষয়ে মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের রোমক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ এবং তর্জমার জন্য অভিজ্ঞ অনুবাদকদের নিযুক্ত ক'রেন।"[২৯] বস্তুত খলিফা হারুন-অর-রশীদের ওপর জুন্দিশাহপুরের এই বিদ্যাপীঠ এবং খৃষ্টান চিকিৎসক বংশ ছাড়াও পূর্ব পারসীকদের অন্যতম শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র খোরাসানের রাজধানী মার্ভ এবং তথাকার বার্মেকী বংশীয় পণ্ডিতদের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে।

বলা বাহুল্য, ক্রমে ক্রমে শুধু গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গেও মুসলিম মনীষীদের সংযোগ স্থাপিত হয়। ফলে সিরীয়, পাহ্লভী, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ চলতে থাকে। আল-বিরুণীর রচনা থেকে জানা যায়—অষ্টম শতাব্দীতেই ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ চরক-সংহিতা আরবীতে অনূদিত হয়। এই পর্বে যে সব অনুবাদক বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেন, তাঁদের মধ্যে আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক, হুনায়েন ইব্নে ইসহাক, হুবায়েশ ইবন আল হাসান, থাবিত ইবন কুবরা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব অনুবাদকের মধ্যে আল বাতরিক স্বয়ং চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ ক'রেন। "সর্বশ্রেষ্ঠ আরব অনুবাদক হুনায়েন ইবনে ইসহাক "—এক গ্যালেনেরই কুড়িখানি গ্রন্থ সিরীয় ভাষায় ও চোদ্দখানি আরবী ভাষায় অনুবাদ ক'রেন। এই গ্রন্থের এই গ্রন্থের অনুবাদ-সাফল্যের ফলে তাঁহার সময় হইতেই আরব ছাত্ররা আলেজান্দ্রিয়ায় চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্য গ্যালেনের (আঠারো খানি পুস্তক).... আরবী ভাষায় অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে।"[৩০] কিন্তু দশম শতাব্দীর পর থেকে আরবদের বাগদাদ কেন্দ্রিক অনুবাদ-তৎপরতা হ্রাস পেতে থাকে এবং মৌলিক রচনার ও স্বাধীন মতামত সম্পন্ন গবেষণার সাহায্যে নতুন তত্ত্বও তথ্য উপস্থাপনের যুগ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় জৈবরসায়নের ব্যাপক ভূমিকার কথা স্মরণ ক'রে 'বৈজ্ঞানিক দিক থেকে রসায়নের উৎপত্তির কথা বিবেচনা ক'রলে, আরব-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের গৌরবময় যুগের সূচনা-অষ্টম শতকেই। তাই আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাসে আরবদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বেটি এস, বার্গার্সেন অষ্টম শতক থেকে আলোচনা শুরু ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন—

"In the eighth century the Arabs spread over the Holyland, the *Egypt* North Africa, and Spain and began a supremacy that lasted over 500 years. They were especially interested in medicine, pharmacy and chemistry and built hospitals and schools for the pursuit of their study. They carried forward the knowledge obtained from Greece and Rome and preserved the pharmaceutical art from the sixth to the sixteenth centuries. The teachings of Hippocrates and Galen which had been translated into Arabic in the seventh century, furnished much of their material."[৩১]

বার্গার্সেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরবীয় অবদানের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই সর্বপ্রথম রসায়নবিদ জবির ইবনে হাইয়ান-(৭২০–৮১৩)-এর নামোল্লেখ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন— "He is the reputed discoverer of sulfuric acid, nitric acid, nitrohydrocloric acid, corrosive sublimate, and caustic."৩২

এছাড়া "জাবিরের মৌলিক গবেষণার মধ্যে সীস-শ্বেত বা লেড–কার্বনেট প্রস্তুতবিধি, সালফাইড লবণ হইতে অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক নিষ্কাশনের উপায়, সির্কার পাতন–ক্রিয়ার সাহায্যে সির্কাম্ল বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রস্তুতি, ইস্পাত উৎপাদন প্রণালী ও ধাতুশোধন পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বস্ত্র ও চামড়া রাঙাইবার উদ্দেশ্যে বিবিধ রঞ্জক দ্রব্যের ব্যবহার, কাঁচশিল্পে ম্যাঙানিজ ডাই অক্সাইডের ব্যবহার ইত্যাদি, ফলিত রসায়নের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আলোচনা ক'রেন। *এম্পিডক্লেস*-অ্যারিস্টটল প্রস্তাবিত চারি মৌলিক পদার্থের সহিত তিনি আরও দুইটি মৌলিক পদার্থ যোগ ক'রেন ; ইহারা হইল পারদও গন্ধক।"৩৩ জাবির-এর পারদ-গন্ধক মতবাদ সম্পৃক্ত আরব আলকিমিয়া বিদ্যা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সারা ইউরোপকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।

অতঃপর নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ক্লিনিশীয়ান, গবেষক ও চিকিৎসক আবুবকর মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর–রাজি (৮৫০–৮৬৬–৯২৩/৯২৫ খৃ:)–র উল্লেখ করা আবশ্যক। আল্‌রাজি ৩০ বৎসর বয়সে জন্মভূমি ইরান থেকে বাগদাদ গমন ক'রেন এবং এখানে সাইল ইবনে রাবান নামক একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের সান্নিধ্যে এসে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসা–বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও চিকিৎসা–কর্মে দক্ষতা অর্জন ক'রেন। আল–রাজি একমাত্র চিকিৎসা ও ভেষজ সম্বন্ধে শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। এগুলোর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও অমর চিকিৎসা–গ্রন্থ "আল–হাওই'। ১২৭৯ ও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্রেসিয়া ও ভেনিস থেকে এর যে ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় তা মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিকিৎসা–বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ক'রে। আলোচ্য গ্রন্থ ১৯৬৭ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদ–এর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে ও.পি. জ্যাগগি লিখেছেন—"Going through the contents of Al-Haiwi, any medical man, even in modern times, will come to have a high regard for the competence and skill of the author in recognizing different diseases, differentiating similar-looking diseases, their classification and the method adopted to treat them."৩৪ এ গ্রন্থে লেখক গ্রীক, ভারতীয় ও সিরীয় চিকিৎসা–পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা ক'রেছেন এবং যথাস্থানে প্রয়োজনবোধে স্বীয় চিকিৎসক–জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথাও লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সকলের সর্বদা ব্যবহারোপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় রাজি দশ খণ্ডে এর একটি সংক্ষিপ্তসার হিসেবে 'আল–মানসুরী' গ্রন্থটি রচনা ক'রেন। ৪৮১ খৃস্টাব্দে মিলান *থেকে?* এর ল্যাটিন তর্জমা প্রকাশিত হয় এবং মধ্যযুগের সমগ্র ইউরোপে গ্রন্থটি জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

বিভিন্ন রোগ সম্পর্কেও তিনি পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ক'রেন। এগুলোর মধ্যে বসন্ত ও হামের ওপর রচিত 'আল-জাদাবী' নামক গ্রন্থটি তাঁর বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর। জর্জসার্টন এ গ্রন্থকে মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। তাছাড়া এ হল ...."first work ever to appear on amall pox and measles in an integrated form, and also the first to distinguish one from the other."[৩৫]

মূত্র-পাথরী সম্বন্ধেও তিনি একটি আলাদা গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন।

বস্তুত: তিনি-ই "was the first physician known to have refused to surrender to the authority of Galen's erroneous doctrines."[৩৬] এসব কারণেই তাঁকে বলা হ'য়েছে—"probably the greatest and the most original of all the Muslim physicians and, one of the most *prolific* writers."[৩৭]

এ শতাব্দীর আলী আব্বাস-(মৃ: ৯৯৪ খৃ:) লিখিত 'আল কিতাব আল-মালিকী' ও একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন-"চিকিৎসা শাস্ত্রের ইহা এক বিশ্বকোষ বিশেষ এবং এই পুস্তকে ব্যবহারিক ও যুক্তিমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। 'কিতাব আল-মালিকী', আল-রাজির 'কিতাব আল হাওয়াই' অপেক্ষা অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ এবং আলোচনাগুলিও অনেক সংক্ষিপ্ত।"[৩৮]

বাগদাদ-কেন্দ্রিক মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানে দশম ও একাদশ-শতাব্দীর তো বটেই, এমন কি হয়তো সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-প্রতিভা আবু আলী আল্ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ:)-র নাম উল্লেখযোগ্য। হেকিমী-চিকিৎসার রূপকার হিসেবে, তার অবদানের অত্যন্ত গুরুত্বের জন্যই এ চিকিৎসাকে 'অভিসেনীয় চিকিৎসা'ও ব'লে। কেননা, ইউরোপে তিনি অভিসেনা নামে সুপরিচিত। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর চিরায়ত গ্রন্থ 'আল-কানুন ফিল-তিব্ব, সংক্ষেপে 'কানুন' নামে পরিচিত। আলোচ্য 'কানুন' সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হ'য়েছে—"চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিরাট বিশ্বকোষে সে যুগের পরিচিত সর্বপ্রকার ঔষধের বর্ণনা ও গুণাগুন, মানবদেহের নানাবিধ ব্যাধি ও তাহাদের চিকিৎসা-প্রণালীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে সূচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার আরব্য দক্ষতার ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই দিক দিয়া তাঁহার এই বিরাট প্রচেষ্টা গ্যালেনের সঙ্গে তুলনীয়। 'কানুন' প্রকাশিত হইবার পর 'আল-হাওয়াই', 'আল্-মালিকী' প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থের প্রয়োজন প্রায় ফুরাইয়া যায়। এমনকি এই বিশ্বকোষ গ্যালেনের গ্রন্থ রাজিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। ইবনে সিনার পর প্রায় ছয়শত বৎসর পর্যন্ত কানুন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে (এবং ভারতেও) চিকিৎসাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সমাদর লাভ করিয়াছিল।"[৩৯] আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে ও.পি. জ্যাগ্গি লিখেছেন-"His book al-Qanun, in Latin called canon, atained great fame and...was used in medieval European Universities. It is still regarded in India and pakistan (now in Bangladesh also) as the supreme authority on all

matters connected with Unani medicine."[৪০] উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গ্রন্থ দ্বাদশ শতকে ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে এর ষোলটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে পনেরটি ল্যাটিনে, একটি হিব্রুতে। আর ষোড়শ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয় এর কুড়িটি সংস্করণ। এগুলো সব–ই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সংস্করণ। এছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এর খণ্ডাংশের যে কত সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছে, তার হিসেব নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এটিই ছিল সাগ্রহে পঠিত অপরিহার্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এম. আকবর আলী লিখেছেন—"বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তক এমনভাবে অধীত এবং আদরণীয় হয়নি।"[৪১] কথাটি সর্বাংশে সত্য। কেননা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে নিজামীর 'চাহার মাকালা' গ্রন্থের নির্মোক্ত বিবরণ স্মর্তব্য। উক্ত গ্রন্থে বলা হ'য়েছে—কেউ চিকিৎসক হ'তে চাইলে "তিনি নিম্নেলিখিত গ্রন্থাগুলি ভালভাবে অধ্যয়ন করবেন। হিপোক্রেটসের "ফুল", হুনায়েন ইবনে ইসহাকের "মাসায়েল" (প্রশ্নসমূহ), মোহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আর রাজীর "মুরশীদ" (পথপ্রদর্শক) এবং নীলির ভাষ্য। এইগুলো রীতিমতভাবে অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করা হ'য়ে গেলে... নিম্নলিখিত মধ্যবর্তী গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করবেন। ছাবেত ইবনে কোরার "দাখিয়া", মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর–রাজীর "কিতাবুত তিব্ব–আলমানসুরী', আবু বক'রের "হাদিয়া", আহমদ ফররোখের "কিফায়া" এবং সৈয়দ ইসমাইল জুরজানীর "আগবাদ"। এরপর তিনি সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে জানবার জন্যে নিম্নের যে কোন একখানা বই পড়বেন। গ্যালেনের "সিত্তা আসার" (ষোড়শ গ্রন্থ), মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর রাজীর "হাওই" (সার সংগ্রহ), আবু সহল মসীহির "কামিলুস সালায়াত" (পূর্ণ ব্যবসায়ী) বা "সাদবার" (শতপ্রবন্ধ) কিংবা আবু আলী ইবনে সিনার "কানুন" তবে যদি কেউ এত কষ্ট স্বীকার ক'রতে অপারগ হয় এবং অন্যগ্রন্থের খুঁটিনাটি থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, তাহলে আবু আলীর 'কানুন'ই যথেষ্ট। 'কানুন' ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই চিকিৎসা–বিজ্ঞানের সবকিছু সম্পূর্ণভাবে জানা হ'য়ে যাবে।...যদি হিপোক্রেটস ও গ্যালন পুনর্জীবিত হতে পারতেন, তা হলে তাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অপূর্ব জ্ঞানগরিমা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা 'কানুনে'র প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাতেও বাধ্য হ'তেন। এর জ্ঞান–গরিমার নিকট তাঁদের মাথা নত করতেই হোত।"[৪২] ইবনে সিনা 'কানুন" ব্যতীত আঠারো খণ্ডে লিখিত আশশেফার একটি খণ্ডেও চিকিৎসাতত্ত্ব আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর 'আলফিয়া ফিতা–তিব্ব' চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এক হাজার কমিতার একটি সংকলন–গ্রন্থ। তিনি ফার্সীতে নাড়ীর গতি সম্পর্কে 'মানজুমাতুন ফিত্ত–তিব্ব' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রেন। এভাবে একমাত্র চিকিৎসাতত্ত্ব বিষয়ক মোট ষোল খানা গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে সিনা। তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখারও তিনি নানা গ্রন্থ রচনাকার।

তাঁর সম্পর্কে হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম লিখেছেন–"ইবনে সিনা.... তাঁর সমসাময়িক যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক সমুদয় তথ্য, তত্ত্ব ও জ্ঞানকে সহজ–সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আকারে সংকলিত ক'রেছেন এবং এ–সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রীক মতবাদসহ প্রত্যেকটি মতবাদেরই যুক্তি তর্কের মাধ্যমে মূল্যায়ন ক'রেছেন। তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি,

স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-প্রতিরোধ-প্রতিটি বিষয়েই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।"[৪৩] ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদানসমূহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাই পাকিস্তানের হাকীম মুহম্মদ সায়ীদ ব'লেছেন—"There is no doubt about the originality of Aviecenna, as in his distinction of induration and tumour and also in his plilosophical interpretation of the Greaco-Arab system. His contribution to Materia Medica is superb. He introduced several new drugs for instance, faghirah (open *mothed*), and has dscribed it as a berry the size of a chick pea containing a black seed as large as a hemp seed brought from, Sakala in Hindustan."[৪৪]

এযুগের অপর বিশ্বমনীষী আবু রায়হান আল বিরুণী (৯৭৩–১০৪৮ খৃ:)। তিনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যারও চর্চা ক'রেন। চিকিৎসা-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আশি বছর বয়সে লিখিত সম্ভবত অসমাপ্ত গ্রন্থ 'কিতাব আস-সাইয়েদেনা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এটি ফার্মেসী ও মেটেরিয়া মেডিকা সংক্রান্ত রচনা। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিও আলোকপাত ক'রেছেন। গ্রন্থটি এইচ. বেভারিজ, জ্যাকিডেলিদি তোঘান ও ক্রেংকো প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত, ম্যাক্স ক্রুজ, পল ক্রুজ, শরফুদ্দীন ইয়ালতাকিয়া কর্তৃক সংশোধিত এবং ম্যাক্স মেইরহফ কর্তৃক অনূদিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁর সম্পর্কে হাকীম মুহম্মদ সায়ীদ লিখেছেন—"The remarkable fact about Al-Biruni is that he is able to identify leguminous, umbelliferrous, boraginaceous and laliatous plants and might be justly regarded as a master of plant taxonony."[৪৫] উল্লেখযোগ্য যে, শুধু উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিকতার সীমাবদ্ধ ছিল না ; ইউনানী তিব্বের বিকাশের ক্ষেত্রেও তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম হিংকে ওষুধ রূপে ব্যবহার ক'রেন এবং ভারতীয় অ্যাকানাইটের প্রজাতিভেদের প্রতি সঠিক আলোকপাত ক'রেন। তাঁছাড়া তাঁর ও ইবনে সিনার চেষ্টায়—"embolic myrobalans were incorporated into Muslim Medicine."[৪৬]

বস্তুত পক্ষে ইবনে সিনা, আবুল হাসান আত-তাবারী ও আল-রাজী এই তিন ইরানী মুসলিম মনীষী 'ইউনানী চিকিৎসা'কে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ইবনে সিনার জীবৎকালের মধ্যেই ইউনানী চিকিৎসার আলোচনা, গবেষণা ও কর্মতৎপরতার চারটি কেন্দ্র পড়ে ওঠে। যথা,—

১. উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন। গ্রাণাডাতে এর অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এখনও মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় ইউনানী চিকিৎসা প্রচলিত আছে।

২. মিশর ও সিরীয়া।

৩. পারস্য ও ভারত। এবং

৪. তুর্কী সাম্রাজ্যসহ বলকান অঞ্চল।

এই চারটি কেন্দ্রের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হবার ফলে, কর্ডোডাকে কেন্দ্র ক'রে স্পেনেই ইউনানী চিকিৎসার বিকাশধারা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন ক'রে।

স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে ইবনুল বাইতার (মৃত্যু ১২৪৮ খৃ:), ইবনুল নাফিস (১২১০–১২৮৮ খৃ:), ইবনে জুর (১০১১–১১৬১ খৃ:), প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এদের মধ্যে আবুল কাসিম ওর্ফে আলবুকাসিস ছিলেন কার্ডোভার রাজচিকিৎসক। তিনি 'আল তসরীফ' নামক তিরিশ খণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা ক'রেন। আলোচ্য গ্রন্থের শেষ তিন খণ্ডে শল্য চিকিৎসা সম্পর্কে ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। এম.এস. স্মিক এবং এল. লিউইজ বিস্তৃত টীকা টিপ্পনীসহ গ্রন্থটি অনুবাদ ক'রেন। অনুবাদকদ্বয় ভূমিকায় লিখেছেন—"আলোচ্য গ্রন্থের ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কীয় অধ্যায়ে বিবৃত ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির বিবরণ, ভাবতে বাধ্য ক'রে যে, আল বুকাসিস চেম্বারলেইন-এর অবস্ট্যাটরিক্স ফোর্সের সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা করতে পেয়েছিলেন ; যদিও তা জীবিত গর্ভনিষ্ক্রমণের জন্য নয়। আধুনিক প্লষ্টারের মতই তিনি এক ধরণের প্লাস্টারেরও ফর্মূলা বিবৃত ক'রেছেন। তিনি কিংবা তার অনুবর্তীগণ যে যথার্থ কাঁচির উদ্ভাবন ক'রেছিলেন-একথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একথাও স্বীকৃত হ'য়েছে যে, তাঁর গ্রন্থের এ-অংশ ইজিনার পলের ষষ্ঠপুস্তকের পুনর্পরিবেশন নয় ; বরং একটি মৌলিক রচনা।"[৪৭] পরবর্তীযুগে এ গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে হাকীম মুহম্মদ সায়ীদ ব'লেছেন— "The illustrations contained in the work influenced the latter-day Arab and European surgeons. It was soon translated into provencal, Latin and Hebrew. The celebrated French Surgeon, Guyde Chaliac (*1368 A.D.*) had the Latin version of this book appended to one of his works."[৪৮]

বস্তুত অনেকের মতে আবুল কাসিমের সময় থেকেই ইউনানী চিকিৎসায় শল্যবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ইউনানী চিকিৎসাগণ এক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়ন সাধন ক'রেন। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এনেস্থেশিয়াও ইউনানী চিকিৎসাতেই প্রথম প্রয়োগ করা হয়। ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল ব'লেছেন—বৌলোগনার থিওডোরিক (১২০৬–১২৯৮) তাঁর 'porific sponge'-এর ফর্মূলা এবং ব্যবহার পদ্ধতি আরবদের সূত্র থেকেই লাভ ক'রেন।

অন্যদিকে স্পেনীয় মুসলিম চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম আবু মারোয়ান ইবনেজুর নাম উল্লেখ্য। তিনি অদ্যাবধি জ্ঞাত, ছ'খানি চিকিৎসা-গ্রন্থ রচনা ক'রেন। সেগুলোর মধ্যে মাত্র তিনখানি গ্রন্থ আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-তৈসীর'। এটি রোগ নিরাময় ও ওষুধ-ব্যবহারবিদ্যা সংক্রান্ত রচনা। এতে বিভিন্ন রকম "টিউমার', অন্ত্রের যক্ষ্মা, হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিময় থলির প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, কণ্ডুরোগ ইত্যাদি কয়েকটি কঠিন ব্যাধির বর্ণনা আছে।"[৪৯] ইবনেজুর প্রয়োজনবোধে রক্ত-মোক্ষণ, কৃত্রিম উপায়ে রোগীকে খাদ্যপ্রদান প্রভৃতি অবলম্বন করতেন। আলোচ্য গ্রন্থটি অল্পকাল মধ্যেই হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তৈসীর-এর প্রভাব, ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর প্রভূতভাবে পড়েছিল। আর তা স্থায়ী হ'য়েছিল প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ইবনে রুশদ ছিলেন কর্ডোভার অপর এক কৃতি সন্তান। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাব আল কুলীয়াৎ ফিত-তিব্ব'-চিকিৎসাবিদ্যার বিশ্বকোষ বিশেষ। সমরেন্দ্রনাথ সেন এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—"এই গ্রন্থে তিনি (ইবনে রুশদ) স্বাস্থ্যবিধি, শারীর স্থান, শারীরবৃত্ত, বিবিধ রোগ ও তাহার চিকিৎসাবিধি ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা ক'রেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বসন্তরোগে কেহ দুইবার আক্রান্ত হয় না। চক্ষুর শারীরস্থান সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী হন। চক্ষু-সংক্রান্ত গবেষণার ফলে তিনি অক্ষিপটের প্রকৃত কার্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রথম নির্ভুলভাবে উপলব্ধি ক'রেন।"[৫০] গ্রন্থটি ষোড়শ শতক অবধি বিশেষ সমাদৃত ছিল এবং হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় দুবার অনূদিত হয়।

রুশদ-এর উদ্ভিদবিদ্ ইবনুল বাইডার-এর নামোল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি 'মুফরাদাৎ' নামক গ্রন্থে ১৪০০ বনৌষধির ভেষজ-গুণ বর্ণনা ক'রেছেন। অথচ তাঁর পূর্ববর্তী ফার্সী এতদসংক্রান্ত গ্রন্থে মাত্র ৫৮৫টি ওষুধের বিবরণ বিদ্যমান। ড: মুহম্মদ জুবায়ের সিদ্দিকী লিখেছেন—"Ibnul-Baytar's work can be said to be the main basis of the first British pharmacopoeia."[৫১]...বাইতার স্পেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে নানারকম উদ্ভিদ ও বনৌষধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে স্বীয় পুস্তক রচনা ক'রেন। তিনি শুধু লোকমুখ থেকে শুনে নয়, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিবেচনার সাহায্যেই, ঔষধাদি ও গাছ-পালার নামকরণ ক'রেছেন। এমনকি বাইতার তৎকালে লভ্য, প্রায় সমস্ত প্রাচীন তথ্যাদি পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার ক'রেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর রচনায় পূর্বসূরীদের উদ্ধৃতি দাখিল ক'রেছেন এবং বিবৃত ওষুধসমূহ ব্যবহার-এর 'ঐতিহাসিক অনুক্রমে'রও পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—"He is undoubtedly the greatest genius in the field of meteria mediea over to crown the pages of medicine with his corpus of simples. The figure of Ibn-al-Baytar stands out in the landscape of medicine to such a degree that he was likely not to be surpassed."[৫২]

স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে পরবর্তী মনীষী ইবনুল নাফিস ও ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত প্রথম গ্যালেনের রক্ত লাচল-তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রেন। তিনি ব'লেন যে, দক্ষিণ ভেন্ট্রিকল থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত-সেপ্টামস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে গমণ ক'রে ব'লে-গ্যালেন যা' ব'লেছেন তা' আদৌ সত্য নয়। কেননা সেপ্টামে দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য, সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কোন রকম ছিদ্রেরই অস্তিত্ব নেই। বরং রক্ত, দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল থেকে বাম ভেণ্ট্রিকলে যায়-ফুসফুসের মধ্যদিয়ে। আল্-নাফিসের এই মতবাদ পরবর্তীকালে গুপ্ত হ'য়ে পড়ে এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তা বিস্মৃত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, যদিও আল-নাফিস শব-ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে গ্যালেনের রক্ত চলাচল-তত্ত্বকে সংশোধন ক'রেননি ; তথাপি তাঁর মৌলিক বক্তব্য যে নতুন চিন্তার উদ্রেক ক'রেছে-তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ইবনুল নাফিস কর্তৃক আবিষ্কৃত 'গৌণ রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব' ও আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। এই তত্ত্বের আবিষ্কারক হিসেবে

ষোড়শ শতাব্দীর স্প্যানিশ চিকিৎসক মাইকেল সার্ভিটাস–এর উল্লেখ ক'রা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ইবনুল নাফিস তাঁর বহু পূর্বেই এটি আবিষ্কার ক'রেন এবং তাঁর এই আবিষ্কারই যে, উইলিয়ম হার্ভেকে 'মুখ্য রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব' আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ ক'রে–তা স্বীকার্য। কেননা, রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের পূর্ণতার জন্যই উভয় তত্ত্ব পরস্পর পরিপূরক এবং এমনও হতে পারে যে, ইবনুল নাফিসই গৌণ রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ব্যক্ত ক'রেছেন অবশ্য সে প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি।"[৫৩]

দ্বাদশ–ত্রয়োদশ শতকের চিকিৎসক আব্দুল লতিফ আল বাগদাদী (১১৬২–১২৩১ খৃ:) ছিলেন শারীর সংস্থানবিদ। তাঁর 'এ মেডিকেল হিস্ট্রি অব পারসিয়া'তে তিনি লিখেছেন– "নিম্নচোয়াল একাধিক হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত ব'লে গ্যালেন যে বক্তব্য উপস্থাপন ক'রেছেন— আবদুল লতীফ তা প্রত্যাখ্যান ক'রে ব'লেছেন, মানুষের শরীর সংস্থানতত্ত্ব গ্যালেনের অথবা গ্রীক লেখকদের বর্ণনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই সব থেকে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়।"[৫৪] এ প্রসঙ্গে হাকীম মুহম্মদ কবির উদ্দীন 'সাম লেসার নোনফ্যাক্টস অ্যাবাউট অ্যারাবিয়ান মেডিসিন' এ ব'লেছেন–'গ্যালেনের বিবরণ অনুযায়ী মানুষের মাথার খুলি যে সাতটি হাড়ের সমষ্টি নয়, বরং আটটি হাড়ের সমাহার–সেকথাও আবদুল লতিফ বাগদাদীর রচনায় বিদ্যমান।"[৫৫]

এমনিভাবে শুধু উদ্ভিদবিদ্যা বা বনৌষধি, শারীর সংস্থানবিদ্যা, শল্যবিদ্যা কিংবা ধাত্রীবিদ্যা নয়–ওষুধ বাজারজাতকরণ, চক্ষু চিকিৎসা, উন্মাদরোগ চিকিৎসা, রাসায়নিক ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কেও ইউনানী চিকিৎসকগণ সেযুগে স্বাতন্ত্র্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শেষোক্ত বিষয়টির প্রতি ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লিখেছেন..."In addition to the preparation of chemical medicines, the Arabs introduced a large number of medicaments with their materia medica."[৫৬]

এক্ষেত্রে সিরাপ, জোলাপ, অ্যালকোহল, রেসিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ *ফার্মাসিউটিক্যাল* মিশ্রণ–এর আবিষ্কার ও ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওষুধ প্রস্তুত ও তা উপাদেয় করার কাজে গোলাপজল, কমলালেবুর রস ইত্যাদির ব্যবহার ও ইউনানী ভেসজ প্রস্তুতবিদ্যাবিদগণের জ্ঞাত ছিল। ওষুধের মান ও মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইউনানী চিকিৎসা তত্ত্ববিদগণ উদাসীন ছিলেন না। এক্ষেত্রে নবম শতাব্দীর হুনায়েন ইবনে ইসহাকের ঔষধ প্রয়োগ সূত্রের উল্লেখই যথেষ্ট। তিনি ..."to establish an exact method of prescription through the application of the law of geomatrical progression to the doctrine of qualities and degrees of complicated mixtures, as shown in the following illustration :

Cardamon	is 1' Warm	$\frac{1'}{2}$ cold	$\frac{1'}{2}$ moist	1' dry
Sugar	is 2' warm	1' cold	1' moist	2' dry

Indigo	is $\frac{1'}{2}$ warm	1' cold	$\frac{1}{2}$' moist	1' dry
Emblica	is 1' warm	2' cold	1' moist	2' dry
Sum	$4\frac{1'}{2}$ warm	$4\frac{1}{2}$ cold	3' moist	6' dry

which means that the compound is dry to the first degree."৫৭

রোগের উৎপত্তি ও কারণ এবং জীবনীশক্তি সম্পর্কেও ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মৌলিক বক্তব্য ছিল। ইউনানী চিকিৎসা যদিও হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের চারটি ধাতুরস তত্ত্বের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি, এই গ্রীক 'তত্ত্ব'কে সবাই একবাক্যে স্বীকার ক'রেননি। কেউ কেউ এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রেছেন। *জারের তো স্পষ্টই মূল মৌলিক পদার্থ চারটি নয়,* ছ'টির কথা ব'লেছেন। তাছাড়া ভারতীয় ও গ্রীক চিকিৎসকদের 'ত্রিদোষ তত্ত্ব' কিংবা 'চতুর্ধাতুরস তত্ত্ব'-ই সমস্ত রোগের উৎস একথাও সবাই স্বীকার ক'রেননি। বরং তাঁরা অনেকেই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রবণতাই যে রোগ ও তা নিরাময়ে ক্রিয়াশীল সেকথা ব'লেছেন। এমনকি আরবীয় চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবক্তাদের রচনায় রোগের 'যান্ত্রিক বিকৃতির তত্ত্ব', 'বসন্ত রোগ কারো দুবার না হবার'-'ইমমিউনিটি-তত্ত্ব' এমনিকি আধুনিক 'বীজাণুতত্ত্ব'-'মেটাস্টিসিস' ইত্যাদি ও তৎকালীন ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যাবিদগণ আবিষ্কার ক'রেন।"৫৮ এসব তত্ত্বই পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের দ্বারা নতুনভাবে প্রচারিত, পরীক্ষিত ও সমীক্ষিত হ'য়েছে।-নতুনতর ইউরোপীয় 'টেকনোলজি', আরবীয় চিকিৎসকদের বহু ধারণা, সন্দেহ ও প্রশ্নকে স্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণ ক'রেছে।

বলা-বাহুল্য, পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে স্পেন থেকে আরব-শাসনের অবসান (১৪৯২ খৃ:) এবং ক্রুসেডের ফলাফল ; বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার মূলধন আরব-স্পেনীয় মুসলমানদের হাত থেকে ইউরোপীয়দের হাতে দ্রুত হস্তান্তর ক'রে। বার্গার্সেন লিখেছেন—"In the fifteenth century, alchemy brought in by the Arabs, swept over Europe like a conflagration... ...and about the so called philosopher's stone,...gradually belief spread that the philosopher's stone could not only transmute all metals into gold but could also cure all diseases, restore youth, and indefinitely prolong life. It thus also became the elixir of life. While the alchemists were carrying on the research for the stone, they made important inventions and discoveries that laid the foundations of the modern science of chemistry."৫৯

কিন্তু স্পেনের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইউনানী চিকিৎসার অগ্রগতি ও প্রসারের সমাপ্তি ঘটেনি। বাগদাদ কেন্দ্রিক ইরানী-আরবী ইউনানী চিকিৎসার ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ভারতীয় ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার ক'রে। 'ইউনানী তিব্ব' দিল্লীকেন্দ্রিক বিকাশের যে নতুন

সুযোগ লাভ ক'রে, তা' প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মোগলযুগে দিল্লী খ্যাতি, উন্নতি ও প্রতিপত্তিতে বাগদাদ এবং টলেডো–গ্রাণাডাকেও ম্লান ক'রে দেয়।

ভারতে ইউনানী চিকিৎসার ইতিহাস অনুসরণ ক'রলে দেখা যায় মূলত আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকাল (১২৯৬–১৩২১) থেকেই দিল্লীতে ইউনানী চিকিৎসার প্রসার। তাঁর রাজত্বকালে দামাস্কাস–এর বদরুদ্দীন, সদরুদ্দীন, আলীমুদ্দিন এবং মাহচন্দ্র প্রভৃতির মত অদ্বিতীয় চিকিৎসক, শল্যবিদ ও চক্ষু চিকিৎসক আবির্ভূত হন।"[৬০]

অতঃপর মুহাম্মদ তুঘলক (১৩২৫–১৩৫২ খৃ:), ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫২–১৩৮৮ খৃ:), সিকান্দর শাহ লোদী (১৪৮০–১৫১৭), প্রভৃতি সুলতানের রাজত্বকালেও ভারতে ইউনানী চিকিৎসার জনপ্রিয়তা ও প্রসার দেখা দেয়। মুহম্মদ তুঘলকের সময় দিল্লাতে প্রায় ৭০টি হাসপাতালে ১২০০ চিকিৎসক সরকারীভাবে কর্মরত ছিলেন। ফিরোজ শাহ স্বয়ং ইউনানী চিকিৎসা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা ক'রেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'তিব্ব–ই ফিরোজ শাহী'। সিকান্দার শাহের সময়কালে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ মিয়া তোয়া ফার্সীতে 'মাদান–উস–শিফাই সিকান্দার শাহী' রচনা ক'রেন। এ গ্রন্থে চিকিৎসা–বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন মতামত প্রতিফলিত হ'য়েছে। তিনি আরবীয় ও ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে তুলনা ক'রে লিখেছেন..."আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি–ভারতের স্বতন্ত্র আবহাওয়ায়, ইউনানী ঔষধ স্থানীয় মানুষের চিকিৎসার জন্য উপযোগী নয়। আর অধিকাংশ ঔষধের নামই যেহেতু হয় ফাঁর্সী, না হয় গ্রীক ভাষায় নিবদ্ধ, ফলে, ভারতে সেগুলোকে সনাক্ত করা যায় না এবং সেগুলোর অনেকই এসব দেশে পাওয়াও যায় না। এসব কারণে ভারতীয় চিকিৎসকদের গ্রন্থাদি ভালভাবে অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক।"[৬১] সুলতান সিকান্দর শাহ এ সম্পর্কে অবহিত হ'য়ে ভারতীয় আয়ুর্বেদী চিকিৎসা–গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ ও ইউনানী চিকিৎসার সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসার সংযোগ সাধনের নির্দেশ দেন।

মোগল শাসনামলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র ইউনানী–আয়ুর্বেদী চিকিৎসার বিকাশ ও বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। সম্রাট বাবরের সময় থেকেই পারস্যের জিলান, সিরাজ, তাব্রিজ প্রভৃতি স্থান থেকে সুশিক্ষিত ইউনানী চিকিৎসকগণ ভারতে আসা শুরু ক'রেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দিল্লীতে উনত্রিশ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন ব'লে আবুল ফজল উল্লেখ ক'রেছেন।"[৬২] সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির রাজত্বকালে ইরানী–আরবী চিকিৎসকদের ভারতে আগমণ অব্যাহত থাকে। মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী ও তার আশেপাশে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল স্থাপন, চিকিৎসা–বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও জনস্বাস্থ্যের সুযোগ–সুবিধার প্রসার ঘটতে থাকে। মোগল যুগে যেসব ইউনানী চিকিৎসক বিশেষ গৌরব অর্জন ক'রেন ; তাঁদের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জীবিত হাকিব রবিউল্লাহ, হাকিম হাবিবুল্লাহ ; সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে জীবিত মসিহ–উজ–জামান হকিম নুরুদ্দীন মুহম্মদ আবদুল্লাহ এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জীবিত হাকিম মুহম্মদ আকবর আর্জানির নাম উল্লেখযোগ্য। হাকিম নুরুদ্দীন ১৬৪৬ খৃ: 'তিব্ব–ই দারাশুকোহী'। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হাকিব আমানুল্লাহ খানের লিখিত 'গঞ্জই

বাডাওয়াদ' এই আমলের বিশ্বকোষ জাতীয় ফার্মাকোপিয়া। এ গ্রন্থে ইউনানী-আয়ুর্বেদী ঔষধতত্ত্ব বিষয়ক (ফার্মাকোলজিক্যাল) শিক্ষা ও অনুশীলন বা পরীক্ষা-নীরীক্ষার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। আওরঙ্গজের-এর সময়েও এ ধারা অব্যাহত থাকে। তাই তাঁর সম্বন্ধে ও, পি, জ্যাগগি লিখেছেন..."The reign of Aurangzeb was especially noteworthy in respect of composing and compiling of medical books. Many of the standard works on Tibb were translated into persian."৬৩ চিকিৎসার দক্ষতা একথা সত্য। এমনকি এযুগে অনেক হিন্দু চিকিৎসকও ইউনানী চিকিৎসায় দক্ষতা অর্জন ক'রেন। শেখরাজ তাদের মধ্যে অন্যতম।"৬৪

উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগেও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি পরবর্তী মোগল সম্রাটদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই অবক্ষয়ের যুগেও ভারতে ইউনানী তিব্বের ওপর ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে। এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ, হাকিম মোহাম্মদ শরীফ খান। তিব্ববিদ্যা সম্পর্কে তাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থ আছে।

মোগল-শক্তি অস্তমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইউনানী-আয়ুর্বেদী চিকিৎসারও গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে। ইংরেজ শাসন, ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ওষুধ ভারতীয় উপমহাদেশকে গ্রাস ক'রে। এজন্য ১৭৫৯ খৃ: থেকেই ইউনানী চিকিৎসার বিনাশের যুগ ব'লে নির্দেশ করা সঙ্গত।

মোগল যুগে 'ইউনানী তিব্ব' শুধু এদেশে আধিপত্য বিস্তার ক'রেনি। এদেশের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও সমৃদ্ধও ক'রেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—বাগভটের গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক-এর কোন উল্লেখ নেই। চক্রপাণি দত্ত এ দুটি দ্রব্যের সামান্য মাত্র উল্লেখ ক'রেছেন। কিন্তু আফিমের কোন উল্লেখ ক'রেননি। মাধব ক'রের নিদানেও এর উল্লেখ নেই। অথচ ১৫৩৫ অব্দের খৃ: পরে লেখা ভাবমিশ্রের 'ভাবপ্রকাশে' পারদ ও আফিম ব্যবহারের প্রচুর উল্লেখ বিদ্যমান। এথেকে সহজেই ধারণা করা যায়—পারদ, গন্ধক ও আফিম, চিকিৎসার নিমিত্ত এদেশে মুসলমান ইউনানী চিকিৎসকগণই প্রথম ব্যবহার ক'রেন। পরবর্তীকালে এসব পদার্থ আয়ুর্বেদী চিকিৎসায় প্রচুর ব্যবহৃত হ'য়েছে—কিন্তু মুসলমান ইউনানী চিকিৎসকগণ এসবের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অন্যদেরকেও এগুলো কম প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন।

'মেডিসিন' বা ঔষধ-চিকিসার ন্যায় শল্য চিকিৎসা, চক্ষু চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা এবং রোগী পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের ইউনানী চিকিৎসকগণ নানাবিধ মৌলিকত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

৩. তৃতীয় যুগ (১৭৫১ খৃ:-বর্তমানকাল)

পূর্বেই বলা হ'য়েছে-ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাই দেশীয় চিকিৎসা তথা হেকিমী-আয়ুর্বেদী চিকিৎসার দ্রুত বিপর্যয় ঘটায়। কারণ এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার

অনেক পূর্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সূচনা হয়। গোয়াতে পর্তুগীজেরা ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রেন এবং ১৬৮৭ খৃ: প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ায় ইউরোপীয় চিকিৎসার প্রথম মেডিকেল স্কুল। আর কোলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম হাসপাতাল স্থাপন ক'রে ১৭০৭ খৃ: এবং ১৭৫৭-তে। কোলকাতায় প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৪২-এ।"[৬৫] ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা সম্পর্কে বিতর্কের অবসানে ১৮৩৫ সালে সরকারীভাবে ফার্সী ভাষার উচ্ছেদ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসার যে ভবিষ্যৎ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে-মোগল-পাঠান যুগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি তার নিম্নে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু হেকিমী চিকিৎসা দীর্ঘ দু'শ বছরের পাথর চাপেও *ইরাণ* ও তুরস্কের মত এদেশ থেকে উচ্ছন্ন হয়নি। ব্রিটিশ যুগেও মসিহ-উল-মুলক হাকীম আজমল খান, হাকীম হাবিবুর রহমান প্রভৃতির মত প্রতিভাশালী চিকিৎসক জন্ম গ্রহণ ক'রেন এবং একাধিক 'তিব্বিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকালেও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হেকিমী চিকিৎসার প্রচলনও জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়।

গ) অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীকে, বর্তমানকালে 'বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি' 'আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি', ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যেরই বিশ্ববিখ্যাত বহু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী একে ব'লেছেন প্রাচীন চিকিৎসা রীতি, অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী। প্রসঙ্গত জার্মান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ড: স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং তাঁর জার্মান, ফরাসী, ব্রিটিশ, ও আমেরিকান অনুগামীদের মন্তব্যসমূহ স্মরণীয়।

'পশ্চিমী চিকিৎসা'কে তাই 'আধুনিক' 'বৈজ্ঞানিক' ইত্যাদি না ব'লে 'উরোপীয়' কিংবা 'ইউরো-আমেরিকান চিকিৎসা-পদ্ধতি' বলাই সঙ্গত। সত্যিকার অর্থে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নামে 'হোমিওপ্যাথিক' কিংবা 'বায়োকেমিক' চিকিৎসা রীতিকেই নির্দেশ করা উচিত। কারণ এরপর আর কোন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির নাম-বিভ্রাটের ন্যায় ইতিহাসগত বিভ্রান্তি ও বিরাজমান। এই চিকিৎসা যে মূলত আরবীয় ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিকে আত্মসাৎ ক'রে গড়ে উঠেছে সেকথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। আর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাস শুরু করা হয়-'গ্রীক', 'মিশরীয়', 'মেসোপটেমীয়' কিংবা 'ব্যাবিলীনীয়' চিকিৎসায়।"[৬৬]

বস্তুত দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম সভ্যতার অনুকরণে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১১১০ খৃ: অব্দে প্যারিস, ১১৩০ খৃ: অব্দে বোলোগনা, ১১৬৭ খৃ: অব্দে অক্সফোর্ড, ১২০৯ এ কেম্ব্রিজ, ১১২২ এ পাদুয়া এবং ১২২৪ এ নেপলস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা ক্রমশ গতিশীল ও বাস্তবঘনিষ্ট রূপ নিতে থাকে।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে থেকে ইউরোপীয়রা আরবদের অনুকরণেই চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদকর্মে নিয়োজিত হন। ঐ সময় তাঁরা প্রধানত আরবী ভাষা থেকেই তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করা শুরু ক'রেন। তবে গ্রীক ভাষা থেকেও কিছু কিছু অনুবাদ করা হ'য়েছিল। যেসব মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও পদার্থবিদের রচনা সেকালে ইউরোপীয়রা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ ক'রেন, তার অধিকাংশই ছিল আরবী ভাষায় লিখিত এবং যেসব লেখকের রচনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধীত হত-তাদের মধ্যে জাবের ইবনে হাইয়ান, আর-রাজী, ইবনে সিনা, আল বিরুণী, ইবনুল নাফিস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এসব মনীষী আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের সার্বিক প্রভাবেই ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং অন্ধকার-যুগের অবসান ঘটে। বস্তুত ক্রুসেড, ফার্ডিনান্ড কর্তৃক ১৪৯২ খৃ: স্পেন জয়, মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ, পদার্থবিদ প্রভৃতির ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া, পূর্বোক্ত মনীষীদের রচনাবলীর অনুবাদ ও অধ্যয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় ঔষধপত্রের বানিজ্যসূত্রে ইউরোপগমণ এবং মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারই তৎকালীন ইউরোপের নব জাগরণ ঘটায় এবং চিকিৎসা-বিদ্যারও নানামুখী বিকাশ ত্বরান্বিত ক'রে। ফলে সত্যিকারভাবে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান হ'য়ে উঠতে।

১. মধ্যযুগ (১৫০১ খৃ: থেকে ১৮৫০ খৃ:)

দীর্ঘ অন্ধকার যুগের অবসানে ষোড়শ শতকে মার্বার্গ-এর ভ্যালেরিয়াস কর্ডাস এবং বেলজিয়ামের আন্দ্রিয়াস ভিসেলিয়াস চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশে প্রথম মূল্যবান অবদান রাখেন। কর্ডাস উইটেনবার্গ-এ শিক্ষকতাকালে বারো বছর ব্যাপী প্রচলিত ওষুধের বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহ ক'রেন এবং সেগুলো পাণ্ডুলিপি আকারে গ্রন্থরূপ দান ক'রেন। নূরেমবার্গ-এর চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় এই পাণ্ডুলিপি সরকারী অনুমতির ভিত্তিতে ১৫৮৬ খৃ: মুদ্রিত হয়। কর্ডাসের এ বই-ই প্রথম মুদ্রিত ইউরোপীয় ফার্মাকোপিয়া, যা' একটি দেশে *সুসমঞ্জসভাবে* ওষুধ প্রস্তুতের আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। কর্ডার গ্রীক, রোমান ও আরবীয় সূত্র থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রেন এবং গ্যালেন, ডায়োস্কোরাইডস, ইবনে সিনা প্রভৃতির রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সঞ্চয় ক'রেন। তার গ্রন্থ প্যারিস, লিওনস, ভেনিস এবং এন্টাওয়ার্প থেকেও প্রকাশিত হয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ গ্রন্থ পাঁচ বার সংশোধিত হয়।"[৬৮]

অপরদিকে ভিসেলিয়াস ছিলেন শারীর সংস্থানবিদ। তিনি স্বয়ং শব-ব্যবচ্ছেদে অংশ নিতেন। ভিসেলিয়াস এই ব্যবচ্ছেদকর্মের ভিত্তিতে খসড়া চিত্রের সাহায্যে শারীর সংস্থানতত্ত্ব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেন। ১৫৪৩-এ তাঁর এ-গ্রন্থ প্রথমে প্রকাশিত হয়। শরীর বিধান-তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দুটি বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত তিনি গ্যালেন-এর ফুসফুসের রক্তচলাচল বিষয়ক 'ছিদ্রতত্ত্ব' অবান্তর ব'লে ঘোষণা ক'রেন এবং ব'লেন যে,

দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল থেকে বাম ভেন্ট্রি কলে রক্ত যাবার মত কোন রকম ছিদ্রই মধ্যবর্তী পর্যায় বিদ্যমান নেই। তিনি এ সম্পর্কে জোর দিয়ে ব'লেন— "I have not come across even the most hidden channels by which the septum of the ventricle is pierced."৬৯ কিন্তু ভিসেলিয়াস, গ্যালেনের তত্ত্ব প্রত্যাখান করলেও, ফুসফুস থেকে কিভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয়, সে বিষয়ে কোন নতুন বক্তব্য উপস্থাপন ক'রেননি।

প্রসঙ্গত ষোড়শ শতাব্দীর আরও একজন জার্মান মনীষীর কথা স্মরণীয়। তিনি হলেন *প্যাবাসিলসাস*। ইনি ১৫২৬ খৃ: বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও শল্যতন্ত্রের অধ্যাপক রূপে নিয়োজিত হন। বদমেজাজী এই লোকটি, অল্পকালের মধ্যেই উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত ও শীঘ্রই নিহত হন। তথাপি, তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যার বিরুদ্ধে তিনি যে, বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেন তার প্রভাব ছিল অসামান্য। তিনি হিপোক্রেটিস-এর সময় থেকে শুরু ক'রে ঐ সময় পর্যন্ত প্রচলিত ও স্বীকৃত ধাতু-রসকেন্দ্রিক রোগতত্ত্বকে প্রত্যাখান ক'রে ঘোষণা ক'রেন-'রোগের নিজস্ত সত্ত্বা আছে; যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ওষুধের দ্বারাই বিধ্বস্ত করা যায়'। তিনি ওষুধ-প্রস্তুতবিদ্যা ও ওষুতত্ত্ববিদ্যার উন্নতি ঘটান এবং ক্যালোমেল, গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি নতুন ওষুধ আবিষ্কার ক'রেন। তিনি কতিপয় নতুন রাসায়নিক যৌগও আবিষ্কার ক'রেন। আর সেকালে প্রচলিত ওষুধ ব্যবহারের অতিমাত্রা-প্রয়োগ থেকে বিরত হন।

এশতকের আর একজন, বিজ্ঞানী উইলিয়ম হার্ভেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে অ্যারিস্টটেলীয় দর্শনের বাইরে আনার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।

মানব দেহে রক্ত-চলাচল তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অ্যারিস্টটেলীয় দর্শন থেকে মুক্তির পথ দেখায় এবং ভিসেলিয়াস-এর বক্তব্য, প্রমাণ সাপেক্ষরূপে উপস্থাপন ক'রে। হার্ভে হিসেব ক'রে দেখতে পান-মানুষের নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে বায়াত্তর বার। এই স্পন্দনের অর্থ ফুসফুসের সংকোচন। ফুসফুস এভাবে সংকুচিত হওয়ার সময় প্রতিবারে দুআউন্স রক্ত উপচে ফেলে যা সমস্ত শরীর পোষণের জন্য সারা শরীরে ছিটিয়ে পড়ে। হিসাব অনুযায়ী ফুসফুস থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৭১ × ৬০ × ২ = ৮৫২০ আউন্স রক্ত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা শরীর পোষণে 'ব্যয় হয়'। কিন্তু এই পরিমাণ রক্ত যদি সত্যি 'ব্যয়' হ'য়ে যেত বা একজন লোক যদি প্রতি ঘণ্টায় এই পরিমাণ রক্ত ফুসফুস থেকে শুধু বের ক'রে দিত এবং তা পুনরায় ফুসফুসে ফেরৎ না পেত, তালে প্রত্যেকে শরীর ধারণের জন্য প্রতিঘণ্টায় তার নিজের ওজনের তিনগুণ পরিমাণ আহার গ্রহণ করতে হত। কিন্তু তা অসম্ভব। তাই হার্ভে ব'লেন যে, ফুসফুস থেকে প্রতি স্পন্দন বা সংকোচনকালে যে রক্ত বেরিয়ে যায় তা আবার ফুসফুসে ফিরে আসে এবং রক্ত সমস্ত শরীরে পরিভ্রমণ ক'রে। পক্ষান্তরে, অ্যারিস্টটেলীয় দর্শন অনুযায়ী কেবলমাত্র স্বর্গীয় বস্তুই পরিভ্রমণ করতে পারে, জাগতিক বস্তু নয়। কিভাবে রক্ত ফুসফুস থেকে উপচে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে হার্ভে তাও প্রমাণ ক'রেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লন্ডন ফার্মাকোপিয়া–(১৬১৮ খৃ:)–প্রকাশ ঘটে। এর ব্যবহার সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বে বাধ্যতামূলক করা হয়। আলোচ্য শতকে রোগের কারণ ও শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে তিনটি মতবাদের বিশেষ বিকাশ ঘটে। যথা,—

১. রাসায়নিক মতবাদ।

২. যান্ত্রিক মতবাদ।

৩. প্রকৃতি তাত্ত্বিক মতবাদ।

সপ্তদশ শতকে রসায়ন বিজ্ঞানের বিশেষ বিকাশের ফলে, যে জল, বায়ু, মাটি ও আগুন সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশ্বসৃষ্টির মূল ও মৌলিক উপাদান ব'লে স্বীকৃতি লাভ ক'রে আসছিল, সেগুলোর আন্তর–পরিচয় উদঘাটিত হয় এবং দেখা যায়, সেগুলো বস্তুতঃই মৌলিক ও আবিভাজ্য কোন পদার্থ নয়। বরং সেগুলোর মধ্যে র'য়েছে অনেক বস্তুগত উপাদান। এ আবিষ্কার চিকিৎসা–বিদ্যার ক্ষেত্রেও বিপুল প্রভাব বিস্তার ক'রে এবং রোগ ও তার কারণও, রাসায়নিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখা দেয়। তখন—"It was postulated that the food we took ultimately resulted in acidic and alkaline end-products through the action of fermentation and different glandular secretions. If the Balance between the acids and alkalies was rightly maintained, the individual was healthy. On the other hand, a disturbance in body's chemistry led to the formation of 'acrimoniae' which might be either acidic or alkaline, which made their way into the blood, and their gave rise to illness."[৭০] কাজেই আরোগ্যর সূত্র হল–"In order to heal a *diseased* body acids were counteracted by alkalies, and alkanlies by acids."[৭১]. লিডেন–এর ক্লিনিশিয়ান সিলভিয়াস ছিলেন এই মতবাদের বিশিষ্ট প্রচারক। এঁর জীবনকাল ১৬১৪–১৬৭২ খৃষ্টাব্দ।

অপর পক্ষে, 'যান্ত্রিক মতবাদে'র উৎপত্তির মূলে স্যাংকটোরিয়াস–এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মানুষের গাত্র তাপ, নাড়ীর স্পন্দন ইত্যাদি পরিমাপের উপায় উদ্ভাবন ক'রেন। তিনি–ই প্রথম শরীরে খাদ্যবস্তু রূপান্তর দ্বারা জটিল বিধানতন্ত্রগত বিপাকের সমীক্ষক। এসময় থেকে পরীক্ষা এবং পরিমাপই সমস্ত মতবাদের মানদণ্ডে পরিণত হয়।

আলোচ্য শতকে যান্ত্রিক মতবাদের প্রধান পীঠস্থান হ'য়ে দাঁড়ায় ইতালী। এখানকার গণিতবিদ আলফোনসো বোরেলি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের কার্য ব্যাখ্যা ক'রেন এবং রোগাদিও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় ব'লে অভিমত দেন। রোমের গিওর্গিয়ো বাগলিভি যান্ত্রিক তত্ত্বের বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন।

এই শতকে প্রাকৃতিক তত্ত্বের প্রবক্তা রূপে আবির্ভূত হন ইংল্যান্ডের টমাস সাইডেনহ্যাম। তাঁর জীবৎকাল ১৬২৪–১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ। তিনি লক্ষ্য ক'রেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থার বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তিনি ব'লেন 'রোগ হল রুগ্ন মানুষের শরীরের সঙ্গে, প্রকৃতির যে কুপ্রভাব রোগ জন্মায়, তার সংঘর্ষের ফল।

শরীর এই কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ক'রে এবং স্বীয় প্রতিরোধক শক্তিব'লে এই কুপ্রভাবকে অতিক্রম করার, প্রয়াস পায়। ফলে উভয়ের সংঘর্ষ বাধে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের কাজ হল লড়াইয়ে জেতবার জন্য শরীরকে সাহায্য করা। 'প্রকৃতিই রোগের জন্য দায়ী' হিপোক্রেটিসের এই তত্ত্বই তাঁর মাধ্যমে নতুনভাবে জাগরিত হয়। সাইডেন হ্যাম্‌হিপোক্রেটিসের মতই রোগের বিভি রূপ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তা অনুধাবনের প্রয়াস পেতেন। হিপোক্রেটিস যেখানে রোগীর ইতিমাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন ; সাইডেনহ্যাম সেখানে রোগের–ই প্রাকৃতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ক'রতেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকায় সাইডেনহ্যামকে 'ইংরেজ হিপোক্রেটিস' বলা হয়। তিনি ব্রিটিশ চিকিৎসা–জগৎকে সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে আসেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল্যান্ডের বস্ত্রব্যবসায়ী লিউবেন হুক কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র। তিনি নিজে এবং বৈজ্ঞানিক মার্সিলো ম্যালপিঘি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের কৈশিকাসমূহ দেখতে পান। রক্ত চলাচল সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্যও তাঁরা লক্ষ্য ক'রেন। এ আবিষ্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত পুরোনো অবৈজ্ঞানিক ধারণার সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় এবং মানব দেহের বিভিন্ন অংশের। কার্যাবলীর বোধগম্য ব্যাখ্যা দেয়। ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়।

আঠারো শতকের প্রথম ভাগে ঔষধপ্রস্তুত–বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং এসময় জার্মান চিকিৎসক হফ্‌ম্যান কমলালেবুর টনিক এবং হফ্‌ম্যানের অ্যানোডিন বা দেবনানাশক ওষুধ প্রস্তুত ক'রেন। তাছাড়া বার্লিনের এক ওষুধ বিক্রেতা বিটচিনি, ম্যাগনেশিয়া, সোডা, পটাশ এবং ফিটকিরি সনাক্ত ক'রেন। এ যুগেই জনৈক ফরাসী ঔষুধ প্রস্তুতবিদ্যাবিদ আলকেমীয় পরশ পাথরকে কুসংস্কার ও আজগুবি ব'লে অভিহিত *ক'রে প্রবন্ধ লেখেন। হৃদরোগে ডিজিটেলিসের ব্যবহার ও 'ডোভার পাওডার' আবিষ্কারও* এসময়েরই ঘটনা।

কিন্তু আলোচ্য শতকে হিপোক্রেটিসের পুনরুত্থানের পর ইরাসিস্ট্রাটাসের পুনরুত্থান (১৭৬১ খৃ:)–চিকিৎসা–বিদ্যার জগতে নতুন যুগের সূচনা ক'রে। এ যুগকে আধুনিক যুগ ব'লে অভিহিত করা সমীচীন।

২. আধুনিক যুগ (১৭৬১ খৃ: – বর্তমান কাল)

আধুনিক যুগের সূচনায় ১৭৬১ খৃ: 'অন দি সীটস অ্যান্ড, গ্রন্থের প্রকাশ। এ রচনায় তিনি পূর্বোক্ত ইরাসি স্ট্রাটাস্য–এর তত্ত্বেরই পুর্ণজাগরণ ঘটায়। বাতিস্তা ব্যাপক সংখ্যক পোস্ট মর্টেমের ভিত্তিতে ব'লেন প্রথমত রোগ, শরীরের একটি অঙ্গে বা অংশে আক্রমণ ক'রে, কখনো কখনো, রোগটি দীর্ঘকাল সেই স্থানটিতেই অবস্থান ক'রে ; আবার কখনও তা' অন্যস্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত "As a result of meticulous dissection of human bodies combined with a genuius for observation while the patient lived, he

could connect external signs of the disease with anatomical changes that occured in the organus."[৭২]

আজও শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হ'য়ে থাকে। এবং তিনি যেভাবে শল্য তাত্ত্বিক রোগ উপলব্ধির কথা ব'লেছেন, সেভাবেই তা উপলব্ধি করা হয়। আঠারো শতকের আর একজন শল্যতন্ত্রবিদ ফরাসী বিকেট। তিনি বাতিস্তার মতবাদকেই আরও একধাপ গভীরে নিয়ে যান। তিনি এক বৎসরে ছ'শটি পোস্টমর্টেমের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব প্রকাশ ক'রেন যে, বিভিন্ন রোগে মানব দেহের আঙ্গিকগত পরিবর্তন মূলত ঐসব অঙ্গের বিধানতন্তুরই পরিবর্তন। অর্থাৎ রোগ দ্বারা কোন অঙ্গ সমগ্রভাবে পীড়িত বা বিকৃত হওয়া নয় বরং তার বিশেষ বিশেষ বিধানতন্তুরই বিকৃতি বা পীড়া। এটিই 'তন্তু' গত রোগ-তত্ত্ব নামে পরিচিত। এমনিভাবে রোগের কেন্দ্র অঙ্গ থেকে অন্তরে প্রতিসরণ লাভ ক'রে।

আজকের বহুল পরিচিত বসন্তের টীকার আবিষ্কার এ শতকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ চিকিৎসক এডোয়ার্ড জেনার গো-বীজ থেকে এই টীকা আবিষ্কার ক'রেন। তাঁর 'ইমিউনিটি'র তত্ত্ব অচিরেই চিকিৎসাবিদ্যায় স্বীকৃতি লাভ ক'রে।

উল্লেখযোগ্য যে, *জেনারের* অনেক আগেই 'জীবাণু' আবিষ্কৃত হয়। লিউবেন হুক-ই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে 'জীবাণু' আবিষ্কার ক'রেন। কিন্তু লুই পাস্তরের আগে রোগ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জীবাণুর ভূমিকা বিশেষ উন্মোচিত হয়নি। সেটি অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা।

উনিশ শতকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব ঘটনার সমাবেশ ঘটতে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই ফরাসী রসায়নবিদ লুই পাস্তর-এর নামোল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁর জীবনকালে(১৮২২ থেকে ১৮৯৫ খৃ:) রোগ-*জন্মের* ক্ষেত্রে পাস্তরের আবিষ্কার, তথা জীবাণুর ভূমিকা আজও চিকিৎসাজগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কিভাবে তিনি জীবাণুর ভূমিকা আবিষ্কার ক'রেন, সে সম্পর্কে অজিত কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন "পাস্তর তখন তরুণ রসায়নবিদ। অ্যালকোহলিক ফার্মেনটেশন নিয়ে কাজ করার সময় তাঁর ধারণা হল ফার্মেন্টেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় জীবাণু দ্বারা। মানুষের কোষেও জীবাণু নিশ্চয়ই রাসায়নিক পরিবর্তন আনতে পারে। পাস্তর দেখালেন জীবাণুর জন্ম জীবাণু থেকে এবং জীবাণু মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি ক'রে।"[৭৩] অবশ্য, শুধু মানুষ নয়, পশুর দেহেও জীবাণু রোগ জন্মায়। এমনকি কীট-পতঙ্গের দেহেও। এই সময় জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক গরু-ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার ক'রেন। যক্ষ্মা ও কলেরা রোগের জীবাণুও তারই আবিষ্কার। ককের জীবনকাল ১৮৪৩ থেকে ১৯১০ খৃ:।

লুই পাস্তরও অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু দেখতে পান এবং তার প্রতিষেধক আবিষ্কার ক'রেন। কিন্তু পাগলা কুকুরের কামড়ে উৎপন্ন জলাতংক রোগের জীবাণু ও প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারই পাস্তরের জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমনিভাবে জীবাণু তত্ত্বের আবির্ভাব। এই তত্ত্বানুযায়ী "রক্তের শ্বেতকণিকার কাজই হল রোগ জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দেহকে সর্বদা রক্ষা করা।

বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান ১৯৪৪ সালে স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা ক'রেন। তারপর ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয় অরিওমাইসিন। তার আগের বছর আমেরিকাতে আবিষ্কৃত হয়, 'ক্লোরামফেনিকল'। ১৯৫০ সালে বৈজ্ঞানিক ফিনলে ও তাঁর সহকর্মীগণ আবিষ্কার-ক'রেন- 'টেরামাইসিন'। তারপর আবিষ্কৃত হয়-'নিওমাসিন', 'নিসটাটিন', 'টেট্রাস্বাইক্লিন', 'কর্টিসন', 'অ্যালডোস্টেরোন', ইত্যাদি। ১৯৫৫ সালে এবং ১৯৬১ সালে *'পলিমাইলাইটিশ* টীকার' উদ্ভাবনের কথা ঘোষণা করা হয়।"[৭৬] ১৯৭২ সালে আবিষ্কৃত হয় এন্টিটিউমার এজেন্ট হিসেবে বিশেষ ফলদায়ক 'মাইটেনসিন'।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে প্রাণীবিদ্যা এবং ঔষধবিদ্যার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে। রোগোৎপত্তির ক্ষেত্রে শারীরিক কোষের আরও গভীর কার্যলাপ ও রহস্য উন্মোচিত হ'য়েছে। আবিষ্কৃত হ'য়েছে অনেক সাধারণ রোগের নতুন কারণ। ১৯৭১ সালে মেডিসিন ; নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আর্ল ডব্লিউ, সাদারল্যান্ড কোষ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে 'অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট'-চক্র আবিষ্কার ক'রেন এবং কোষগত বিপাক এর ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। তাঁর এবং অন্যান্য গবেষক-এর আবিষ্কার থেকে এখন বলা হচ্ছে যে, মেমেব্রণ দ্বারা আবৃত প্রত্যেকটি কোষের অভ্যন্তরে আছে কেন্দ্রীয় বা 'নিউক্লিয়স'। আর তার পরে কিংবা ভেতরে আছে 'রিসেপ্টর' ও বাইরে আছে 'মিডিয়েটর'। কোষে কোষে সংযোগ সৃষ্টির জন্য, কোষ থেকেই অবশ্য সমস্ত মিডিয়েটরের উৎপত্তি এবং এইসব মিডিয়েটর কখনো শুধু মাত্র পার্শ্ববর্তী কোষটিতে প্রবেশ ক'রে ; আর কখনো বা অনেক অনেক দূরের পথ অতিক্রম করার জন্য রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে শরীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গমন ক'রে।

সাধারণতঃ জলে দ্রবণীয় বা হাইড্রোফিলিক কেমিক্যাল মিডিয়েটর, কোষের উপরিভাগের মেমেব্রণ ভেদ ক'রে অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রতে পারেনা ; ফলে তাদের রিসেপ্টর থাকে কোষের উপরিভাগে। কিন্তু চর্বিতে দ্রবণীয় হাইড্রোফোবিক কেমিকেল কম্পাউণ্ড-মেমেব্রণকে ভেদ ক'রে কোষের মধ্যে প্রবেশ ক'রতে পারে ব'লে ; সেগুলোর রিসেপ্টর থাকে কোষের ভেতরেই ! বিভিন্ন কোষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বহিঃস্থ মেমেব্রণের ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ। সারা শরীরে সমস্ত রকম রিসেপ্টর ও এক-ই রকম কাজ ক'রে না। যেমন এইচ, রিসেপ্টর প্রধানতঃ শ্বাসনালীকে দেখা যায় এবং..."they mediate some of the vascular, smooth-muscle and secretory changes associated with hay fever and asthma." পক্ষান্তরে এইচ-২ রিসেপ্টর প্রধানতঃ লক্ষণীয় পাকস্থলীতে। তারা "mediate the gastric secretion of hydrochloric acid."[৭৭]

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে-সুস্থ অবস্থায়—"Under normal circumstances the receptor interacts only with the appropriate mediator. Hundreds of other kinds of chemical compounds may come in contact with the receptor, but they bounce off and nothing further happens."[৭৮] ফলে রোগ সৃষ্টির কারণ হ'ল—"faulty communication among cells.[৭৯] শরীরযন্ত্রের প্রায়শঃ অজ্ঞাত কারণে রিসেপ্টর ও মিডিয়েটরের মধ্যে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি, টক্সিন ইত্যাদির প্রভাবে রিসেপ্টরের স্বাভাবিক কর্মের বিরতি ঘটলেও নানারকম রোগ সৃষ্টি হয়।

তুলনামূলকভাবে এই সহজ কোষিক শারীরতাত্ত্বিক মতবাদ অধুনা বহু সাধারণ রোগের কারণ নির্দেশে নতুন ব্যাখ্যা হাজির ক'রেছে। কলেরা, বহুমূত্র, হাইপারথাইরয়ডিজম, নানাবিধ স্নায়বিক রোগ, বংশাণুক্রমিক হান্টিংটনের কোরিয়া, ব্রেস্ট ক্যান্সার ইত্যাদির কারণ হিসেবে এই কৌষিক স্বাভাবিক সংযোগ ক্রিয়ার ব্যাঘাতকেই দায়ী এখন ক'রা হ'চ্ছে। কলেরা রোগের কারণ সম্পর্কে এখন নতুন ভাষায় বলা হচ্ছে—"Although cholera has for years been known to be caused by the ingestion of large numbers of the bacillus vibrio cholera, the disease itself is not an infection. The microorganism does not invade the tissues, it merely colonizes the intestinal canal for a few days. It cannot penetrate or *purrow* between the cells that line the gut, it is incapable of gaining access to the *lymph* channels and it does not enter the blood stream. There is no microscopic evidence that it damages any tissue. The entire disease process,..is the result of the fact that cells in the intestine respond to a chemical substance released by the bacteria as if it were a normal regulatory signal."[৮০]

মিডিয়েটর, রিসেপ্টর এবং একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষের যোগাযোগ-বিপর্যয়-সংক্রান্ত এই মতবাদটির সম্পূর্ণ রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি। তথাপি জীববিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে এ আবিষ্কার ইতোমধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন ক'রেছে। এডোয়ার্ড *রুবেনস্টেইন* লিখেছেন—

"It is likely future research will reveal that many diseases are cause by the overproduction or underproduction of a mediator or by the faulty structure of receptors or of the organelles with which the receptor interacts."[৮১]

এভাবে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাসে রোগের কারণ সম্পর্কীয় প্রচুর মতবাদ জন্মলাভ ক'রেছে। কোনটি-ই 'চিরস্থায়ী স্বীকৃতি' লাভ ক'রেনি। কোন মতবাদের সাহায্যেই সমস্ত রোগের কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। বহুরোগের উৎস এখনও র'য়েছে অজ্ঞাত। জীবাণু কিংবা ভাইরাস-ই সব রোগের কারণ ব'লেও এখন আর মনে করা হয় না। এন্টিবডি কোথা থেকে কেন জন্মায় তা আজও জানা যায়নি। সেই সঙ্গে ওষুধ আবিষ্কার, প্রস্তুত ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কম জটিলতার এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি। জীবাণু, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি, টক্সিন ইত্যাদি প্রতিরোধের যত উপায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে—তার কোনটি-ই মানবদেহের পক্ষে নিশ্চিত নিরাপদ ব'লে প্রমাণিত হয়নি। বার্গারসেন ব'লেছেন—"No drug is totally safe and absolutely free of Toxic effects. Sometimes these effects are immediately apparent. At other times, they may take weaks or months to develop".[৮২] ফলে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলা হ'য়েছে "To day, we see that a new drug comes on to the market, everybody buys it and after a few years people realise its adverse effect and so it has to be taken

off the market. Much of it we don't realise even now, only the children will recognise it as they grow up and time shows these effects."[৮৩] আমেরিকাতে পঞ্চাশের দশকেই 'অ্যান্টিবায়োটিক' ব্যবহার বন্ধের দাবী ওঠে। ক্লোরামফেনিকেল ইতি মধ্যেই প্রত্যাহার করা হ'য়েছে। পরামর্শ দেওয়া হ'চ্ছে ওষুধ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের। দৃষ্টি দেওয়া হ'চ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন ওষুধের বদলে প্রাকৃতিক ও লোকজ ওষুধের দিকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চ'লছে সেগুলোর কার্যকারিতা নিরূপণের।

এমনিভাবে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সংকট ক্রমশঃ স্পষ্টতর হ'চ্ছে। দিন দিন এই চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির কার্যকারিতাও স্বীকৃতি লাভ ক'রছে।

ঘ. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নেরহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার লিখিত ইতিহাস দুর্লভ। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির আবিষ্কারক জার্মান মণীষী ড: স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিখ হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩ খৃ:)। এর জীবনী ও কর্মের ইতিহাস পাওয়া গেলেও তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতির বিকাশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাবধি নজরে প'ড়েনি। এজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে হ্যানিম্যানের জীবনী আলোচনা না ক'রে তাঁর অবদান ও উদ্ভাবনের পরিচয় দানের পর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই চিকিৎসা-প্রণালীর বিকাশের ধারা আলোচনা করা হবে।

অবশ্য ড: হ্যানিম্যান সম্পর্কে এটুকু বলা আবশ্যক যে, তিনি ১৭৭৯ খৃ: এনলার্জেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৎকালীন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এম.ডি. ডিগ্রী লাভ ক'রেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, অনুবাদক ও গবেষক। তাঁর রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি মার্কুরিয়াস হ্যানিম্যানেই নামক নতুন এক রকম পারদ আবিষ্কার ক'রেন। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবেও তিনি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। কিন্তু একজন সৎ চিকিৎসক, মানবতাবাদী বিজ্ঞান-নিষ্ঠ গবেষক হিসেবে তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বাস্তব অসারতা ও অবৈজ্ঞানিকতার প্রতি সচেতন হ'য়ে ওঠেন। ফলে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রেন এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদের দ্বারা জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সিদ্ধান্ত নেন।

অতঃপর ১৭৯০ খৃ: বিখ্যাত স্কচ চিকিৎসক ড: উইলিয়ম কুলেনের 'মেটেরিয়া মেডিকা' ইংরেজী থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য ক'রেন যে,'পেরুভিয়ান বার্ক', বা 'সিঙ্কোনা'র ছালের রসে জ্বর উৎপাদিকাও জ্বর নাশিনী-উভয় প্রকার শক্তি-ই বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক কৌতুহলে উদ্দীপ্ত হ'য়ে হ্যানিম্যান তখন নিজে ঐ রস' সেবন ক'রেন এবং লক্ষ্য ক'রেন যে, ম্যালেরিয়া রোগের এই ওষুধ তাঁর সুস্থ শরীরে ঐ রোগের-ই লক্ষণসমূহ উৎপন্ন ক'রেছে।"[৮৪] তারপর তিনি নিজ শরীরে আরও ওষুধ-এর পরীক্ষাকার্য চালান। তাঁর পরিবারবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবরাও একাজে তাঁকে সাহায্য ক'রতে এগিয়ে আসেন। দীর্ঘ ছ'বছর ব্যাপী এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সমুদয় তথ্যের লিখিত রূপদান ক'রেন। ১৭৯৬ খৃ: তাঁর উক্ত রচনা 'হুফিন্যান্ড-সম্পাদিত' 'জার্নাল ফর দা প্রাক্টিসিং ফিজিসিয়ান'-এ, 'ওষুধ সমূহের শক্তি নির্ণয়ের নতুন প্রথা' নামে প্রকাশিত হয়।

ড: হ্যানিম্যান চিকিৎসা–বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানের জন্য আরও চৌদ্দ বছর ব্যাপী পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও তথ্যাদি সংগ্রহে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর এই অনলস ও বিপজ্জনক গবেষণার পূর্ণাঙ্গ ফসল ১৮১০ সালে 'অর্গ্যানন অব দা র‍্যাশনাল আর্ট অব হীলিং' নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থেই তিনি 'হোমিওপ্যাথি' নামটি প্রথম ব্যবহার ক'রেন এবং চিকিৎসা–বিজ্ঞানের এক নতুন দর্শন উপস্থাপন ক'রেন।

নতুন পদ্ধতিতে চিকিৎসা ও গবেষণায় নিয়োজিত হ্যানিম্যান ১৮২৮ খৃ: আর একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা ক'রেন। নাম 'দি ক্রণিক ডিজিজেজ'। এটি মোট পাঁচ খণ্ডে রচিত। তাঁর হোমিওপ্যাথিক 'মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা' প্রকাশিত হয়–১৮১১ খৃ:।

উল্লেখযোগ্য যে, চিকিৎসা–বিজ্ঞানের এই নতুন আবিষ্কার ড: হ্যানিম্যানের জীবনকে খুব সুখকর ক'রে তোলেনি। বরং এই নতুন চিকিৎসা প্রণালীর প্রচার ও প্রয়োগের অপরাধে (?) তাঁকে নানা ধরণের নির্যাতন সহ্য ক'রতে হয় এবং নিছক মাথা গোঁজার ঠাঁই লাভের জন্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়াতে হয়। পরিশেষে অবস্থা এমন হয় যে, তাঁকে চিরকালের মত মাতৃভূমি জার্মানীকে পরিত্যাগ ক'রে ১৮৩৫ খৃ: প্যারিসে চ'লে আসতে হয়। ১৮৪৩ সালে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই তাঁর জীবনের আটটি বছর সুখ, শান্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিত্তবান অবস্থায় অতিবাহিত হয়। এখানে ড: হ্যানিম্যান তাঁর ছাত্র ও অনুরাগী, বিখ্যাত কোঁতে দাস, গুডি, অ্যান্টনি পেট্রিজ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় হোমিওপ্যাথিক স্কুল, হাসপাতাল ও চিকিৎসক সমিতি গঠন ক'রেন। ঐ সময় জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকাতেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠিত হয়। হ্যানিম্যানের জীবৎকালেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ ক'রে।

ড: স্যামুয়েল হ্যানিম্যান 'বিজ্ঞান' বিশেষণ যুক্ত পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিকতা ও অসারতার মুখোস উন্মোচন ক'রেন এবং তাকে পুরানো মতের চিকিৎসা হিসেবে আখ্যায়িত ক'রেন। আর তাঁর নিজের আবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালীর নাম দেন–'নতুন মতের চিকিৎসা'। আগের মতের চিকিৎসা–প্রণালীকে তিনি 'বিসদৃশ পদ্ধতির চিকিৎসা' বা 'অ্যালোপ্যাথি' এবং নিজের চিকিৎসা–প্রণালীকে 'সদৃশবিধান চিকিৎসা–পদ্ধতি' বা 'হোমিওপ্যাথি' নামে নির্দেশ ক'রেন। তাঁর এই চিকিৎসা–রীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দর্শনহীন পাশ্চাত্য চিকিৎসা–বিজ্ঞানের একটি অপরিবর্তনীয় ভিত্তি নির্মাণ ক'রেন। এ দর্শন–অনুযায়ী–"রোগোৎপাদক শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত জীবনীশক্তি নিজেই রোগ উৎপাদন ক'রে।"[৮৫] অতএব তাঁর মতে–রোগ–নিরাময়ের মূল লক্ষ্য উক্ত "জীবনীশক্তির সুস্থতা আনয়ন।" তাই হোমিওপ্যাথিতে, অ্যালোপ্যাথির মত নিত্য–নতুন চিকিৎসাবিষয়ক মতবাদের বিকাশ ঘটার কোন অবকাশ নেই। কেননা, রোগোৎপত্তি ও তার নিরাময়–রীতি যে হোমিও–দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা আজও অসার প্রমাণিত হয়নি। বরং প্রাণ–রসায়ন ও পারমানবিক পদার্থবিদ্যা–সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি পরীক্ষা–নিরীক্ষার দ্বারা এই চিকিৎসা–পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়েছে ও হ'চ্ছে।

হোমিওপ্যাথির মূল চিকিৎসা-দর্শন অপরিবর্তনীয়। কিন্তু তার আরোগ্য-কলার ক্ষেত্রে হ্যানিম্যানের সময় অপেক্ষা পরবর্তীকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ-বর্জন ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা কম হয়নি।

সে-ইতিহাস অনুসন্ধানকালে প্রথমেই হ্যানিম্যানের বন্ধু ও ছাত্র জার্মান-মণীষী বোনিহোসেন-এর নাম স্মরণীয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রণালীবদ্ধ বিকাশ--সাধনের ক্ষেত্রে বোনিহোসেনের অবদান অসামান্য। তিনি হোমিপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার ব্যবহারকে হ্যানিম্যান-অপেক্ষা সহজ ও অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত ক'রে তোলেন। হ্যানিম্যান 'মেটেরিয়া মিডিকা পিউরা'তে রোগ-লক্ষণ যথাযতভাবে সন্নিবেশ ক'রলেও ওষুধ-নির্বাচন খুব সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রোগীর সমস্ত লক্ষণ মেটেরিয়া মেডিকায় বর্ণিত ওষুধ-লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। যে-ওষুধের অধিকাংশ লক্ষণের সঙ্গে রোগীর অধিকাংশ রোগ-লক্ষণ মিলত ; তিনি সেই ওষুধ দ্বারাই সেই রোগীকে চিকিৎসা ক'রতেন। এ পদ্ধতি যে অনেকটা স্থূল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে হ্যানিম্যানের পক্ষে যতটা সাফল্য লাভ ক'রা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কারণ ড: হ্যানিম্যানের সময়ে ওষুধের সংখ্যা ছিল অল্প। তিনি স্বয়ং সেইসব ওষুধ নিজ দেহে পরীক্ষা ক'রেছিলেন অথবা স্বীয় তত্ত্বাবধানে অন্যের ওপর পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তাই ওষুধ সম্পর্কে তাঁর পক্ষে যে-জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল, অন্যের নিকট থেকে তা আশা ক'রা যেত না। এজন্য নবাগত চিকিৎসকগণ ওষুধ-নির্বাচনে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তেন। বোনিহোসেন এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রয়াস পান। তিনি সমস্ত রোগ-লক্ষণকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে গাণিতিক পদ্ধতিতে ওষুধ-নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রেন। এগুলো যাথাক্রমে-স্থান, অনুভূতি, লক্ষণাবলীর হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ামক ঘটনাবলী ও মুখ্য লক্ষণাবলীর সঙ্গে সহাবস্থিত লক্ষণাবলী। ওষুধ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিভাজন যে যথেষ্ট কার্যকর, তা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আজও স্বীকার ক'রেন। পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন সাধন ক'রেন কেন্ট, বায়ার, হার্ভে ফ্যারিংটন প্রভৃতি।

বোনিহোসেনের 'পকেট বুক' একটি চিরায়ত গ্রন্থ। এটি তাঁর অভিজ্ঞতাও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় চিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। বোনিহোসেন হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরির বা সংক্ষিপ্ত রোগলক্ষণ-নির্দেশিকারও স্রষ্টা। পরবর্তীকালে ড: সি.এম. বোগার "বোনিহোসেনস্ ক্যারেক্টারিস্টিকস্ অ্যান্ড রেপার্টরি" নামে তাঁর উক্ত রচনা সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে জে.এইচ. ক্লার্ক ব'লেছেন..."It is a much valuable compilation, but it has not the portability and compactness of the pocket book."[৮৬]

বস্তুতঃ লক্ষণাবলীর বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও প্রণালীবদ্ধ সন্নিবেশ-ই হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বোনিহোসেনের বিশিষ্ট অবদান।

আলোচ্য চিকিৎসা-ক্ষেত্রে হ্যানিম্যানের অপর বন্ধুও ছাত্র ড: আর.এইচ. গ্রস তুলনামূলক মেটেরিয়া মেডিকার জন্মদাতা। তাঁর 'কম্পারাটিভ মেটেরিয়া মেডিকা' আজও

চিকিৎসা জগতে অদ্বিতীয়। ১৮৬৬ সালে এ গ্রন্থ হ্যানিম্যানের অপর বন্ধু ড: কনস্ট্যানটাইন হেরিং মূল জার্মান পাণ্ডুলিপি থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রেন। গ্রন্থটির পরিচয় ...ক'রতে গিয়ে হেরিং লিখেছেন—

"Dr. H. Gross worked at his differential comparisons a great many years. When he had taken up a pair of "related"medicines, i.e. such as had a predominating similarity in their effects, or such as might be indicated in the same or similar diseases, he considered it a matter of complete indifference which one be placed on the left column of the page and which on the right hand column. The two colums were to him like a pair of scales.".[৮৭]

একটি ওষুধের সঙ্গে আর একটি ওষুধের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ড: গ্রস ওষুধসমূহের শ্রেণীগত চরিত্রের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টিপাত ক'রেননি। তাই তিনি তাঁর তুলনামূলক মেটেরিয়া মেডিকায় অক্ষরাণু ক্রমিকভাবে ওষুধের তুলনা বিন্যাস ক'রেছেন। গ্রস এ রচনায় প্রায়শঃ ব্যবহৃত একশটি ওষুধের পাঁচশটি তুলনা উপস্থাপন ক'রেছেন। হেরিং ব'লেছেন—এরকমভাবে তিনশটি ওষুধের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে ৫০,০০০টি লক্ষণ নির্দেশ করা যায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ক্ষেত্রে গ্রসের গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত ক'রে হেরিং লিখেছেন—"The student of Materia Medica has now a better chance than he ever hau before to became familier with the very essence of our knowledge of drugs".[৮৮] সমকালীন অপর মণীষী ড: লিপির 'এ টেস্ট বুক অব মেটেরিয়া মেডিকা' ও একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

কিন্তু হ্যানিম্যান-বন্ধুদের মধ্যে হোমিওপ্যাথির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর অবদান ড: কনস্ট্যানটাইন হেরিং-এর। তিনি ওষুধ পরীক্ষা, নতুন ওষুধ আবিষ্কার, ওষুধ প্রস্তুত-প্রণালীর নতুন রীতির উদ্ভাবন, মেটেরিয়া মেডিকা অধ্যয়ন ও ওষুধ নির্বাচনে পরিচালক লক্ষণাবলী আবিষ্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

ড: হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ অস্ট্রীয়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-সমিতি নতুন ক'রে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'রেন। হ্যানিম্যান দীর্ঘ কুড়ি বছর ব্যাপী প্রায় শতাধিক ওষুধ পরীক্ষা ক'রেন ও সেগুলো মেটেরিয়া মেডিকার অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু ঐ সব ওষুধ কখন, কিভাবে কেমন ক'রে কত মাত্রায়, কার কার দ্বারা, কতবার পরীক্ষিত হ'য়েছিল—তার সম্পূর্ণ তথ্যাদির রেকর্ড না থাকায়, হ্যানিম্যানের বিবরণের ওপর নির্ভর না ক'রে অস্ট্রীয়ার ডাক্তারগণ পূণরায় একটি পরীক্ষক-সমিতি গঠন ক'রে তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত ওষুধ নতুন ভাবে পরীক্ষা ক'রেন। অস্ট্রীয়ার যেসব মণীষী এই পরীক্ষক-সমিতির সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে ড: ওয়াটজকি, ড: ওয়ারম, ড: রিসিঙ্গার উল্লেখযোগ্য। এঁরা যে

কী ব্যাপক পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, তা নিম্নোক্ত তথ্য থেকে সহজে উপলব্ধি ক'রা যায়। যথা—, উক্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে—

অ্যাকোনাইট	১৬ জন	পরীক্ষক দ্বারা	৩৭ বার	পরীক্ষিত হয়
ব্রাইয়োনিয়া	১৪	"	২৯	"
কলোসিন্থ	১৫	"	২৫	"
থুজা	২৩	"	৫৯	"
নেট্রাম মিউর	৩৯	"	(?)	"

এসব ওষুধের কোন কোনটি-যেমন, আর্জেন্ট নাইট্রিকাম দুবছর ধরে পরীক্ষা চ'লে।"[৮৯]

ড: হেরিং এই পরীক্ষক-সমিতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও স্বয়ং বহু ওষুধ পরীক্ষা ক'রেছেন এবং অনেক নতুন ওষুধ আবিষ্কার ক'রেছেন। হ্যানিম্যানের জীবৎকালে ড: হেরিং যে সব ওষুধ স্বদেহে পরীক্ষা ক'রেন, সেগুলোর মধ্যে সর্পবিষ-'ল্যাকেসিস'-এর পরীক্ষা সব থেকে লোমহর্ষক ঘটনা। সম্ভবতঃ ১৮২৪ সালে তিনি প্রথম এই বিষ ভক্ষণ ক'রে পরীক্ষা ক'রেন এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে-সর্পবিষকে প্রাণীহত্যার বদলে প্রাণরক্ষার কাজে নিয়োগ ক'রেন।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ-প্রস্তুত প্রণালীর উন্নয়নে ড: হেরিং-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি হ্যানিম্যানের শততমিক রীতিতে ওষুধ প্রস্তুতের বিধি বর্জন ক'রেন এবং দশমিক প্রণালীতে ওষুধ প্রস্তুত বিধির নির্দেশ দেন। এই রীতিতে ওষুধ তৈরীর নিমিত্ত ..."প্রথম ক্রমের ঔষধে দশভাগের এক ভাগ মূল ওষুধ থাকিবে, পরবর্তী প্রত্যেক ক্রমের ঔষধে তৎপূর্ববর্তী ক্রমের দশ ভাগের এক ভাগ ঔষধ থাকিবে।"[৯০] উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৩ সালে সংস্কৃত নতুন সরকারী আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় হ্যানিম্যানের শততমিক রীতি বর্জন করা হয় এবং হেরিং-এর দশমিক রীতি গৃহীত হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ড: হেরিং-এর অপর অবদান ওষুধসমূহের পরিচালক লক্ষণাবলী আবিষ্কার। মোট দশটি খণ্ডে লিখিত তাঁর 'গাইডিং সিম্পটমস' গ্রন্থে ড: হেরিং প্রত্যেকটি ওষুধের মুখ্য ও পরিচালক লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। ফলে এ গ্রন্থে অকেজো কথা একেবারেই নেই। আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় হেরিং চিকিৎসক হিসেবে বিরাট প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন।[৯১]

এসময়ের অপর আমেরিকান চিকিৎসক ড: টি.এফ. এলেন-এর 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব মেটেরিয়া মেডিকা' আর একটি চিরায়ত গ্রন্থ। ন'হাজার পৃষ্ঠারও অধিক, বারো খণ্ডে লিখিত এ গ্রন্থে শুধু ওষুধ সমূহের সাধারণ লক্ষণাবলী আলোচনা ক'রা হ'য়েছে। ই. এ. ফ্যারিংটন এরই সম্পর্কে ব'লেছেন—"These (pages) do not include clinical symptoms, which would make several thousand more."[৯২] তথাপি কঠোর অধ্যবসায়ের এমন নজীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ইতিহাসে আর কেউ উপস্থাপন ক'রেননি।

অতঃপর সমকালীন ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ড: হিউজের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হিউজ, হ্যানিম্যানের চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণ ক'রলেও, তাঁর সম্পূর্ণ মতানুবর্তী

ছিলেন না। তাই অনেকে তাঁকে উপেক্ষা ক'রেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ড: সি.ই. হুইলার ১৯৩৬ সালে গ্লাসগো-তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে ব'লেছিলেন—"ডা: হিউজ চিররোগের উপর অনেক নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা মত আরোপ করিয়াছেন ; যদিও তাহাদের বিশিষ্ট ওষুধের অনেকগুলি রাখিয়া দিতে হইয়াছে...। সোরা ও সাইকোসিসকে নাকচ করা ছাড়াও হিউজ এইরূপ দাবী ক'রেন যে, সাদৃশ্য নীতি পরিণামে রোগ এবং ঔষধের ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থার ন্যায় সদৃশ রুগ্ন দেহের সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করিবে।...তাঁহার মতানুসারী প্রশংসনীয় কার্য হইয়াছে এবং আরও হইতে পারে। যাহারা তাঁহার মতকে উপেক্ষা ক'রেন, তাঁহারা যে সাফল্য অর্জন করিতে পারিতেন, তাহা নিশ্চয়ই হারাইবেন। প্রত্যেক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিকে তাঁহাদের আরও উৎকৃষ্ট প্রাকটিসের জন্য স্মরণ রাখা উচিরত যে, গ্রেট ব্রিটেনে, বর্তমানকালের সে সমস্ত বিরুদ্ধতা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কঠিন সময়ে হিউজের বাণী হোমিওপ্যাথির মর্যাদা সগৌরবে রক্ষা করিয়াছিল।"[৯৩]

ড: হিউজ রোগারোগ্যর ক্ষেত্রেও হ্যানিম্যানের নির্দেশের বশবর্তী ছিলেন না। পূর্বেই বলা হ'য়েছে, হ্যানিম্যান যে-কোন রোগীকে একবারে একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগের বিধি নির্দেশ ক'রেছেন। কিন্তু হিউজ ব'লেছেন-'যদি কোন একটি মাত্র ওষুধে সমস্ত লক্ষণ না মেলে তা'হলে যুগপৎ দুটি ওষুধ ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়'। অবশ্য আধুনিক ডাক্তারদের অনেকে পরপর তিন-চারটি ওষুধও প্রয়োগ ক'রে থাকেন। তা স্পষ্টতঃই হ্যানিম্যানিয়ান হোমিওনীতি-বিরোধী।

ড: হিউজের মত, ড: হেম্পেলও হ্যানিম্যানের সম্পূর্ণ অনুসারী ছিলেন না। তিনি হ্যানিম্যানের অনুসৃত ওষুধ পরীক্ষা-রীতি সমর্থন ক'রেননি। তিনি ব'লেছেন-"পরীক্ষাকালে ঔষধ শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহার ক'রা উচিত নয়। কেননা, শরীরে স্থূল মাত্রায় ওষুধ আগে গৃহীত না হ'লে-মধ্য বা উচ্চ শক্তি কখনও নির্ভরযোগ্য লক্ষণ প্রকাশ ক'রে না।"[৯৪] ড: ডানহাম 'সায়েন্স অব থেরাপিউটিক্'-এ ওষুধের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার মাত্রাই পরীক্ষা করা উচিত ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি'-হ্যানিম্যানের পরীক্ষা পদ্ধতিই গ্রহণ ক'রেছে।

ড: হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পর 'স্ত্রীরোগ' ও 'চর্মরোগ' প্রভৃতি তথাকথিত 'একদেশিক' বা স্থানীয় রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হন।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ যুগে ড: জি.এইচ.জি. জার ফরাসী ভাষায় লেখেন 'ডিজিজেজ অব দি ফিমেল'। বইটি ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। জার এতে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের মত রোগ অনুযায়ী আলোচনা ও ওষুধ-নির্দেশ ক'রেছেন। ড: জারের এ-গ্রন্থে প্রত্যেকটি রোগের 'প্যাথলজিকাল', 'সিম্পটোম্যাটোলজিক্যাল' এবং 'ডায়াগ্নোস্টিক নোট' লিপিবদ্ধ ক'রা হ'য়েছে। আগেকার কোন হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থে এরকম চিকিৎসা-পদ্ধতির বিবরণ লাভ করা যায় না। আমেরিকান চিকিৎসক ড: জে.এইচ. হেম্পেল বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রেন-১৮৬০ সালে। এটি ভারত থেকে মুদ্রিত হ'য়েছে ১৯৭২ সালে।

বস্তুতঃ ঐসময় পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক স্ত্রীরোগ-চিকিৎসার তেমন কোন নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল না। স্ত্রীরোগের ক্ষেত্রে তখনও "Homoeopath has done little or nothing."এই অভাব পূরণের জন্যই জার প্রয়াস পান এবং তিনি আলোচ্য গ্রন্থের মুখ বন্ধে ব'লেন—"we have especially endeavoure to place in the hands of our readers a complete Materia Medica of the affections of the uterine system, such as the limits of our Homoeopathic Manual did not allow us to offer...we have avoied ourselves for this purpose not only of what the principal French authors, such as Velpealu, Desormeauv, Lisfranc, Chailly, Nollvre, Fabre, etc., have publishid on this subject, but like wise of what the most celebrated and recent authors in Germany have contributed to the study of these affections."[৯৫] ফলে, বইটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাজগতে 'স্ত্রীরোগ' নিরাময়ে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন ক'রে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ রচনার প্রতি সারা ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। আমেরিকান অনুবাদক ড: হেম্পেল, রচনাটি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লিখেছেন—"This work has enjoyed such a distinguished reception in Europe by all classes of Homoeopathic practitioners, that we felt confident a translation of the work into the English language would be hailed with satisfaction by our American Homoeopathic brethren. The work being very complete in the original, we have not demed it necessary to encumber it with notes of our own."[৯৬] স্নায়ুরোগ সম্পর্কে লেখকের আর একটি গ্রন্থ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে আর্নেস্ট এ, ফ্যারিংটন-এর অবদান নানাবিধ। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি-ই ক্লিনিক্যাল হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার স্রষ্টা। অ্যালেন-এর হোমিওপ্যাথিক বিশ্বকোষ সাধারণ লক্ষণাবলীর ভিত্তিতে রচিত। ফ্যারিংটন সে জন্য ক্লিনিক্যাল লক্ষনাবলী অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ ক'রেন। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, গবেষক এবং চিন্তাবিদ। এজন্য অ্যালেনের বিশ্বকোষ কিংবা অন্যান্য গ্রন্থের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না ক'রে, স্বয়ং বহু ওষুধ পরীক্ষা ক'রেছেন, আবিষ্কার ক'রেছেন এবং পুরাতন ওষুধ নতুনভাবে বিচার ক'রেছেন। আর সর্বদাই লক্ষ্য ক'রেছেন ওষুধের ক্লিনিক্যাল ফলাফলের প্রতি।

শিক্ষক হিসেবে লক্ষণাবলী স্মরণ রাখার উদ্ভূত প্রতিভা ছিল তাঁর। তিনি সমস্ত ওষুধের ক্রিয়ার দক্ষ বিশ্লেষণ ছাড়াও রোগ-লক্ষণের সঙ্গে ওষুধ-লক্ষণের গভীরতর সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রতে পারতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য।

ফ্যারিংটনের পূর্বে ওষুধের পরিবার ও শ্রেণীগত সম্বন্ধের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হ'ত না। কিন্তু তিনি-ই প্রথম এ দুটি বিষয়ের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টিপাত ক'রেন। তিনি ছাত্রদের সর্বদাই ওষুধের পরিবার ও শ্রেণীগত সম্বন্ধের প্রতি সচেতন থাকার উপদেশ দিতেন।

১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, 'ফিলাডেলাফিয়া হ্যানিম্যান মেডিকেল কলেজে' ড: ফ্যারিংটন শিক্ষক হিসেবে যোগদান ক'রেন–১৮৬৮ তে। ১৮৭৪ সালে ড: গারেন্সি এই কলেজের মেটেরিয়া মেডিকার শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিলে, তাঁকে উক্ত পদে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে "His daily association with Hering quickend this his natural desire and he was soon recognised by that master spirit of our school as one well fitted to a place in the highest rank among the expounders of that most intricate science, Materia Medica. Hering delighted to say,"When I am gone Farrington must finish my Materia Medica."[৯৭]

১৮৭৬ খৃ: আমেরিকায় যে হোমিওপ্যাথিক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাতে বেগিন প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিডের ওপর প্রবন্ধ পাঠ ক'রেন। তিনি 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি'র এবং 'স্টেট সোসাইটি'র সদস্য ছিলেন। তাছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'কমিটি অন ড্রাগ প্রুভিংস' এবং 'বুরো অব মেটেরিয়া মেডিকা'রও বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৮৮৫ খৃ: মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন উক্ত ব্যুরোর সভাপতি। ১৮৮৪ সালে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ তাঁকে নতুন 'ড্রাগ প্যাথোজিয়েনেসি বিশ্বকোষে'রও সম্পাদকীয় কনসাল্টিং কমিটির সদস্য মনোনীত ক'রে। এই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েন এবং পরবর্তী বছর ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্যারিংটন জন্মে ছিলেন ১৮৪৭ সালে, নিউইয়র্কের অন্তর্গত লং আইল্যান্ডের উইলিয়ামসবার্গ–এ।

ফ্যারিংটনের জীবৎকালে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তিনি ছিলেন সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট লেখক, চিকিৎসক ও অধ্যাপক। তার 'স্টাডিজ ইন মেটেরিয়া মেডিকার কিছু অংশ ১৮৮০,'৮১ ও '৮২ খৃ: আমেরিকায় 'হ্যানিম্যানিয়ান মান্থলি'তে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরও ফ্যারিংটনের কিছু রচনা 'নর্থ আমেরিকান জার্নাল অব হোমিওপ্যাথি', 'মান্থলি হোমিওপ্যাথিক রিভিউ প্রভৃতিতে প্রকাশ লাভ ক'রে। এসব রচনার কিছু কিছু জার্মান, ফরাসী ও স্প্যানিশ সাময়িকীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭–তে তাঁর মূল্যবান রচনাবলী মিসেস ফ্যারিংটনের অনুমতিক্রমে ক্লারেন্স বার্টলেট কর্তৃক 'ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা' নামে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ ক'রে। পুত্র হার্ভে ফ্যারিংটন গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ সংশোধন ও সম্পাদন ক'রেন। তাতে আরও কিছু নতুন অপ্রকাশিত রচনা যুক্ত হয়। তাঁর প্রতিভা ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন ক'রতে গিয়ে, ফ্যারিংটনের বন্ধু অগাষ্ট কোর্ন ডর্ফার লিখেছেন—

"The literature of our school has been greatly enriched by his pen ; for though he did not strive to gratify ambition in giving to the profession massive volumes, he performed that which he felt duty to demand, i.e. gave of his time in work not only upon his lectures, but also to societies, and in our journal literature."[৯৮]

আলোচ্য রচনা যথার্থই একটি চিরায়ত গ্রন্থ।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৭৪ সালে 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি' সমস্ত পুরোনো ওষুধ নতুন ক'রে যাচাই করা শুরু ক'রেন। কয়েক বছর ধরে ওষুধ পরীক্ষা চ'লতে থাকে। এই পরীক্ষার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ড: হুবার্ড, ড: পল পিটেট, ড: উইলিয়ামসন, ড: নীডহার্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তোলে।

অতঃপর হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক জেমস টেইলর কেণ্ট (১৮৪১-১৯১৬)-এর আবির্ভাব হয়। কেণ্ট, ফ্যারিংটনের আগে ১৮৪১ সালে জন্ম লাভ ক'রেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হন অনেক পরে। তাঁর হোমিওপ্যাথিতে আগ্রহ সৃষ্টি দৈব ঘটনার মতই চমকপ্রদ। এ মণীষীর জীবনী থেকে জানা যায়-জেমস টেলর কেণ্ট- "নিউইয়র্কের হ্যামিলটন শহরের ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়...হইতে স্নাতক উপাধি পি.এইচ. ডি-প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে বে'লেভিউ মেডিকেল কলেজ ফ্যাকাল্টি হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এম.ডি. উপাধি লাভ ক'রেন। তৎপর ওহিও প্রদেশে সিনসিনাটি নগরে...একলেকটিক মেডিকেল ইনস্টিটিউটে দুই দফার শিক্ষাক্রম পাঠ ক'রেন। তৎকালে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্বিশেষে সকল পদ্ধতি শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল (অর্থ্যাৎ অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য বেসরকারী মতবাদ প্রভৃতি) এবং কোন একটা চিকিৎসা-পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত না। উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পাশ করিয়া যে কোনো চিকিৎসক তাহার ইচ্ছানুযায়ী বা রোগী বিশেষে যে কোনো প্রথায় চিকিৎসা করিতেন।...(অতঃপর কেন্ট) মিসুরী প্রদেশের সেণ্ট লুই নগরে... একলেকটিক মতাবলম্বী হইয়া চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হন।"[৯৯] ড: কেণ্ট অল্পদিনের মধ্যেই এই মতের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে পরিগণিত হন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েন। তিনি নিজে এবং তাঁর সহকর্মীগণ মিসেস কেণ্টকে সুস্থ ক'রতে ব্যর্থ হন। তখন স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে তিনি ড: ফেলান নামক একজন হোমিওপ্যাথের শরণাপন্ন হন। হোমিওপ্যাথির প্রতি ড: কেণ্টের আদৌ কোন আস্থা ছিল না। তথাপি মরণোন্মুখ পত্নীর শেষ অনুরোধ বিবেচনা ক'রেই তিনি ড: ফেলানকে চিকিৎসার্থে আহ্বান জানান। "ড: ফেলানের রোগী দেখার পদ্ধতি দেখিয়া এবং আপতঃ দৃষ্টিতে অবান্তর প্রশ্নাবলী শুনিয়া তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রোগী পরীক্ষণে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র অনুবটিকা দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন দু'ঘণ্টা অন্তর এক চামচ ঔষধ দিতে যতক্ষণ না শ্রীমতী ঘুমাইয়া প'ড়েন। উক্ত রোগিনী কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অনিদ্রায় কষ্ট পাইতেছিলেন। ড: কেণ্ট অতিশয় অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে এক চামচ ঔষুধ খাওয়াইয়া নিজের পাঠকক্ষে গিয়া অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া প'ড়েন। ২ ঘণ্টা পরে যে ঔষধ খাওয়াইতে হইবে তাহা ভুলিয়া গেলেন। ঘণ্টা চারেক পরে স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার কথামনে পড়াতে তাঁহার ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারপর প্রত্যহই একবার করিয়া ড: ফেলানকে আসিতে হইত এবং ক্রমশঃ মিসেস কেণ্ট সুস্থ হইয়া উঠিলেন।"[১০০] এ ঘটনা কেণ্টের মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত ক'রে। তখন থেকেই তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

ড: কেন্টের জীবনী আলোচনা ক'রতে গিয়ে বি.কে. সরকার আরও লিখেছেন..."তারপর ড: কেন্ট তাঁর সমস্ত উৎসাহ, অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়া হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ড: ফেলান-ই তাঁহার প্রথম গুরু। তাঁহার নিকট-ই হ্যারিম্যানের অর্গ্যাননের প্রথম পাঠ নিলেন এবং রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রাহীন থাকিয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যত ভাল বই আছে, সেই সব পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিভাবান ব্যক্তি যখন যে বিষয়ে আকৃষ্ট হন, সেই বিষয়ে সম্যকব্যুৎপত্তি লাভ না করা পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারেন না। ড: কেন্ট সম্বন্ধেও এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। তারপর নিজে হোমিওপ্যাথির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া নিজেই হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করিতে আরম্ভ করিলেন।"[১০১]

ড: ফ্যারিংটনের মতই ড: জেমস টেইলর কেন্টও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং একাধারে শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক, আবিষ্কারক ও দার্শনিক।

'মেটেরিয়া মেডিকা'র স্থূল ব্যবহারকে বোনিহোসেন যতটা সহজ ও সূত্রবদ্ধ ক'রেছিলেন ড: নার ও কেন্ট তার আরও উন্নয়ন সাধন ক'রেন। লক্ষণাবলী নির্দেশের ক্ষেত্রে বোনিহোসেনের অসম্পূর্ণতা কেন্ট বিদুরণ ক'রেন। তিনি বোনিহোসেনের পূর্বোক্ত চার শ্রেণীর লক্ষণের সঙ্গে মানসিক ও সার্বদৈহিক লক্ষণাবলীও যুক্ত ক'রেন এবং প্রত্যেকটি রোগীর সামগ্রিক রোগ বৈশিষ্টের অধ্যয়নের ওপর জোর দেন। কেন্ট ১৯০৪ খৃ: প্রকাশিত তাঁর মেটেরিয়া মেডিকার ভূমিকায় লিখেছেন—"হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় যে-পদ্ধতিতে লক্ষণাবলীর তালিকা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে রোগীচিত্র সঙ্কলন ক'রা এক দুরূহ ব্যাপার, বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের পক্ষে"। লেখক তাই "কতকটা কথ্য ভাষায় রোগশয্যা পার্শ্বে 'আতুরবীক্ষণ প্রণালী' অবলম্বন করিয়া ভেষজ লক্ষণাবলী বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।...প্রত্যেকটা ভেষজের বিশিষ্ট চিত্র আছে এবং তাহাদের সম্যক ধারণা করিবার পথও বিভিন্ন....। কতিপয় প্রধান প্রধান ভেষজ এবং যাহাদের সম্পূর্ণভাবে প্রুভিং হইয়াছে তাহাদের চিত্রই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে ছাত্রগণ বুঝিতে পারে-কি উপায়ে বিচ্ছিন্ন লক্ষণাবলী হইতে একটি সামগ্রিক অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভেষজচিত্র উদ্ধার করিতে পারা যায়।"[১০২] অর্থাৎ ড: কেন্ট-এর লক্ষ্য ছিল "হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা পরিভাষিক শব্দ বর্জিত সহজ সরল কথ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রা এবং বিচ্ছিন্ন লক্ষণাবলী হইতে একটি সামগ্রিক অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভেষজচিত্র উদ্ধার"। এভাবে তিনি মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যয়ন তথা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা, প্রায়-অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের নিকট সহজ ক'রে তোলেন।

ড: কেন্ট হোমিওপ্যাথিক গবেষণাতেও প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছেন। তিনি চিররোগ এবং জটিল ও কঠিনরোগ হোমিওপ্যাথির দ্বারা সঠিক ভাবে চিকিৎসা ক'রতে পারতেন। চিররোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ড: কেন্ট অতি উচ্চ শক্তির ওষুধ প্রয়োগে সাফল্য লাভ ক'রেন। তাঁর এ কৃতিত্ব সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—'ড: কেন্ট হ্যানিম্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। কারণ তাঁহার গুরুর ভাবধারার সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যান-ই শুধু ক'রেন নাই, উপরন্তু হোমিওপ্যাথির তত্ত্বজ্ঞান ও ঔষধ প্রয়োগ কৌশল আরও এক ধাপ উন্নয়নের পথে লইয়া গিয়াছেন।....হ্যানিম্যানের

অর্গ্যাননের অনেক গূঢ় তত্ত্বের উপর তিনি প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন, যথা-হ্যানিম্যানের ত্রিদোষতত্ত্ব (সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস তত্ত্ব), সদৃশ বিধান সূত্র অবলম্বনে সামগ্রিকভাবে রোগলক্ষণ লইবার পদ্ধতি, রোগলক্ষণের স্তরভেদ ও ঔষধাবলীর লক্ষণঘটিত ক্রমবিন্যাস, চিররোগের উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতির আবিষ্কার ও উচ্চতর শক্তির ব্যবহার এবং ওষুধের অপপ্রয়োগ হেতু হ্যানিম্যানের নিকটও যে সব রোগাবস্থা চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, সেইসব জটিল রোগের সফল চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি চিররোগের সফল চিকিৎসার জন্য সমলক্ষণ নির্দিষ্ট ঔষধের উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির ক্রমপর্য্যায়ে ব্যবহার। চিররোগ ও ঔষধের অপপ্রয়োগহেতু যেসকল জটিল রোগ চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া মহাত্মা হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণে পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক ঔষধ শক্তি প্রস্তুত করণের পদ্ধতি আবিস্কার-এর পরও যে মত পরিবর্তন ক'রেন নাই (কারণ ৪১ এবং ৭৬ সংখ্যক সূত্র উক্ত সংস্করণেও লিপিবদ্ধ আছে) ড: কেন্ট তাঁহার উদ্ভাবিত ক্রমপর্য্যায় পদ্ধতিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগে তথাকথিত চিকিৎসার অসাধ্য রোগও নিরাময় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"[১০৩] বস্তুতঃ হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বভিত্তিক রোগ-বৈচিত্র্য নির্দেশেও যে, তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল-তা তাঁর গণোরিয়া রোগের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়। তিনি গণোরিয়া রোগকে পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের মত কেবল সাইকোসিস বা মাসকদোষ-জাত ব'লে ক্ষান্ত হননি। তিনি উক্ত রোগের চরিত্র বিচার ক'রে, একে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা-সাইকোসিস দোষজাত গণোরিয়া ও 'সাইকোসিসেওর দোষজাত' গণোরিয়া।

ড: কেন্ট সম্পর্কে ড: সি-ই হুইলার ব'লেছেন-"কেন্টের দ্বারা নূতন জিনিস যাহা প্রযোজিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে-ঔষধ নির্বাচন রীতির পারিপাট্য ; যাহা হ্যানিম্যানকেও কতক পরিমাণে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার উচ্চ শক্তির বিশ্বাস্য প্রয়োগ, যাহা হ্যানিম্যান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অবিচারিত বলিয়া মনে হয় ; ক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি হয় ; অন্ততঃ আমার মতে ইহা সবসময়ে কোন ক্রমেই প্রতিপাদনীয় নহে"।[১০৪] ড: হুইলারের শেষ মন্তব্য অবশ্যই বিতর্কের উর্ধ্বে নয় এবং বীক্ষণাগারের পরীক্ষা নির্ভরও বটে। তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধশক্তির ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে অণু-বিভাজনের নতুন রহস্যের স্বরূপ যদি কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহলেই হয়তো সেদিন সঠিকভাবে বলা যাবে ড: হুইলারের শেষোক্ত মন্তব্য কতখানি সত্য।

বস্তুতঃ ড: হেরিং, ডানহাম, অ্যালেন, গারেন্সী, কেন্ট প্রভৃতির সাধনায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই আমেরিকাতে হোমিওপ্যাথির গুরুত্বপূর্ণ প্রসার ঘটে। ১৯১৯ সালের মধ্যেই আমেরিকায় নয়টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও বাইশটি হোমিওপ্যাথিক ডিপ্লোমা দাতা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কয়েকটি আমেরিকান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময় মেক্সিকোতে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার-আমেরিকা অপেক্ষাও অধিক বিকাশ ঘটে।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যেসব মণীষী হোমিওপ্যাথিক গবেষণা, গ্রন্থরচনা, শিক্ষাদান ও চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে জিব্‌সন মিলার, এফ.এম. ডিয়ারবোর্ণ,

জে.এইচ. ক্লার্ক, উইলিয়ম বোরিক, জি.এইচ. ট্যাফেল, সি.এম. বোগার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে জিব্‌সন মিলার ছিলেন ড: কেন্টের অনুসারী, উত্তর-সাধক ও বন্ধু। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিকাশের ইতিহাসে তাঁর অবদানও অসামান্য। মিলার সম্পর্কে ড: সি.ই. হুইলার ব'লেছেন—"স্বার্থশূণ্য উদ্যম এবং অচলা অনুরক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ড: জিবসন মিলার হইতে গ্রাসগো হোমিওপ্যাথির প্রধান উদ্যম আসিয়াছে এবং তাঁহার উদ্দীপনাই সার্জন উইয়ারের পরিস্থিতিকে এত বড় করিয়াছে এবং ইংরেজ ও স্কচ প্রাকটিসের পুরোভাগে তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছে। জিব্‌সন মিলার, ডাক্তার কেন্টের বন্ধু ও পথানুবর্তী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রধান অবলম্বন-ই ছিল কেন্টের ফিলসফি ও চিকিৎসা-পদ্ধতি।"[১০৫]

ড: কেন্টের পর, জিব্‌সন মিলার ব্যতীত ব্রিটিশ চিকিৎসক ড: জে.এইচ.ক্লার্ক-এর নাম উল্লেখযোগ্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ক্লার্কের তিনটি গ্রন্থ বিশেষ বিখ্যাত। এগুলো হ'ল-'দি ডিক্সনারি অব প্রাকটিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা', 'ক্লিনিক্যাল রেপার্টরি' এবং 'দি প্রেসক্রাইবার'। আলোচ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে শেষোক্তটি বিশেষভাবে সমাদৃত। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। অতঃপর ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় ৪০টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে তার রেপার্টরির হয় ছ'টি সংস্করণ।

বিংশ শতাব্দীর ফরাসী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যে ফ্রাংকোইস কার্টিয়ার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'থেরাপিউটিকস অব রেসপিরেটরি অর্গানস' ১৯১৯ খৃ: প্রথম প্রকাশিত হয়—ফরাসী ভাষায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইটি ঐ বছর-ই আমেরিকাতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ ক'রেন-কার্ল এ, উইলিয়মস। লেখক কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থের ভূমিকাটি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মূল্যবান। ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথদের মতই কার্টিয়ার এ-গ্রন্থে এ্যালোপ্যাথিক রীতিতে রোগানুযায়ী শ্বাসযন্ত্রের হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যনীতি বিশ্লেষণ ক'রেছেন এবং ওষুধ নির্দেশ ক'রেছেন।

ড: কার্টিয়ার এ গ্রন্থের ভূমিকায় পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোকে হোমিওপ্যাথিক ভেষজ-বিজ্ঞানের স্বরূপ যাচাই ক'রেছেন। তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু, সিরাম, এন্টিজেন, এণ্টিবডি ও ইমমিউনিটির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওষুধ শক্তির কার্য্যকারিতা, আণবিক বিভাজনের ফলাফল, স্থূল শক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্ম ওষুধ-শক্তির বিপজ্জনক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা ক'রেছেন। তিনি ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথিক 'অপসোনিন' রীডিং-এর উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন—

"The Homoeopathic School does not remain in the background in this study of opsonins, a study which has already served to verify the action of our remadies in Hahnemannian doses...one dose of phosphorus (এক হাজার শক্তির এক ফোঁটা মাত্র-লেখক) places the organism in a condition of resistance similar to that produced by the injection of immunized serums (experiements made in many places, for instance, by Wheeler, director of the

laboratory in the London Homoeopathic Hospital ; by Burrett, of Ann Arbor, in the University of Michigan, and by Watters, of Boston"[১০৬]

ড: কার্টিয়ার চিকিৎসা-ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির বিকাশ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োগ-যোগ্যতা অনেক অধিক। কারণ, তাঁর ভাষায়—"Nevertheless, in the theraputics of similars, we shall always, despite our small minority, keep in advance of the old school, in the sense that we are not bound to a bacteriotheapeultic specificity, We are the extending the law of similars to all animal ; vegetable and mineral substances, in such a manner that the list of our medicaments in considerable. We include in nosotherapy all the diseases similar to the medicinal disease, Thus we employ the tuberculins in the non-tuberculous diseases of the lungs, in acute bronchitis, as well as in tuberculosis itself. Our therapeuic balance sheet is not to be disdained."[১০৭] এ মন্তব্য যর্থাথ।

অতঃপর ১৯৩৬ সালের ২৪ থেকে ২৯ শে আগস্ট পর্যন্ত গ্লাসগোতে আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ক'রেন বিখ্যাত স্কচ-চিকিৎসাবিদ ড: সি.ই. হুইলার। ঐ সময় স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ ড: জন প্যাটার্সন, ড: প্যাট্রিক, ড: বয়েড প্রভৃতিও এ অধিবেশনে যোগ দেন। সভাপতির ভাষণে ড: হুইলার হোমিওপ্যাথির অগ্রগতি সম্পর্কে ব'লেন...."যেমন জীবাণুতত্ত্ব আবিস্কৃত হইল, হোমিওপ্যাথিক এন্টিজেন, এন্টিবডি, আক্রমণ এবং রক্ষণ-এই সমস্ত বাচ্যে উপযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ব্যবহারিক এবং পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে অনেক প্রশংসনীয় কার্য করা হইয়াছে।"[১০৮]

দু'বছর পর ১৯৩৮ সালে আমেরিকায় 'বিশুদ্ধ খাদ্য আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইনের আওতায় হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ক'রার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন-ড: টি.এইচ. কারমাইকেল, ড: ডব্লিউ এ. গিল্ড, ড: ভিক্টর ডি. ওয়াশবার্ন ও উইলিয়ম উইভার। আর এ কমিটির সহযোগী সদস্য ছিলেন-মি: এ.টি. বোরিক (সানফ্রান্সিসকো), মি.এল. ক্লাপ টি. (বোস্টন), মিঃ ক্যারল ডি. স্মিথ (অরেঞ্জ, এন.জে.) ও মি: জি.এইচ. ট্যাফেল। এই কমিটির আলোচনা ও গবেষণার ফলাফল স্বরূপ সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে পূর্বতণ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া সংশোধিত হয় এবং নতুন 'ফার্মাকোপিয়া অব দি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি' (৬ষ্ঠ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। কতিপয় সংশোধণ ও পরিবর্তন সাপেক্ষে গৃহীত এই ফার্মাকোপিয়া সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ক'রে। ১৯৪১ সালে এটির প্রকাশ ঘটে।

উক্ত ভেষজ-বিধান-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ওষুধ-প্রস্তুত-বিধি হিসেবে হ্যানিম্যানের শততমিক রীতি বর্জিত হ'য়েছে এবং হেরিং-প্রবর্তিত দশমিক রীতি গৃহীত

হ'য়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ, জার্মান, ফরাসী, ভারতীয় প্রভৃতি ভেষজ–বিধানে এখনও শততমিক রীতিতে ওষুধ–প্রস্তুত–বিধি বর্জন ক'রা হয়নি। বরং অধুনা এর সঙ্গে ৫০–সহস্রতিমক শক্তির ওষুধ–প্রস্তুত–বিধি গৃহীত হ'য়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন ও গবেষণা রুদ্ধগতি হয়নি। এই যুদ্ধের প্রায় দেড় দশক পর, হোমিওপ্যাথির বিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে ১৯৫৫ সালে হার্ভে–ফ্যারিংটন তাঁর 'হোমিওপ্যাথি অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রাইবিং–এ লিখেছেন—"Hahnemann, by scientific experimentation on living human beings, repeatedly substantiated the law of similars. For nearly a century and a half this law has been constantly confirmed by scientific clinical observation. And more recently, modern research laboratories are giving us confirmation of the scientific soundness of the action of minute doses and their dynamic action."[১০৯] জীব–শরীরে এই ক্রিয়ার হোমিওপ্যাথি–নিরপেক্ষ কোন উদাহরণ ফ্যারিংটন দেননি। কিন্তু নার এবং কিটাসাটো এ সত্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন যে, কতিপয় ক্ষেত্রে..."Guineapigs were killed after doses eight hundred times weaker than the usual fatal dose."[১১০] পক্ষান্তরে ড: ফ্যারিংটন হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সূক্ষ্ম শক্তিকে 'কলইডাল কেমিস্টি'র আলোকে বিশ্লেষণ ক'রে ব'লেছেন–'আলট্রা অনুবীক্ষণের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই রসায়ন আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানাতে সমর্থ হ'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দশমিক রীতিতে স্বর্ণ থেকে প্রস্তুত ২৫ শক্তির বিচূর্ণ ওষুধ–এর মধ্যে ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ভাগ স্বর্ণের সন্ধান লাভের উল্লেখ করা যায়। আরও উল্লেখ করা যায় রেডিয়াম থেকে দশমিক রীতিতে প্রস্তুত বিচূর্ণ ওষুধের। এই ওষুধের মধ্যে উপস্থিত রেডিয়াম—"Has demonstrated its radioactivity by affecting sensitive photografic plates sufficiently to produce distinct radiographs. আলোচ্য প্রসঙ্গে ড: ফ্যারিংটন লিখেছেন..."And thirty five ciphers to the above fraction and you will have a mathematical expression of the degree of subdivision to which this substance was divided and yet identified by experiment. This radiograph can scarcely be ascribed to the chemical action of the infinitesimal amount of elemental radium present in the trituration used ; but may be accounted for by the force or power or dynamis of its immeasurably minute emanations."[১১১] লেখক প্রসঙ্গতঃ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড: অগাস্ট বায়ার–এর পরীক্ষা–নিরীক্ষারও উল্লেখ ক'রেছেন।

ড: বায়ার হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্মমাত্রা সম্পন্ন ওষুধ মানব–শরীরের কোমাণুরাজির ওপর কি ধরণের ক্রিয়া প্রকাশ ক'রে–তা সন্ধান ক'রেছেন। তিনি যথেষ্ট পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর ব'লেছেন–'মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন তার শরীরের সমস্ত কোষ–ই (মানব শরীরে সর্বমোট ২৫ ট্রিলিয়ন কোষ র'য়েছে।) অসুস্থ হ'য়ে পড়ে না। সুস্থ এবং অসুস্থ কোষের মধ্যে, অসুস্থ

কোষ-ই অধিক মাত্রায় অনুভূতি-প্রবণ হ'য়ে পড়ে। ফলে সমলক্ষণ তত্ত্বানুযায়ী প্রদত্ত ওষুধের ধারণাতীত সুক্ষ্ম ক্রিয়া এই সব অসুস্থ কোষ-ই সহজে আকর্ষণ ক'রে ; সুস্থ কোষ ক'রে না।' ফলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সূক্ষ্মমাত্রা অসুস্থ শরীরের সুস্থকোষ-এর মিডিয়েটরকে প্রভাবিত ক'রতে পারে না কিংবা 'রিসেপ্টার' কর্তৃকও গৃহীত হয় না ; অথচ অসুস্থ কোষের নিউক্লিয়সে তা সহজেই আকৃষ্ট ও প্রবিষ্ট হয়। তাই ফ্যারিংটনের অভিমত-"Cells are stimulated to activity by capillary circulation of the blood, dissolved electrolites, hydrolysis, changes in PH and colloidal interface activity. The balance of all these may be influenced by a (Homeopathic) potentized drug."[১১২] অতএব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে অব্যাহত র'য়েছে-তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫০ সালের পর থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান-গবেষণায় ও প্রয়োগ কলায় আর একটি বিপ্লবাত্মক নতুন পর্যায় শুরু হয়। হোমিও চিকিৎসা প্রণালীর এই স্তর ৫০ সহস্রাতমিক শক্তির চিকিৎসা রীতি নামে আখ্যায়িত। ড: স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের মৃত্যুর ৭৭ বছর পরে ১৯২০ সালে আমেরিকা থেকে তাঁর 'অর্গ্যানন অব মেডিসিন'-এর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রধান বিশেষত্ব ছিল, দশমিক ও শততমিক পদ্ধতির বদলে সহস্রতমিক তথা ৫০--সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের পরামর্শ। কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্বে এ বিষয়ের প্রতি হোমিওপ্যাথিক সমাজের বিশেষ দৃষ্টিপতিত হয়নি। এই সালে ফ্রান্সের ডা: চালর্স পাহ্‌দ ও জেনেভার ডা: পিয়ার স্মিথ প্রথম এই বিশেষত্বের প্রতি বিশ্বব্যাপী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেন।[১১৩] অতঃপর ১৯৫৭ সালে কোলকাতায় 'হ্যানিম্যান' পত্রিকায় ডা: খগেন্দ্রনাথ বসু ও ডা: দেবেন্দ্র-কুমার রায়, পাহ্‌দ ও স্মিথের বক্তব্যের আলোকে বাংলা ভাষায় ষষ্ঠ সংস্করণ ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেন। বাংলাদেশী ডা: "চণ্ডীপদ চক্রবর্তী ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট ৪৩টি ওষুধ এ পদ্ধতিতে প্রস্তুত, প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রেন।"[১১৪] তবে বর্তমানে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ও ভারতে এই শক্তির হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অনিকেত প্রয়োগ ক্রমশঃ হোমিওপ্যাথির মূল ধারার চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বিধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছে।

ঙ. বায়োকেমিক চিকিৎসা

বস্তুতঃ হ্যানিম্যান-প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই বায়োকেমিক বা জৈব-রাসায়নিক চিকিৎসার উৎপত্তি। ডা: বোরিক এবং ডিউই এ-চিকিৎসা পদ্ধতির উৎপত্তির ইতিহাস লিখতে গিয়ে ব'লেছেন—"হ্যানিম্যান-ই সর্বপ্রথম গবেষণা দ্বারা জড় বা অচেতন ধাতব পদার্থ হইতে রোগোৎপাদন এবং আরোগ্যকর ক্ষমতার কথা প্রকাশ ক'রেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানব-শরীরে পরীক্ষা দ্বারা জড় পদার্থ ধাতব লবণ, চূণ, যবক্ষার বা পটাশ, বালি প্রভৃতি অসংস্কৃত অবস্থায় যাহা নিষ্ক্রিয় ছিল তাহাকে আরোগ্যকর উপাদানীভূত ঔষধে পরিণত ক'রেন।"[১১৫] কিন্তু বায়োকেমিক চিকিৎসার প্রকৃত সূচনা ও বিকাশ ঘটে

হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য-নীতিকে অস্বীকার ক'রে। জার্মানীর ওল্ডেনবার্গবাসী ডা: এম.ডব্লিউ. এইচ সুসলার-ই এই নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তক।

১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে ড: সুসলার একটি জার্মান হোমিওপ্যাথিক পত্রিকায় 'সংক্ষিপ্ত থেরাপিউটিকস্', নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি তাঁর গবেষণার স্বাতন্ত্র্য ও এক বছর ব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন ক'রেন। তিনি তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে ব'লেন—"আমি এক বৎসর ধরিয়া পীড়ার চিকিৎসার জন্য এই সকল উপাদানীভূত ঔষধগুলি রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে সকল পদার্থ দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও অকৃত্রিম নহে, তাহাদের দ্বারা রোগ আরোগ্য হইতে পারে না।"[১১৬]

তাঁর এ ঘোষণায় চিকিৎসা-জগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ডা: সুসলারের মতামতের বিরুদ্ধে ঐ পত্রিকায় লিপজিগ্-এর ড: লরবেচার কর্তৃক লিখিত একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ড: সুসলার এর জবাবে 'অ্যাব্রিজড সিস্টেম অব থেরাপিউটিকস'নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেন। রচনাটি ঐ পত্রিকার সাতটি সংখ্যায় প্রকাশ লাভ ক'রে।

ড: সুসলারের এই রচনা তাঁর বন্ধু ও সহমতাবলম্বী চিকিৎসক ড: এইচ.সি.জি. লুইটিস জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ ক'রেন। অতঃপর আমেরিকান মহান হোমিওপ্যাথিক ডা: কনস্টানটাইন হেরিং ড: সুসলারের মতবাদ পরীক্ষা ক'রেন এবং 'বায়োকেমিক চিকিৎসার সমর্থনে 'টুয়েলভ বায়োকেমিক রিমেডিজ' নামক গ্রন্থ রচনা ক'রেন। আমেরিকাতে গ্রন্থটি অত্যন্ত আদৃত হয়। তাঁকে অনুসরণ ক'রে ড: বোরিক এবং ডিউইও এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হন। তাঁদের রচিত 'দি টুয়েলভ টিস্যু রিমেডিজ' গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত। ড: সুসলার-এর গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণ অনুবাদ ক'রেন-স্কটল্যান্ডের ড: জে.টি. ও'কনার এবং এম. ডসোটি ওয়াকার। তারপর ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় জি.ডব্লিউ ক্যারে লিখিত 'দি বায়োকেমিক সিস্টেম অব মেডিসিন'। জে.বি. চ্যাপম্যান-এর 'বায়োকেমিস্ট্রি'র প্রকাশ ঘটে এর পরে। আলোচ্য প্রসঙ্গে জার্মান মণীষী ড: ভণ্ডারগজ-এর ব্যাপক গবেষণা-সমৃদ্ধ 'ম্যানুয়েল অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল রিপার্টারি অব এ কম্পিলিট লিস্ট অব টিস্যু রিমেডিজ'এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে বায়োকেমিক চিকিৎসা-পদ্ধতির অধিকতর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হ'য়েছে। এ গ্রন্থে ড: সুসলারের বারোটি ঔষুধ ছাড়া আরও বায়াত্তরটি ওষুধ বিদ্যমান। কিন্তু সেগুলো চিকিৎসার নিমিত্ত ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন, তেমনি বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাংলাতেও বায়োকেমিক চিকিৎসাতত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে। এগুলোর মধ্যে ডা: ইউ.এম. সামন্ত-র 'বায়োকেমিক চিকিৎসা বিধান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাহোক, এম.ডব্লিউ.এইচ ড: সুসলার-এর চিকিৎসা-পদ্ধতির মূল কথা এই যে, মানব দেহ দু'রকম বস্তু দ্বারা গঠিত-জৈব ও অজৈব। ইংরেজীতে এদের বলা হয় অর্গ্যানিক ও ইনঅর্গ্যানিক পদার্থ। উভয়ের মধ্যে জৈব অপেক্ষা অজৈব পদার্থের ভূমিকাই শরীরের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইনঅর্গ্যানিক বা অজৈব পদার্থের সহায়তা ভিন্ন, অর্গ্যানিক বা

জৈব পদার্থ শরীর-ক্রিয়ায় সাহায্য দান ক'রতে পারে না। শরীরের জৈব উপাদানের মধ্যে র'য়েছে—শর্করা, চর্বি ও অণ্ডলালীয় পদার্থসমূহ। আর অজৈব উপাদানের মধ্যে র'য়েছে—পানি এবং কতিপয় কৌষিক-লবণ বা 'সেল-সল্টস্'।"[১১৭] শরীর দগ্ধ করলে কেবলমাত্র অজৈবিক পদার্থই লাভ করা যায়। জৈবিক এবং অজৈবিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়-উক্ত পদার্থসমূহের আপেক্ষিক পরিমাণসাম্যে। মানব দেহের রক্ত পরীক্ষা ক'রলেও দেখা যায়-এই উভয় প্রকার পদার্থই তাতে বিদ্যমান এবং এগুলো শারীরিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে।

ড: সুসলার ব'লেছেন—মানব শরীরের অজৈব পদার্থসমূহের মধ্যে বারোটি খনিজ লবণের ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো দ্বারা কোষ ও তন্তসমূহ নির্মিতি এবং পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি পূর্বোক্ত অজৈবিক পদার্থ নিচয়ের কোনটির অভাব কিংবা স্বল্পতা ঘটে—তাহলে শরীরস্থ জৈবিক পদার্থসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে শরীর অসুস্থতাজনিত রোগলক্ষণ প্রকাশ ক'রে। অতএব আলোচ্য মতে, স্বাস্থ্য ব'লতে মানবদেহের কোষ ও তন্তরাজির স্বাভাবিক রূপান্তরকে বোঝায়। এক্ষেত্রে 'তন্ত'র পরিপোষণের জন্য রক্তের যে ক্ষয় হয় তা' খাদ্য ও পানীয় পরিপাক দ্বারা পূরণ হ'য়ে থাকে। শরীরস্থ কোন মৌলিক পদার্থের ক্রিয়াবিকার না ঘটিয়েই তা সম্পন্ন হয়। কিন্তু পূর্বালোচিত মৌলিক পদার্থের সামান্যতম অংশেরও যদি গতিবিপর্যয় বা পরিমাণগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, ত'াহলে তন্তকোষ আহত হয় এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা শরীরে যে-'অজৈবিক লবণ'-এর স্বল্পতা ঘ'টেছে, তা প্রকাশ লাভ ক'রে। শরীরের সুস্থতা সম্পাদনের জন্য তখন উক্ত অজৈবিক 'লবণ'টি ঔষধ রূপে সেবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর সে প্রয়োজন মেটালেই মানব-দেহ সুস্থ হ'য়ে ওঠে।"[১১৮] তাই ড: সুসলারের নতুন মতের প্রধান কথা হ'ল-প্রকৃত বস্তু দ্বারা শরীরের অভাব পূরণ করা। অর্থাৎ যে-যে অজৈবিক পদার্থের স্বল্পতার কারণে যে-যে পীড়ার সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই-সেই পদার্থ দ্বারা উক্ত অভাব পূরণ করা এবং পীড়া আরোগ্য করাই বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলকথা। হ্যানিম্যান যেখানে ওষুধ-লক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন ; ড: সুসলার সেখানে জোর দিয়েছেন—একমাত্র দৈহিক উপাদানের ওপর। এজন্য তিনি হাজার হাজার ওষুধের বদলে, শুধুমাত্র, মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বারোটি 'লবণ'-এর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। উক্ত লবণসমূহ যথাক্রমে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকাম, ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম, ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম, ফেরম ফস্ফরিকাম, ফেরাম মিউরিয়োটিকাম, কেলি ফসফরিকাম, কেলি সালফিউরিকাম, নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম, নেট্রাম ফসফরিকাম, নেট্রাম সালফিউরিকাম, ম্যাগনেশিয়া ফসফরিকাম ও সাইলিশিয়া।"[১১৯]

উক্ত বারোটি লবণের যে-কোনটির পরিমাণগত স্বল্পতা বা 'অভাব',ঘটলে, মানব-শরীর নানাবিধ লক্ষণের দ্বারা বাহ্য অভিব্যক্তি দান ক'রে। যেমন-শরীর-গঠনের ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম নামক অজৈব পদার্থটি শরীরস্থ অন্তলালিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অস্থি, পেশী প্রভৃতি গঠনে নিয়োজিত হয়। কিন্তু রক্তে উক্ত ক্যালকেরিয়া ফসফরিকামের স্বল্পতা দেখা দিলে অন্ডলালিক পদার্থ অকার্যকর হ'য়ে পড়ে। তখন তা নানা পথে শরীর থেকে নির্গত হ'তে থাকে। এ বহির্গমণ যখন নাসা পথে হয়, তখন তাকে সর্দি

ব'লে ; আর যখন প্রস্রাব পথে হয়, তখন তাকে ব'লে অ্যালবুমিনুরিয়া বা সান্ডলালিক মূত্র। দেশীয় মতে 'শ্লেষ্মমেহ'। অতএব যে কোন পথেই অন্ডলালিক পদার্থ নির্গত হোক না কেন, তা অবশ্যই শরীরের বিধান তন্তুতে এবং রক্তে ক্যালকেরিয়া ফসের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অভাব-নির্দেশক।"[১২০]

ড: সুসলার অবশ্য বারোটি ধাতব লবণ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার অজৈব লবণ শরীরে বিদ্যমান ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। কিন্তু সেগুলো তিনি ঔষধার্থ আবশ্যক ব'লে মনে ক'রেননি। তাঁর মতে চিকিৎসার জন্য ক্যালকেরিয়া সালফেরও তেমন প্রয়োজন নেই। ড: সুসলার তাঁর গ্রন্থের শেষ সংস্করণে উক্ত ওষুধের বদলে ন্যাট্রম ফস ও সাইলিশিয়া ব্যবহার-এর নির্দেশ দিয়েছেন।"[১২০/ক]

উল্লেখযোগ্য যে, হোমিওপ্যাথিতে তরল ও চূর্ণ উভয় প্রকারেই-ওষধু ব্যবহার করা চলে। কিন্তু বায়োকেমিক মতে তরল ওষুধ নয়-একমাত্র বিচূর্ণ ওষুধ-ই প্রযোজ্য। কেননা, আলোচ্য মাতানুযায়ী মানব শরীরের রস-রক্তাদিতে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা সুরাদির ন্যায় কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। কাজেই শরীরে যখন সুরার মত কোন পদার্থ নেই, তখন তা চিকিৎসার্থ ব্যবহার করাও উচিত নয়।"[১২০/খ]

চ. লোক-চিকিৎসা

আয়ুর্বেদী, ইউনানী, অ্যালোপ্যাথি ইত্যাদি চিকিৎসা-পদ্ধতির ইতিহাসের মত লোক-চিকিৎসার কোন লিখিত ইতিহাস নেই। অথচ ও.পি. জ্যাগ্‌গির ভাষায়-"Folk Medicine was practised during the Ayurvedic period ; it is still practised in the twenteeth century."[১২১] বলা বাহুল্য, লোক-চিকিৎসা শুধু যে এখন আছে এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসার প্রথম দিকেও ছিল—তা নয়, বরং চিকিৎসা অতি প্রাচীনকালেও বর্তমান ছিল।

বস্তুতঃ কখন থেকে লোক-চিকিৎসার সূচনা-তা কারো পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা, একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, মানুষ যদি সত্যি সত্যি কোন দিন প্রাণীস্তরে থেকে থাকে, তবে সেই সময়ও সে দেহরক্ষা বা জীবন-রক্ষার জন্য প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির ঔষধমূলক সহায়তা গ্রহণ ক'রত। এরকম ধারণার কারণ এই যে, বর্তমান-প্রাণীজগতেও অনেক প্রাণীকে দেহ-রক্ষা, শত্রুনিধন ও জীবন-সংরক্ষণের জন্য মাটি-গাছ-লতা-পাতা-শিকড়-বাকড় ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ ক'রতে দেখা যায়। শারীরিক সুস্থতা ও শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রাণী মাত্রেই কিছু না কিছু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, গোরুর 'নোনতা'-মাটি খাওয়া', বিড়ালের 'দুর্বার আগা ভক্ষণ', ও বেজির সর্পগন্ধার শিকড় ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। সাপ ও বেজির লড়াইয়ে সাপকে দমন ক'রার জন্য বেজি, লতা-গুল্মের শিকড়ের আশ্রয় নেয়। আবার সাপ ও বৃহৎ শিকার হজম ক'রার জন্য এবং চলৎশক্তি ফিরে পেতে-গাছের সাহায্য গ্রহণ ক'রে। কাঁধে দাদযুক্ত গোরু, গাছে কাঁধ ঘষে, চুলকানি-নিবারণের জন্য। 'নোনা মাটি' খেলে যে, হজমের সহায়তা হয়,

সেটা সহজেই বোঝা যায়। বিড়াল পেটের অস্বস্তি বা বদহজম জনিত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্যই দুর্বার আগা ভক্ষন ক'রে বমি ক'রে এবং সুস্থ হয়।

এ থেকে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, প্রাণীযুগে তো বটেই এমন কি আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন বছর আগে "অলিগোসিন যুগে মানুষের পূর্ব পুরুষ যখন 'হোমিনিড'-রূপে ঘুরে বেড়াতো এবং তাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা 'ইজিপ্টোপিথেকাস', 'প্রোপ্লিওপিথেকাস' এবং 'অলিগোপিথেকাস'রূপে দলবদ্ধভাবে বাস ক'রত তখন তারাও রোগ, দৈব দুর্বিপাক, শত্রুর আঘাত ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবার জন্য পরিবেশের সহায়তা গ্রহণ ক'রত। প্রাণীজগতে 'হোমো ইরেক্টাস'দের আবির্ভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং তাদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে 'নিয়ান্ডারথালম্যান'-এর বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং আরও পরে আধুনিক মানুষের আবির্ভারের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গেই লোক-চিকিৎসার আদি উৎপত্তির কাহিনী জড়িত। ফ্রাংক-ই পোরিয়ার দক্ষিণ ফ্রান্সে আবিষ্কৃত মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগের একটি গুহায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বিবরণ দিতে গিয়ে একটি কাঠের পাত্রের বা বাটির দাগের উল্লেখ ক'রেছেন। তারপর লিখেছেন-"In a corner, near the 'bowl' excavators found Lumps of the natural pigmentred ochre."[১২২] লেখকের ধারণা এই লাল রং দিয়ে ঐ স্থানের অধিবাসীরা শরীর চর্চিত ক'রত। এ প্রথা আজও আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে বিদ্যমান। সেই সঙ্গে ঐ রং যে চিকিৎসা কার্যেও ব্যবহৃত হয়, সেকথা পরে আলোচনা করা হবে। পোরিয়ার প্রায় ৪৫ হাজার বছর আগেকার ইরাকের শানিদার গুহায় প্রাপ্ত কতিপয় নরকঙ্কালের মধ্যে একটির বাঁ চোখের উপরিভাগে তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত এবং ডান হাত ব্যবচ্ছেদের নিদর্শনের উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁর মতে কোন 'কেভম্যান সার্জন', এই 'অপারেশন' ক'রেছিলেন এবং রোগীটি সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল।'[১২৩] এসব চিকিৎসা যে লোক-চিকিৎসার-ই প্রাচীনতম নিদর্শন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'মেটেরিয়া মেডিকা'র ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গিয়ে তাই বার্গার্সেন ঠিকই ব'লেছেন...The story of materia medica is as old as the story of man, for sickness has been man's heritage from the beginning of time and the search for ways and means to combat disease has been one of his earliest and most persistent activities."[১২৪]

বস্তুতঃ বন্যজীবন, গুহাজীবন এবং ভ্রুণোপম গ্রামজীবনের সমস্ত পর্যায়েই মানুষকে জীবন ধারণের নিমিত্ত খাদ্য, ও রোগমুক্তির জন্য ওষুধের সন্ধান ক'রতে হ'য়েছে। এক্ষেত্রে আগুন, তাপ, কয়লা, ছাই, মাটি, ঝরণার পানি, শিশির, কাদা, লতাপাতা ও শিকড়-বাকড়ের রস প্রভৃতি চিকিৎসার প্রাথমিক উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হ'তে থাকে। চর্বি, গিরিমাটি, নানাবিধ রং ও ক্রমে ক্রমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। প্রস্তর যুগের যে সব গুহা-চিত্র ও সমাধি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে—সেগুলো বিশ্লেষণ ক'রে পণ্ডিতগণ লাল রংয়ের প্রতি আদিম মানুষের অনুরাগ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম জাতির নিকট সেই সুদূর অতীতের মত এখনও 'লাল রং'-জীবনের উৎস। অ্যান্টনি আর, পাইল অস্ট্রেলিয়ার আদিম

জাতির গুগাজা গোত্রের মানুষের মধ্যে বর্তমান যুগেও চিকিৎসার নিমিত্ত হলুদ ও লাল রংয়ের ব্যবহার লক্ষ্য ক'রেছেন। প্রাচীন গুহা-চিত্র, প্রাচীন ধর্মাচার ও একালের আদিম জাতিসমূহের জীবনাচারণ লক্ষ্য ক'রলে নীল ও সবুজের প্রতি তাদের 'বিরাগ' এবং লাল রংয়ের প্রতি তাদের 'অনুরাগ' উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবতঃ বন্য-জীবনে মানুষের বিশেষ শত্রু সর্প-দংশনের ক্রিয়ার জন্য ঐ দু'টি রং-ই ছিল ভীতিকর। তারা দেখেছে সর্ব-দষ্ট মানুষ নীল রং ধারণ ক'রে মারা যায়। তাই এটি ছিল তাদের নিকট মৃত্যুর চিহ্ন। সবুজ ছিল এর-ই কাছাকাছি। আদিম মানুষের নিকট হলুদ রংও ছিল ভীতিপ্রদ। তা হয়তো ছিল সাংঘাতিক পীড়ার-ই পূর্ব-সংকেত। তারা দেখেছে—গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ ক'রলে ঝরে যায়। মানুষ কোন কোন রোগে (যেমন জণ্ডিস) আক্রান্ত হ'লে, তার চোখ-মুখ হ'লদে হ'য়ে যায় এবং তারপর ম'রে যায়। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলেও মানুষের শরীর এবং চোখ-মুখ ফ্যাকাশে বা হ'লদে রং ধারণ ক'রে। এসব থেকে ধারণা ক'রা অসংগত নয় যে, আদিম মানুষের রোগ, চিকিৎসা ও মৃত্যু সম্পর্কীয় ধারণায় লাল রং ছিল 'জীবন', 'হলুদ' রং ছিল 'পীড়া', সবুজ রং ছিল মুমূর্ষু ও নীল রং ছিল-মৃত্যুর চিহ্ন। এজন্যেই হয়তো আজও আমাদের দেশে 'তাবিজ-কবচ-নাকশী' ইত্যাদি 'ভাঙানো'র জন্য 'সবুজ' ও 'নীল' রঙের সূতা ব্যবহৃত হয়। ওঝারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ ধরণের পাড়ের সূতার মন্ত্রপূত গিঠে দিয়ে রোগীকে রক্ষা করার বা চিকিৎসার প্রয়াস পান। এ ধরণের চিকিৎসা প্রতিরোধমূলক পীরালী চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত, পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে এ 'ব্লাক ম্যাজিক' এর অংশ।

মানব-সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে লোক-চিকিৎসার ইতিহাসে মিশরের একটি দেয়াল-চিত্র উল্লেখ্য। ঐ চিত্রে দেখা যায়-মিশরের ফারাও সম্রাট শংখর, মৃতদেহকে প্রলিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এডেন থেকে লোহিত সাগর পথে, দারুচিনি ও সোনামুখীর গাছ আনয়নের জন্য জাহাজ পাঠিয়েছেন। কর্ণাক মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র থেকেও দেখা যায়—রাণী হাৎশেপসুৎ ঔষধি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নৌবহর পাঠিয়েছিলেন—সোমালিল্যান্ড বা আবিসিনিয়ায়।[১২৫] মিশরীয় প্রাচীন চিকিৎসা-নিদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত ক'রতে গিয়ে ও.পি. জ্যাগগি জনৈক মিশরীয় চিকিৎসকের একটি প্রেসক্রিপশনের উল্লেখ ক'রেছেন। ব্যবস্থা পত্রটি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। রহস্যময় চিহ্ন সংবলিত এই ব্যবস্থা-কোষটি একটি পৌরাণিক পীড়া-কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। শয়তানদের দানব, শেঠের আক্রমণে শিশুকালে হোরাস তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন হোরাস-এর মাতা আইসিস শীঘ্র থথকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান জানান। থথ তার (চিকিৎসা) জ্ঞানের দ্বারা দ্রুত শিশুটির চক্ষু আরোগ্য ক'রেন। এ ঘটনা দৈবভাবে রক্ষা ও নিরাময়ের প্রতীক হিসেবে মিশরীয়দের হোরাসের চক্ষুপূজায় নিয়োগ ক'রে।[১২৬]

সুমেরীয় সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যেও ভেড়ার যকৃতের আকৃতি সম্পন্ন প্রচুর পোড়ামাটির চাকতি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুমেরীয়দের ধারণা ছিল রোগ আসে ভেড়ার যকৃৎ থেকে। বিশেষ বিশেষ রোগীকে আরোগ্যের নিমিত্ত ভেড়ার যকৃতের অনুরূপ-আকৃতি-সম্পন্ন মাটির চাকতি দেবতাকে উৎসর্গ করা হ'ত। হয়তো এ ছিল 'মানতের'ই

উৎসর্গ। তাছাড়া রোগমুক্তির জন্য ভেড়ার নাসিকায় রোগীর নিঃশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে, ভেড়াটিকে জবাই ক'রে, রোগ হত্যা করা হ'ল ব'লেও মনে ক'রত তারা।

অনুরূপভাবে খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যেও মানত, উৎসর্গ এবং গাছপালার চিকিৎসামূলক ভূমিকার সাক্ষ্য লাভ করা যায়। হরপ্পা, মহেনজোদাড়ো ও রাণা ঘুণ্ডাইয়ে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময় নারী-মূর্তি-পেটে অথবা কোলে সন্তানসহ প্রচুর পাওয়া গিয়ছে-ওগুলো সন্তান কামনায় বন্ধ্যা নারীরা দেবতার নিকট মানত ক'রতেন ব'লে পণ্ডিতগণ মনে ক'রেছেন।"[১২৭] এই সব নিদর্শনের মধ্যে হরোপ্পাতে প্রাপ্ত একটি অদ্ভূত সীল সম্পর্কে প্রত্ন তাত্ত্বিকগণ যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন ক'রেছেন-তা থেকে আরও কিছু অধিক কথা সম্ভবতঃ বলার আছে। সীলে উৎকীর্ণ র'য়েছে একটি নারীমূর্তি-তার যৌনাঙ্গ থেকে উত্থিত হ'চ্ছে একটি লতা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ-চিত্রের ব্যাখ্যায় লিখেছেন "সিলের উপরের নারী চিত্রটির পিছনে লুকিয়ে আছে এক অতি আদিম বিশ্বাস...তা'হ'ল নারী-দেহ থেকেই আদিশস্যের উদগম হ'য়েছে।"[১২৮] দেবীপ্রসাদ মূর্তিটিকে দেবী দুর্গার প্রাচীন রূপ ব'লে মনে ক'রেছেন। সেকথা যদি সত্য হয় এবং সিন্ধু-উপত্যকার পুরুষ দেবতা 'আন' যদি হন শিবের-ই পূর্বরূপ তা হ'লে, তাঁর পত্নী 'অম্মা'-রূপী এই দেবী-চিত্র থেকে আরও একটি ইঙ্গিত লাভ করা যায়। তা হ'ল-ঐ লতাটি হয়তো দুর্গা-শরীরে সর্প-বিষঘ্ন লতা-বিশেষ। ভস্মলিপ্ত, সর্পভূষণে ভূষিত, শিব-সন্নিধানে গমণকালে সর্প-বিতাড়ন ও বিষ-জারণে ওটা দুর্গার রক্ষা-কবচ। কারণ একথা অজ্ঞাত নয় যে, সর্পগন্ধাই শুধু নয়, ছোট চিতা, ইচা লতা প্রভৃতিও সর্পের অতিশয় অপ্রিয়। সাপুড়েরা ব'লেন—এ সব লতা ও গাছ-গাছালী যেখানে থাকে, সাপ সেখানে থাকে না, চ'লে যায়। পূর্বোক্ত দেবী-চিত্রে লতা গাছের অবস্থান শিব-শরীর থেকে সর্প-বিতাড়নের সহজ উপায় ব'লে ধারণা ক'রা অসঙ্গত নয়।

প্রসঙ্গতঃ মানব-সমাজে সর্পপূজার আদিমতা সম্পর্কেও চিন্তা ক'রা আবশ্যক। আদিম মানব-সমাজে বৃক্ষপূজা ও সর্প-পূজার মধ্যে সর্প-বিষ চিকিৎসারও প্রাচীনতম নিদর্শন সন্ধান ক'রা বাঞ্ছনীয়। সম্ভবতঃ আদিম জনসমাজে পাথর পূজা, প্রতীক পূজা, বৃক্ষপূজা, সর্পপূজা, মন্ত্র এবং প্রার্থনা ছিল খাদ্য ও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত দৈবী উপায়। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গৃহীত হ'য়েছিল-নৃত্য, মন্ত্র, অগ্নি-প্রজ্জ্বলন, জলদান, ভোগদান প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, আজও এগুলো সর্প-বিষ-চিকিৎসা ও বিভিন্ন রকম লোক-চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে-গ্রাম ও নগরের পত্তনকালে মানুষের দৈবী শক্তিতে বিশ্বাস গভীরতা লাভ ক'রে। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণী-বিভাগ স্পষ্ট হ'তে থাকে, তার-ই সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় বেড়ে উঠতে থাকে—দেবতা ও উপবেদতা বা অপদেবতাদেরও শ্রেণী বিভাগ। এটিই ক্রমশঃ দৈবী শক্তি ও অলৌকিক শক্তিতে নানাভাবে পৃথক হ'য়ে যায়। স্বভাবতঃই আদিতে মানুষ যখন ভাল ও মন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল সেই সময় থেকে দেব-দেবতারাও বিভক্ত হ'লেন ভাল ও মন্দ এই দু'ভাগে। তারপর মন্দ মানুষের

নানা রকমফের সৃষ্টির পাশিপাশি, মন্দ দেবতা বা অপ-দেবতাদেরও বিভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি হ'ল। টোটেম ও ট্যাবু-নির্ভর গোত্রবদ্ধ গ্রাম-সমাজের গ্রাম-দেবতা ও পারিবারিক দেবতারা ছিলেন যথাক্রমে গোত্রপতি বা গ্রামাধিপতি ও পরিবার-পতির রূপক। এজন্য পারিবারিক দেবতা সর্বদাই শুভ ও কল্যাণকর-উত্তম ; পক্ষান্তরে গ্রাম-দেবতা ক্রুর বা ভয়ঙ্কর। কখনো ক্রুদ্ধ, কখনো দয়াবান। রোগদান ও চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাম ও পারিবারিক দেব-দেবীর হাত ছিল, সেই সঙ্গে আরও হাত ছিল স্বর্গীয় এবং বায়বীয় আরও নানা অদৃশ্য রোগ-দেবতার। আদিম মানুষের সর্ব প্রাণবাদী চিন্তাধারা দুনিয়ার সর্বত্রই এরকম অসংখ্য দেব-দেবতার জন্ম দিয়েছিল। তাই অজিত কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—"একেবারে গোড়ায় মানুষ ভাবত রোগের কারণ হ'চ্ছে প্রেতের প্রভাব বা দেবতার রোষ। প্রেত আসে মৃত বা জীবিত (?) ব্যক্তির কাছ থেকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্য তার কল্পনায় ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রেত। এক ব্যাবিলনেই প্রায় এক লক্ষ প্রেতের উপদ্রব ছিল।"[১২৯]

বলাবাহুল্য, ব্যাবিলন, মিশর, ইরাক, চীন, ভারত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশের-ই প্রাচীন জনসমাজ তো বটেই, এমনকি উন্নত ধর্মসমূহের আবির্ভাবকালেও রোগমূলক প্রেতবাদ বা দৈবী এবং আধিদৈবিক শক্তির প্রতি আস্থা লক্ষণীয়। এই পর্যায়ে এসে দৈবী চিকিৎসার মানত, উৎসর্গ, হোম, বলিদান, তর্পণ, মন্ত্র, নৃত্য, পূজা ও প্রার্থনার পাশাপাশি অধি-দৈবিক উপায় স্বরূপ রাজ-স্পর্শ, পুরোহিতের আশীর্বাদ, ধার্মিক ব্যক্তির দোয়া, ধর্মশাস্ত্রের বাণী বা আয়াত, শ্লোক ইত্যাদির ব্যবহার, নানারকম ধর্মীয় রহস্যময় অনুশীলন-ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর প'ড়তে থাকে এবং চিকিৎসার একটি আদি-দৈবিক ও আধি-ভৌতিক রূপের বিকাশ ঘটে।

অনেকে মনে ক'রেন দৈবশক্তির প্রতি আস্থা কাটিয়েই আধুনিক চিকিৎসার বা উন্নত চিকিৎসার উদ্ভব। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়-উন্নত চিকিৎসার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমী অ্যালোপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসা ভিন্ন আর সমস্ত চিকিৎসাতেই দৈব-নির্ভরতা বিদ্যমান। এটি যে লোক-চিকিৎসার-ই প্রভাব এবং প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের-ই প্রতিফলন-তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ লোক-চিকিৎসা ও উন্নত চিকিৎসার পার্থক্যের সূচনা হয়-পুরোহিতবাদের উন্মেষের সময় থেকে। এজন্য লোক-চিকিৎসা থেকে প্রথম যে বিশিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভব, তা হ'ল-'পীরালী' বা খান্‌কাহ ও 'মন্দির-পুরোহিত' কেন্দ্রিক চিকিৎসা। এই জন্য পূর্বোক্ত আলোচনায় যে সব চিকিৎসা উপকরণের প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ ক'রা হ'য়েছে—সেগুলো সর্বোতভাবে লোক-চিকিৎসার পরিচায়ক নয়। কিন্তু উন্নত ও বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির আবির্ভাবের পর 'মন্দির-পুরোহিত' কেন্দ্রিকও মুসলিম পীরালী চিকিৎসার অধোগতি হওয়ায়-অধুনা তা লোক-চিকিৎসার-ই অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

লোক-চিকিৎসা থেকে স্বতন্ত্র ও মর্যাদাবান চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে 'পীরালী' চিকিৎসার বিকাশ ঘটে-লোকমনে দৈবী শক্তির প্রতি ভয়-ভক্তি ও ধর্মগুরুদের প্রতি আনুগত্যের সূত্রেই। পীর-পুরোহিতরা যে, চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ ও উপায় দৈবী সূত্রে পেতেন, তা নয়-বরং ; তাঁরা সমকালীন লোক-চিকিৎসার বিশেষ ফলদায়ক উপকরণগুলোও গোপনে আয়ত্ব

ক'রতেন এবং সেই সঙ্গে যোগ ক'রতেন নিজেদের ধর্মীয় উপকরণও। এই সমন্বয় যে কিভাবে হ'য়েছে—তা নিরূপণ করা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা, ধর্মশাস্ত্রের কোন কোন শ্লোক, 'মন্ত্র' নামধারী কিছু কিছু কথা কিংবা প্রতীকী কিছু কিছু সাংকেতিক শব্দ, অক্ষর বা সংখ্যা-কিভাবে, কোন্ গুণে, কি কারণে এবং কেনই বা বিশেষ শক্তি সম্পন্ন (চিকিৎসা শক্তিসম্পন্ন) হয়-তা বৈজ্ঞানিকভাবে আদৌ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পীর-পুরোহিতগণ এ ব্যাপারে উদ্ভাবকের ভূমিকা পালন ক'রেন নি, বরং গ্রাম্য, ওঝা-বৈদ্য-গুণীনদের তন্ত্র-মন্ত্র সাধনার সূত্র থেকেই উক্ত পদ্ধতি লাভ ক'রেছেন। তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি ক'রেও লোক-চিকিৎসার দহন, প্রলেপন, ঝাড়ন, ধারণ, গ্রহণ, রক্তমোক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ ক'রেছেন।

রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে 'পীরালী'-চিকিৎসা ক্রমে 'রাজকীয় চিকিৎসা'য় রূপান্তরিত হয় এবং সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে তা' বংশগত গুপ্তবিদ্যার বদলে পেশাদার শ্রেণীর অনুশীলিত চিকিৎসায় রূপান্তরিত হয়। জন্ম হয় রাজানুগ্রহ-পুষ্ট চিকিৎসক শ্রেণীর। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বৎসর আগেকার ব্যাবিলন রাজ হাম্মুরাবির কোড, খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকের মিশরের ইবের্স প্যাপিরাস, খৃষ্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় অথর্ববেদ প্রভৃতিতে উক্ত পেশাদার শ্রেণীর চিকিৎসকদের আদি উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রাজতন্ত্রের অওতায় এসেই পেশাদার রাজকীয় চিকিৎসক শ্রেণী লাক-চিকিৎসকদের থেকে আলাদা হ'য়ে যান। তাঁরা পরিণত হন—রাজ সরকার থেকে বেতনভোগী কর্মচারীতে। ধর্ম-মন্দিরের সাথে তাঁদের সম্পর্ক অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাল-পরিধিতে তা দীর্ঘদিন টিকে ছিল। মিশরে ইমহোটেপের মন্দির-ই ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার স্থান। পূর্বোক্ত ইবের্স প্যাপিরাস থেকে জানা যায়, তৎকালে... "The doctors were all priests paid out of the royal treasury, but they were allowed to take fees also." [১৩০] মূলত বেতন ও ফি গ্রহণ পেশাদারী চিকিৎসাকে লোক-চিকিৎসা থেকে আরও এক ধাপ দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ লোক-চিকিৎসার মূল ভিত্তি আজও জন-সেবাই, পক্ষান্তরে, বৃত্তিজীবী চিকিৎসার লক্ষ্য অর্থোপার্জন।

বলাবাহুল্য,—ব্যাবিলন, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশে মন্দির-পুরোহিত কেন্দ্রিক চিকিৎসা, বৃত্তিমূলক চিকিৎসা-ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হ'লেও, চিকিৎসা-উপকরণের লৌকিক উপাদান সমূহ বর্জিত হয়নি। নতুন চিকিৎসক শ্রেণী, সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর মনোরঞ্জনকারী অনেক অভিনব প্রথা-পদ্ধতির উৎপত্তি ঘটিয়েছে সত্য, কিন্তু সনাতন রীতির লোক-চিকিৎসা সূত্রে আগত মানত, মন্ত্র, প্রার্থনা, রক্তমোক্ষণ, খুলি-বিদারুণ ইত্যাদিও অব্যাহত র'য়েছে। তাই ইবের্স প্যাপিরাস সম্পর্কে মন্তব্য ক'রতে গিয়ে বার্গার্সেন লিখেছেন...."As the inclusion of invocation and charms in the prescriptions would imply medicine was closely allied with religion, as it was to remain for many centuries."[১৩১] এমনকি, খৃষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে লিখিত, ভারতীয় সুপ্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায়ও এরকম মিশ্র উপাদান লক্ষণীয়। শুশ্রুত অধিকতর আধুনিক, বিজ্ঞানমনা, শস্ত্র-চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও, অস্ত্রচিকিৎসাকালে ছুরি-ব্যবহারের

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-আবৃত্তিরও বিধান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ 'ব্রণ-চিকিৎসায় শস্ত্রকর্ম-অধ্যায়ে বিবৃত চিকিৎসা-বিধির উল্লেখ ক'রা যায়। আলোচ্য চিকিৎসা-কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে ভিষগ্‌কে অস্ত্রোপচারের পর নিয়মানুযায়ী ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। তারপর "হিঙ্গুল বর্ণাদি বেদনাঘ্ন ও বচাদি রক্ষোঘ্ন দ্রব্যের ধূপ দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে এবং রক্ষোঘ্ন মন্ত্র দ্বারা রক্ষোগ্রহের কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে।" এজন্য "জলকুম্ভ হইতে জল লইয়া রক্ষোভয় পরিহারার্থ 'কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থাং' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রক্ষাকর্ম করিবে।"১৩২ সুশ্রুত "কৃত্যা ও ব্যাধিবিনাশক" এই মন্ত্রকে "বেদনাত্মক মন্ত্র" ব'লেছেন। অর্থাৎ লোক-মন্ত্রের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক স্বীকার ক'রেননি। কিন্তু ঔষধি-পরিচয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রা আবশ্যক যে, লোক-চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রতে সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর পীরালী পেশাদারী চিকিৎসার উৎপত্তি ও বিকাশের কালে ইরাক, মিশর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশে চিকিৎসা বিষয়ক যেসব পৌরাণিক গল্প রচিত হ'য়েছিল-সেগুলো ছিল, লোক-চিকিৎসক ও লোক-চিকিৎসার বিরোধী। যাঁরা এগুলো রচনা ক'রেন, তাঁরা প্রবীণ গ্রাম্য দক্ষ ওঝা-ফকীর অপেক্ষা দেবতাধিপতি বা দেব-দেবতার এবং প্রচলিত চিকিৎসা উপকরণ অপেক্ষা শাস্ত্র-মন্ত্রাদির মহিমা ঘোষণা ক'রতে ছিলেন বিশেষ উদ্যোগী। তৎসত্ত্বেও এই শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যার মূল অবলম্বন যে লোক-চিকিৎসাই ছিল-তা সুশ্রুত-সংহিতা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

চিকিৎসাবিষয়ক ভারতীয় পৌরাণিক মতে, ব্রহ্মাই আদি ভিষগ্‌। তাঁর নিকট থেকে দেবতারা এবং দেবতাদের নিকট থেকে ঋষিগণ এই শিক্ষা লাভ ক'রেন। ঋষিরা আবার মানুষের উপকারের জন্য তা' জনসমাজে শিক্ষা দেন। তেমনি একজন দেবর্ষি ও রাজর্ষি কাশীরাজ দেবোদাস ছিলেন সুশ্রুতের শিক্ষক। এ গল্প সত্য হ'লে, সুশ্রুত ওষুধ-পরিচয়ের জন্য চিকিৎসাবিদ্যার্থীকে নিশ্চয় ঋষিবাক্য বা 'বেদ-ব্রাহ্মণ-সংহিতা'-অনুসন্ধান ক'রতে ব'লতেন ; গো-রাখাল, ব্যাধ, বনচারী ইত্যাদির নিকট যেতে ব'লতেন না। অথচ ওষুধি পরিচয়ের জন্য সুশ্রুত স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন-"গো-পাল (গো-মহিষাদি পালক), তপস্বী ও ব্যাধ ইহাদের নিকট এবং অন্য যে সকল লোক বনচারী (ম্লেচ্ছাদি), ফলমূলাহারী (বন্যলোক), তাহাদের নিকট ঔষধসমূহের পরিচয় করিয়া লইবে। অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা গাছ-গাছড়া সকল চিনিয়া লইবে।"১৩৩ এ থেকে আয়ুর্বেদীয় দৈব চিকিৎসার উৎপত্তির মতবাদ যে, ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়-তার দিকে কেউ দৃষ্টিপাত ক'রেননি।

বলাবাহুল্য, চরক-সুশ্রুতের ; লোক-চিকিৎসক ও লোক-চিকিৎসার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকার ফলেই, তাঁদের পূর্ববর্তী বেদ-ব্রাহ্মনাদি গ্রন্থে বিবৃত ভেষজ অপেক্ষা, চরক-সংহিতা গ্রন্থে অধিক ভেষজের বিবরণ লাভ ক'রা যায়। অসীমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"আয়ুর্বেদ-এ মাত্র এক শ' বনৌষধির বিবরণ আছে, কিন্তু পরবর্তীকালের সুশ্রুত-সংহিতায় প্রায় সাত শ' গাছের ভেষজ গুণের বর্ণনা লাভ ক'রা যায়।"১৩৪ অতিরিক্ত এই ছ'শ গাছের ভেষজ-বিবরণ যে লোক-চিকিৎসকদের মারফত-ই এসেছে, কোন দৈব বাণীর মারফৎ নয়, তা সুশ্রুতের পূর্বোক্ত নির্দেশ পাঠ ক'রলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সুশ্রুত-সংহিতায় লোক-চিকিৎসার আরও উপাদান বিদ্যমান। অনুসন্ধান ক'লে দেখা যায়, সুশ্রুত চিকিৎসার্থ যে সব লতা-গুল্মের ও গাছ-পালার অবস্থান-স্থানের উল্লেখ ক'রেছেন-তা হ'ল-'দেবসুন্দর হ্রদের তীরভূমি', 'সিন্ধুনদের তটবর্তী অঞ্চল', 'কাশ্মীরের ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্যসরোবর', 'কৌশিকী নদীপারের সঞ্জয়ন্তীর পূর্ব ভাগ', 'মলয় পর্বত, 'জলসেতু', 'অর্বুদগিরি', 'পশ্চিম সাগর তীর' ও হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ।"[১৩৫] আয়ুর্বেদী বনৌষধির এই অঞ্চল-নির্দেশ লোক-চিকিৎসার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই প্রমাণ। সুশ্রুত ঔষধি লাভের এই ভূমি-নির্দেশ-এর যে তিনটি কারণ উল্লেখ ক'রেছেন—তার মধ্যেও লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কারণত্রয় হ'ল—

১. ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঔষধির কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট নামের ভেষজের উল্লেখ।

২. এক-ই ঔষধির সর্বত্র প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং

৩. মৃত্তিকা, শৈত্য ও সূর্যতাপজনিত পরিবেশ-প্রভাবে ঔষধিসমূহের ক্রিয়ার সম্যক বা অসম্যক অবস্থা (ইতর বিশেষ)।

প্রথম কারণ থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঔষধির সঞ্চয় সর্বকালে ও সর্ব স্থানেই ব্যক্তিগত প্রয়োগ ও তার কল্যাণকর ফল-নির্ভর। লোক-চিকিৎসার ঔষধি-সঞ্চয়ও ঘ'টেছে এভাবেই। আর এ বৈশিষ্ট্যই লোক-চিকিৎসাকে গুপ্তবিদ্যা ও গুরুদত্ত বিদ্যায় পরিণত ক'রে। বাস্তবজীবনে আজও তার সাক্ষ্য লাভ ক'রা যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদের সহাবস্থানের বৈষয়িক তাৎপর্য নিহিত। সমস্ত ঔষধি যেমন সর্বত্র সুলভ নয়, তেমনি সমস্ত ঔষধি সর্বত্র এক-ই নামেও পরিচিত নয়। আবার এক-ই ঔষধির ভেষজগণ ও স্থানভেদে ভিন্ন হ'য়ে থাকে। এজন্য এক ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশে যে ঔষধি, কাজ ক'রে, অন্য ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশে-সে ঔষধি সে কাজ নাও ক'রতে পারে। এমন কি, তার বিপরীত কাজও ক'রে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বে'লের উল্লেখ ক'রা যায়। চরকাদি সংহিতায় পাকা বেলকে নিন্দা ক'রা হ'য়েছে এবং তাকে বিষের সঙ্গে তুলনা ক'রা হ'য়েছে। পাকা বেল খেলে হজম হয়না এবং পেটে দুর্গন্ধ বায়ুর সঞ্চার হয়, পক্ষান্তরে কাঁচা বেল উত্তম। তা বায়ু এবং শ্লেষ্মাকে দমন ক'রে। প্রকৃতিগতভাবে কাঁচা বেল স্নিগ্ধ, উষবীয়, অগ্নি-উদ্দীপক এবং রুক্ষ্ম (তীক্ষ্ণ)।"[১৩৬] চরক সংহিতার এই পশ্চিম ভারতীয় অভিমতের সঙ্গে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই। বরং পুরোপুরি বৈপরীত্য বিদ্যমান। আমরা জানি, পাকা বেল-ই বরং হিতকর, কাঁচা বেল এর বিপরীত। পাকা বেল কোষ্ঠ পরিষ্কারক, স্নিগ্ধ, উষবীর্য, অগ্নি উদ্দীপক ও বিরেচক। তাই যেকালে কাঁচা বেল সুলভ, কিন্তু পাকা বেল পাওয়া যায় না—সে সময়ে, কাঁচা বেলের অপকারিতা দূর ক'রে তা ব্যবহার-ক'রার জন্য তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে তবে খেতে হয়। তখন তা পাকা বেলের অনুরূপ গুণ সম্পন্ন এবং হিতকর হয়। অতএব স্থান বা ভৌগলিক অবস্থান ভেদে ঔষধির গুণভেদ এবং চিকিৎসার প্রকৃতিভেদ বাস্তব লৌকিক অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত।

সুশ্রুতে একদিকে যেমন বনচারী, ব্যাধ, ম্লেচ্ছ, তন্ত্রমন্ত্রবিদদের লোক–চিকিৎসার বহু উপাদানকে অন্তর্ভূক্ত ক'রে নেবার প্রমাণ আছে–তেমনি আছে, সামন্তপুরোহিত শ্রেণীর পছন্দনীয় বেদাত্ম মন্ত্রাদি এবং লালসা–উদ্দীপক বা যৌন–উত্তেজক চিকিৎসা–উপাদানের সংকলন–সংযোজন।"[১৩৭]

চরক–সুশ্রুতসহ অন্যান্য আয়ুর্বেদী গ্রন্থ বিশ্লেষণ ক'রলে, তাই একথা কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, এইসব রচনার মধ্যে সত্যিকারভাবে কোথায় লোক–চিকিৎসার শেষ এবং কোথায় উন্নত চিকিৎসার শুরু। বরং ঐ সব রচনা ও চিকিৎসা–পদ্ধতির সচেতন আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা চিরকাল–ই লোক–চিকিৎসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আয়ুর্বেদী ঔষুধের 'অনুপান' ও 'মুষ্টিযোগ' আজও সর্বোতভাবে লোক–চিকিৎসার–ই উপাদান। তবে তা কিঞ্চিৎ উন্নত ও সংস্কৃত।

বস্তুতঃ শুধু আয়ুর্বেদ নয়-গ্রীক, রোমীয়, আরবীয় ইরানীয় ও ইউরোপীয় নানা চিকিৎসা–পদ্ধতিও লোকজ উপাদানে বিপুল ভাবে সমৃদ্ধ। আধুনিক ইউরোপীয় গণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জনক হিসেবে গ্রীক মনীষী হিপোক্রিটাসের (জন্ম ৪৬০ খৃ: পূ:) উল্লেখ ক'রে থাকেন। তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্ববর্তীকাল থেকে অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত গ্রীসে লোক–চিকিৎসার সঙ্গে উন্নত 'পীরালী'–'পেশাদারী' চিকিৎসার সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য। হিপোক্রিটাস নিজেও লোক–চিকিৎসার বহু উপাদান স্বীয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত ক'রেছিলেন। একাজ ক'রেছিলেন তাঁর পরবর্তী চিকিৎসাতত্ত্ববিদরাও। তাই দেখা যায়–হিপোক্রিটাস যেখানে মোট চারশ' ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন ; সেখানে পরবর্তী চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ডায়াস্কোরাইডস বিবৃত ক'রেছেন ছ'শ রকম গাছ–গাছড়ার ভেষজগুণ।"[১৩৮] এগুলোর অধিকাংশই যে লোক-চিকিৎসা সূত্রে তিনি লাভ ক'রেন, তা ধারণা করা অসঙ্গত নয়।

পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরোপের অন্ধকারময় যুগেও লোক–চিকিৎসা ব্যতীত উন্নত কোন চিকিৎসা–পদ্ধতি বর্তমান ছিল না। খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব, চার্চকেন্দ্রিক 'পীরালী' চিকিৎসার কোন বিশেষ কল্যাণকর রূপের বিকাশ ঘটায়নি। ঐ সময়ের ইউরোপীয় চিকিৎসার পরিচয় দিতে গিয়ে বার্গারসেন ব'লেছেন–'পশ্চিম ইউরোপে জার্মান বর্বর গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, পুরানো সভ্যতা ধ্বংস্ হয় এবং সেই সঙ্গে নষ্ট হয় প্রাচীন সংস্কৃতিও। তখন তাদের চিকিৎসা ব'লতে ছিল লোক–চিকিৎসা এবং লোক–ঐতিহ্য, রহস্যময় নিরাময় কলা প্রয়োগ এবং মন্দিরে ঘুম–হিপোক্রিটাস–এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী গ্রীকদের মতই।"[১৩৯]

সপ্তম–অষ্টম শতাব্দীতে আরব–ইরানীয় চিকিৎসা–বিজ্ঞানীরা গ্রীক চিকিৎসা–দর্শনের ওপর ভিত্তি ক'রে, যে ইউনানী চিকিৎসার বিকাশ ঘটান–সেক্ষেত্রেও, লোক–চিকিৎসা ও লোকৌষধ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে। এমনকি দশম শতাব্দীর, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ইব্নে সিনার কানুনেও র'য়েছে। "a miscellaneous collection of past medical lore with his interpretations."[১৪০] দ্বাদশ–ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগরণের প্রাক্কালেও, ইউরোপীয়গণ মধ্য ও উত্তর ইউরোপের লোক–চিকিৎসা ও লোক–

ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আরবীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ ক'রে নতুন চিকিৎসা–রীতি উদ্ভাবনের প্রয়াস পান। নতুন চিকিৎসা–পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টায় ভ্যালোরিয়াস কর্ডাস–এর ফার্মাকোপিয়া এবং প্যারাসিলসাসের চিকিৎসায়ও, লোক–চিকিৎসা ও লোকৌষধের প্রভাব বর্তমান। প্যারাসিলসাস সম্পর্কে বার্গার্সেন লিখেছেন... "He travelled widely gathering a vast amount of knowledge, especially of folk-medicine from, barbers, gypsies and others with whom he associated."[১৪১] উল্লেখযোগ্য যে, বহু লোকৌষধ লোক–চিকিৎসা থেকে বৈজ্ঞানিক পশ্চিমী আধুনিক চিকিৎসায় গৃহীত হ'য়ে উক্ত চিকিৎসাকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। এগুলোর মধ্যে পেরুর লোক–চিকিৎসা থেকে গৃহীত সিঙ্কোনা, কোকো, ইপিকাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে আরবীয়, ভারতীয়, চীন এবং আফ্রিকান লোক–চিকিৎসা থেকেও বহু উপকরণ অন্যভাবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত হ'য়েছে।

বস্তুতঃ সমস্ত প্রধান চিকিৎসা–পদ্ধতির বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান চিকিৎসকদের মত—দক্ষ লোক–চিকিৎসক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম জন্মগ্রহণ ক'রেননি। কিন্তু লোক–চিকিৎসার যেহেতু কোন লিখিত ইতিহাস নেই, সেইজন্য, এ–পদ্ধতির বিশিষ্ট চিকিৎসকদেরও বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সুখের বিষয়, তেমন দু'একটি নাম অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকরাও উল্লেখ না ক'রে পারেননি। ইউরোপীয় লোক–চিকিৎসার ইতিহাসে, এ–ধরণের–ই একটি নাম হেলভেটিয়াস। তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী। বার্গারসেন তাঁকে 'হাতুড়ে' ব'লে উল্লেখ ক'রে লিখেছেন–ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই তাঁর গুপ্ত চিকিৎসাবিদ্যার পারদর্শিতার জন্য তাঁকে চার হাজার ডলার পারিতোষিক দেন।"[১৪২] মধ্যযুগের ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নাপিত শল্য চিকিৎসকদের কৃতিত্ব ও এ–প্রসঙ্গে স্মরণীয়।"[১৪২/ক] এছাড়া সপ্তদশ–অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্কে, গুটি বসন্তের লোক–চিকিৎসার বিস্ময়কর দক্ষতার বিবরণ দিয়েছেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত–এর পত্নী লেডি মেরি ওয়ার্টলি মন্টেগু। ১৭১৭ খৃ: এক পত্রে তিনি লেখেন— "আমাদের এখানে গুটি বসন্ত সাধারণ এবং সাংঘাতিক রোগ, অথচ নিরাপদ। কারণ এখানে এক শ্রেণীর বুড়ী আছে, যারা অস্ত্রোপচারমূলক 'কলমবাঁধার' চিকিৎসা–ব্যবসা ক'রে। এরকম একটা কাজে তারা চার–পাঁচটা শিরা চিরে সুইয়ের মাথায় যতটুকু ধরে, ততটুকু (রোগ) বিষ শিরার মধ্যে দেয়। তার ফলে সামান্য ভাবে লোকটি ঐ রোগে আক্রান্ত হয় ; কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে যায় এবং শরীরে একটা দাগও থাকে না।"[১৪৩] স্মরণীয় যে, ঠিক এই কাজটাই ড: এডোয়ার্ড জেনার স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব প্রজ্ঞার ব'লে আবিষ্কার ক'রেছিলেন ১৭৯৬ খৃস্টাব্দে। ১৭৭৫ খৃ: সম্রাট ষোড়শ লুইও, মহিলা লোক–চিকিৎসক মাদাম নুফারকে ফিতা ক্রিমি অলৌকিকভাবে নিরাময়ের জন্য পরিতোষিক দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার ডলার। তিনি এই গোপন চিকিৎসা শিখেছিলেন তাঁর স্বামীর নিকট থেকে।"[১৪৫] ফুসফুসের 'শোথ' রোগ–জনৈকা ইউরোপীয় গ্রামীণ মহিলা দক্ষতার সঙ্গে আরোগ্য ক'রতেন এমন এক 'মুষ্টিযোগ'–এর সাহায্যে, যার মধ্যে ষোলটি গাছ–গাছড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের দেশেও বিনা অস্ত্রোপচারে সাংঘাতিক রকম 'হাড়ভাঙ্গা' রোগীকে

শুধুমাত্র 'গাছের টোপলা' ধারণ করিয়ে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য ক'রা হয়। লোক-চিকিৎসার এরকম বিস্ময়কর আরোগ্যের আরো নজীর অনুসন্ধান ক'রলে লাভ ক'রা যায়।

বস্তুতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও লোক-চিকিৎসার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও অলিখিত ইতিহাস বিদ্যমান। সে ইতিহাস এদেশের সাহিত্যে, পুথি-কেতাবে, লোক-গাথায়, উপকথায়, প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তী প্রভৃতিতে নিহিত। কিন্তু তা আজও কেউ সম্যকভাবে সংগ্রহ ক'রে বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসার ইতিহাস রচনায় আগ্রহী হ'য়ে ওঠেননি। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টির ওপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আলোকপাত ক'রা হবে।

তথ্য-সংকেত

১. See, O.P. Jaggi, Indian System of Medicine, (Delhi-1973, p. 1-2.

২. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত-সংহিতা, (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ৫। সূত্র ১৬।

৩. দ্রষ্টব্য, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫। সূত্র ১৭।

৪. দ্রষ্টব্য, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাংলাভাষার অভিধান, (কলি. ১৩২৩), পৃ. ৫৫৯।

৫. See, O.P. Jaggi, Ibid, p.4.

৬. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৭. See, .P. Jaggi, Ibid, p.4.

৮. সুশ্রুত-সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪। সূত্র ১৫।

৯. See, Uday Chand Dutta, The Materia Medica of the Hindus, (Revised Edition, Cal. 1922). p.2.3.

১০. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত-সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫। সূত্র ৪৯।

১১. ঐ, পৃ. ৩৬৫। সূত্র ৫০।

১২ দ্রষ্টব্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা-১৯৫৮) পৃ. ৭০।

১৩. দ্রষ্টব্য, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

১৪. উদ্ধৃত সমরেন্দ্রনাথ সেন পূর্বোক্ত পৃ. ৭২।

১৫. O.P. Jaggi, Ibid, p.112.

১৬. দ্রষ্টব্য, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বাঙালী, (কলিকাতা-১৯৭৫), পৃ. ১৯।

১৭. দ্রষ্টব্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

১৮. দ্রষ্টব্য, O.P. Jaggi, Ibid, p.128.

১৯. দ্রষ্টব্য, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২১. See, Uday Chand Dutta, Ibid, p.XIII.

২২ দ্রষ্টব্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

২৩. See, Hakim Mohammad Said, Ours In Trust Only, Hemisphere, (Vol.23. No.4., July-August-1979), p.206.

২৫. See, M.A. Hanifi, A Survey of Muslim Institutions and Gulture, (Lahore, Reprinted, 1969), 194-'98.

২৬. See, dr, Md.Zubayr Siddiqi, Studies in Arabic and Persian Medical Literature, (C.U. 1959), p.7.

২৭. See, Hakim Muhammad Said, Ibid, p.207, Last sentence.

২৮. দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মসরুর ইসলামাবাদী, তিব্বে আরবীর ইতিহাস, আল-হাকিম, (জানুয়ারী ১৯৬৭), পৃ. ১৩।

২৯. দ্রষ্টব্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

৩০. দ্রষ্টব্য, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০-২১।

৩১. দ্রষ্টব্য, B.S. Sergersen, Pharmacology In Nursing (13th Edition, U.S.A. 1976), p.9.

৩২ দ্রষ্টব্য, ঐ পূর্বোক্ত, পৃ ৯।

৩৩. দ্রষ্টব্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

৩৪. O.P. Jaggi, All About Allopathy, Homoeopathy, Ayurvede, Unani & Nature Cure,(Delhi 1976.) p.96.

৩৫. S.M. Said, Ibid, p.210.

৩৬. O.P. Jaggi, AHAUN, Ibid, p.95.

৩৭. O.P. Jaggi, Ibid, p.95,

৩৮. সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

৪০. O.P. Jaggi AHAUN, Ibid, p.96.

৪১. দ্রষ্টব্য, এম. আকবর আলী, ইবনে সিনা, (ঢাকা ২য় সং., ১৯৫২), পৃ. ১২৮।

৪২. উদ্ধৃত, এম. আকবর আলী, ইবনে সিনা, পূর্বোক্ত পৃ. ১২৪-২৫।

৪৩. দ্রষ্টব্য হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম, ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ও এর কার্যকারিতা, স্বাস্থ্য সাময়িকী, (বর্ষ, সংখ্যা ১, জানু. ১৯৮১), পৃ. ১৭।

৪৪. H.M. Said, Ibid, p.210.

৪৫. H.M. Said, Ibid, p.21o-11.

৪৬. H.M. Said, Op. Cit, p.210.

৪৭. H.M. Said, Ibid, p.209.

৪৮. O.P. Git., p.209.

৪৯. সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

৫০. দ্রষ্টব্য, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

৫১. Dr, Md. Zubayr Siddiqi Ibid, p. XXII.

৫২. H.M. Said, Ibid, p.211.

৫৩. See, H.M. Said, Ibid, p.211 and the author's interview.
Published in the same Magazine, p.223. Also
B) Dr. Md, Zubayer Siddiqi, Ibid, p.XV. No.6.

৫৪. Quoted by, Dr. M.Z. Siddiqi, Ibid, p. ZIV, No.1.

৫৫. Ibid, p. XIV, No.2.

৫৬. Quoted by, H.M. Said, Ibid, P.208.

৫৭. H. M. Said, Ibid, p. 210.

৫৮. Dr. M.Z. Siddiqi Ibid, pp. XIV-XXIII.

৫৯. B.S. Bergersen, Ibid, p.22.

৬০. o.p. Jaggi, Ibid, p.97.

৬১. o.p. Jaggi, Indian System of Medicine, (Delhi-1973), p.223.

৬২ o.p. Jaggi, Ibid, p.99.

৬৩. Ibid, p.101.

৬৪. দ্রষ্টব্য, আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদভী, মুসলমান যুগে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা (ঢাকা ১৯৫৮) পৃ. ১৩১।

৬৫. দ্রষ্টব্য, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১ ২৪।

৬৬. ক) B.S. Bergersen, Ibid, p.11.
খ) o.p. Jaggi AHAUN, Ibid, p.11.
গ) অরণ কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

৬৮. See, B.S. Bergersen, Op. cit., p.10.

৬৯. o.p. Jaggi, Ibid, p.14.

৭০. o.p. Jaggi, op. cit., p.22.

৭১. Ibid, p.22.

৭২ o.p. Jaggi, op.cit.,p.26.

৭৩. অজিত কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৭৪. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্যাধির পরাজয়, (কলি ১৩৫৬), পৃ. ১০।

৭৫. B.S. Bergersen, Ibid, p.12.

৭৬. ক) See B.S. Bergersen, Ibid, p. 13-14.
খ) বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যান্টিবায়োটিক, (কলিকাতা ১৯৫৭), পৃ. ৫-১২।

৭৭. Edward Rubenstein, Diseases Caused By Impeired Communication Among Cells, Scientific American, (Vol.242, No.3, March-1980), p.121.

৭৮. Edward Rubenstein, Ibid, p.106.

৭৯. Edward Rubenstein, Ibid, p.102.

৮০. Edward Rubenstein, Ibid, p.101.

৮১. Edward Rubenstein, Ibid, p.121.

৮২ B.S. Bergersen, Ibid, p.97.

৮৩. দ্রষ্টব্য, জনাব হাকিম মুহম্মদ সায়ীদ-এর সাক্ষাৎকার-Mankind does not have one kind of Medicine..., Hemisphere, Ibid, p.223.

৮৪. এ সম্পর্কে হ্যানিম্যানের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, o.p., Jaggi, AHAUN, Ibid, p.43.

৮৫. জি. দীর্ঘাঙ্গী অনূদিত, হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন, (৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলি, ১৩৬২), পৃ. ১৭৪। সূত্র ১২।

৮৬. See, J.H. Clarke, The Prescriber, (London, 9th Edition 1962), p.23. Foot Note.

৮৭. Dr. H. Gross, Comperative Materia Medica (Second Edition, Reprint, Delhi 1977), p.XIX. "Remarks by the Editor".

৮৮. C.H. Hering, Comperative Materia Medica, Ibid, p. XIX.

৮৯. দ্রষ্টব্য, ডা: সতীশচন্দ্র সরকার, হোমিওপ্যাথি মতে ওষধ পরীক্ষা, হ্যানিম্যান, (১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-১৩৪০), পৃ. ৩৪৪।

৯০. See The Pharmaceutist's Manual or Pharmacopocia, (published by M. Bhattacharyya & Co., 10th Edition, Calcuttaa-1944), p.40.

৯১. See, Constantine Hering, The Guiding Symptoms, Vol. 1-10.

৯২ See, F.A. Farrington, M.D. Climical Materia Medica, (4th Edition, Reprint in India, Delhi-1975), p. 17.

৯৩. দ্রষ্টব্য, খগেন্দ্রনাথ বসু-অনূদিত আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ, হ্যানিম্যান, (১৯বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, চৈত্র-১৩৪৩), পৃ. ৫৭৬।

৯৪. দ্রষ্টব্য, সতীশচন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫।

৯৫. Dr, H.G. Jahr, The Homoeopathic Treatment of the Diseasses of Females ans Infants at Breast, (4th Indian Edition, Calcutta-1968), p.VII-VIII.

৯৬. Dr. G.H. G. Jahr, Ibid, p.V, Editor's preface.

৯৭. E.A. Farrington Clinical Materia Medica, (Delhi 1975), হার্ভে ফ্যারিংটন কর্তৃক সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত আমেরিকান চতুর্থ ইংরেজী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ) p. 11. "In Memoriam".

৯৮. E.A. Farrington, Ibid, p. 16. "The Memoriam".

৯৯. দ্রষ্টব্য, ডা: জেমস টেইলর কেন্ট, লেকচারস অন হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা, ইংরেজী চতুর্থ সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৭৫, পৃ. ছ। প্রাককথন।

১০০. দ্রষ্টব্য, বি.কে. সরকার-লিখিত "প্রাক-কথন" , পূর্বোক্ত, পৃ. ছ+জ।

১০১. এ, পৃ. জ।

১০২ দ্রষ্টব্য, জে. টি. কেন্ট পূর্বোক্ত, পৃ. ণ-ত।

১০৩. বি.কে. সরকার পূর্বোক্ত, পৃ. ঞ।

১০৪. ড.সি.ই. হুইলার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭।

১০৫. ডা: সি.ই. হুইলার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭।

১০৬. See Francois Cartier, Therapeutics of the Respiratory Organs (Ist. Indian Edition, Calcutta-1960), p. XIII, Introduction,

১০৭. F. Cartier, op. cit., p.XIX.

১০৮. দ্রষ্টব্য, ডা: সি. ই. হুইলার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬।

১০৯. Harvey Farrington, Homoeopathy and Homoeopathic Prescribing, (U.S.A. 1955), p.5. No.4.

১১০. Cartier, op. cit., p. XVII.

১১১. H. Farrington, pp.cit., p.5.

১১২ দ্রষ্টব্য, Farrington, Ibid, p.8.No25.

১১৩. দ্রষ্টব্য, হরিমোহন চৌধুরী, হোমিওপ্যাথি তথা অর্গাননের বিকাশ, হোমিও সমীক্ষা, (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা–১৯৮০), পৃ. ১০।

১১৪. ঐ, পৃ. ১১–১২।

১১৫. দ্রষ্টব্য, ডা: বোরিক এবং ডিউই, বায়োকেমিক ভৈষজ্য, সুধা, (কলিকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬৮), পৃ. ১।

১১৬. উদ্ধৃত, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

১১৭. See,I.B. Chapman, Dr. Schuessler's Biochemistry, (Indian Edition, New Delhi)., p.12.

১১৮. দ্রষ্টব্য, ডা: ইউ.এম. সামন্ত, বাইওকেমিক চিকিৎসা–বিধান, (দ্বাদশ সংস্করণ, কলিকাতা–১৩৮৬), পৃ. ৬।

১১৯. See, Chapman, Ibid, p.13.

১২০. ক) ডা: ইউ.এম. সামন্ত পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।
খ) সমান্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
গ) ঐ, পৃ. ৯

১২১. o.p. Jaggi, Folk Medicine, (Delhi-1973), p.1.

১২২ Frank, F. Poirier, In Search of Ourselves, (U,S,A, 1974), p.157.

১২৩. Frank E. Poirier, Ibid, p.186.

১২৪. Betty S. Bergersen, Pharmacology in Nursuing, (U.S.A. 13th Ed. 1976), p.6.

১২৫. Kenneth Lemmon, The Golden Age of Plant Hunters, (London 1967), p.2.

১২৬. o.p. Jaggi, AHAUN, Ibid, p. 143-44.

১২৭. দ্রষ্টব্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত–দর্শন, (কলিকাতা–১৩৬৩), পৃ. ৩৭৯–৮০।

১২৮. দেব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭।

১২৯. অজিতকুমার চক্রবর্তী, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী (কলিকাতা–১৯৭৫), পৃ. ৯।

১৩০. See, Sergersen, Ibid, p.7.

১৩১. Bergersen, Ibid, p.7.

১৩২. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত-সংহিতা, (নামপত্র ছিন্ন), পূর্বোক্ত পৃ. ২০।

১৩৩. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত–সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

১৩৪. অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ভারতের বনৌষধি, (বিশ্বভারতী ১৩৫৩), পৃ. ৬।

১৩৫. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত–সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬০–৬১।

১৩৬. দ্রষ্টব্য, শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধি–১ম খণ্ড, (কলিকাতা–৩২ মুদ্রণ–১৩৮৪), পৃ. ১০৮।

১৩৭. উদাহরণস্বরূপ সুশ্রুত–সংহিতার উত্তরতন্ত্রে' বিবৃত কফ–বাতজনিত জীর্ণজ্বরে শীতার্ত রোগীকে তাপদানের যে বিধি নির্দেশ ক'রেছেন তা দ্রষ্টব্য। সুশ্রুত–সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮১।

১৩৮. দ্রষ্টব্য, Bergersen, Ibid, p.8.

১৩৯. ঐ, পৃ. ৮।

১৪০. ঐ. পৃ. ৯।

১৪১. ঐ, পৃ. ১০।

১৪২. ঐ, পৃ. ১১। ১৪২. ক. দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ মোর্তজা, অনূদিত, চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী, (ঢাকা–১৯৬৮), পৃ. ২০০।

১৪৩. See. Margaret Bainbridge, Turkish Folk Medicine, Hemisphere, Vol.23.,No.4, (July/August-1979), p.239.

১৪৪. Bergersen, Ibid, p.11.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসা ও লোক-চিকিৎসক

ক) বাংলাদেশে লোক-চিকিৎসার ঐতিহ্য

বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসার প্রাচীন ইতিহাস আজও অনালোকিত ও অনালোচিত। ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, এদেশে জনবসতির অতি আদিম পর্যায় থেকেই বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসার ইতিহাস আরম্ভ। পৃথিবীর সমস্ত আদিম জাতির মানুষের মধ্যে যেমন ভাবে লোক-চিকিৎসার উদ্ভব হয় এদেশের মানুষের মধ্যেও তেমনি ভাবেই লোক-চিকিৎসার উৎপত্তি ঘটে। ভারতীয় আয়ুর্বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও পুরানাদিতে উল্লিখিত অনেক গাছ-গাছালি ও লতাপাতা বাংলা দেশে পাওয়া যায়। ঐ সব ঔষধি যে কত প্রাচীন কাল থেকে 'ওষুধ' হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে-তা কেউ ব'লতে পারেনা। একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্ত নিজস্ব রচনায় এবং চরক-সংহিতার সংস্কৃত টীকায় বহু ঔষধির বাংলা নাম উল্লেখ ক'রেছেন। যেমন তিন্দুক বা গাব গাছ। এটির উল্লেখ চরক-সংহিতার সূত্র স্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুত সংহিতার সূত্র স্থানের ২৩-তম অধ্যায়ে বিদ্যমান। চক্রপাণি পূর্বোক্ত টীকায় তিন্দুকের পরিচয় দিয়েছেন কেঁদ বা কেন্দু ব'লে। আর সুশ্রুত-সংহিতার টীকায় ডল্বন তিন্দুককে 'টিম্বরুয়নি' ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। এটি মারাঠী শব্দ। তাই শিবকালী ভট্টচার্য ব'লেছেন—"নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, চক্রপাণি বাংলার পরিভাষাই গ্রহণ ক'রেছেন আর উল্বন মহারাষ্ট্রের।"[১] কেঁদ বা কেন্দু গাছের উল্লেখ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং রামাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্মপূজা বিধানে'ও পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে দেশীয় ভেষজসহ নানাবিধ গাছ-পালার বহুতর উল্লেখ বিদ্যমান। চর্যাপদে কমল, মৃর্ণাল, কঙ্গুচিনা, তেঁতুল, ধান, কাপাস ইত্যাদির বিবরণ থাকলেও সেগুলোর কোনটিরই ভেষজরূপে ব্যবহার-এর কোন উল্লেখ নেই। হয়তো সে প্রসঙ্গ চর্যাপদে অবাঞ্ছিত ছিল ব'লেই কবিরা তৎকালীন লোকৌষধের কোন সংবাদ একালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রেখে যাননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের 'দানখণ্ডে' 'বৈদ্যবাড়ী'র উল্লেখ আছে। রাধা-কৃষ্ণের কথোপ-কথনের মধ্যেই প্রসঙ্গটি প্রতিফলিত হ'য়েছে। এই খণ্ডে রাধার সহানুভূতি লাভের জন্য কৃষ্ণ কৈফিয়ৎ স্বরূপ ব'লেছেন—

"তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল।
তেকারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ বল॥"

একথা শুনে রাধার পরামর্শ দান—

"পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ্ বেজঘর।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী বর॥"[২]

উদ্ধৃতাংশে নিহিত 'বেজঘর' অর্থ বৈদ্যবাড়ী। সেকালে যে, চিকিৎসা বংশানুক্রমিক ছিল- তার স্পষ্ট নজীর এখানে বিদ্যমান।

'দানখণ্ডে'র-ই অপর একটি গানে 'গারুড়ী' বা 'বিষবৈদ্যে'র কথাও ব'লেছেন কবি। উক্ত গানে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথন রাধার উক্তি—

"আহ্মার যৌবনে কালে ভূজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁমরী"॥৬॥

জবাবে কৃষ্ণের উক্তি—

"তোহ্মার যৌবন কাল ভূজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুরী॥ ৭॥"[৩]

'গারুড়ী' বা 'বিষবৈদ্য' তথা 'সাপের ওঝা' যে, এদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই চিকিৎসা চালিয়ে আসছে-এথেকে তার প্রমাণ লাভ করা যায়। চতুর্দশ শতকের এই প্রাচীন বাংলা কাব্যে, বাংলা দেশের গাছ-গাছালি, ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদির এক হৃদয়গ্রাহী বিবরণ নিম্নোক্ত কবিতাটিতে বিদ্যমান। যথা,—

ফুটিল গুলাল মাহলী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ ছোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যুথী সুখী কনক কেতকী
পারলী দুলালী॥১॥
আসুই আসাঢ়িআ ভুমি চম্পক চম্পক
গন্ধ টগর বন মালী।
নাগেশর কেশর আর তিনিশ শিরিষ
বহুল মহুল সে আলী॥
সিঅলি কুসম্ভওড় রেবতী রাঙ্গ নাগর
ধাতকী আমলিঅ করবীরে।
অশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্জী
কাঞ্চল বন্ধুলী মন্দারে॥ ২॥
কুজা কুটজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ
ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে॥
রবি লোধ ছাতীন ভাণ্টি দুধি আকন
কসাল পিআল ডগরে॥
মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল
কালকাসুন্দা আসনে।

ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব
জামবু জাম্বীর জামবুড়া।
চেরু বেরু সফেরু জালপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তলি সাতকড়া॥
আঁওলা কমলা পাণি- আল লবণী বদরী
বোহারী করুঞ্জক বণে।
আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু কুড়ুম চালনি আঁব
হিঞ্চী পিআল টাভাগণে॥ ৪॥
গুআ নারিকেল কণ্ঠোআল তাল
কদলক পিস্ত খাজুর শ্রীফল।
খিরি খাজুর কনকেন্দু মহুকুত আর
যত তরু মিষ্ট ফলে॥
সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন
অগথ কপিথ সুন্দরী।
খাদির পিগুার বর দেবদারু আগ
নবঘর সুগন্ধে সরী॥ ৫॥
মন্থল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল
চামঅলী সুকল লোচনে।
তেজপাতা ভোজপাত চাম্পাতী চাকলি
আতড় ডিজ্জিআ পত বণে॥
পাকড়ী নাকড়ী বন সোনাকড়ি
সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।
কাঠ লাড়িকা সাজে কড়ায়ি আড়য়িরাজে
আর্জ্জুন গর্জ্জন হরিড়া॥ ৬॥
আকোরল জিঙ্গালরু *দ্রাক্ষা* সুদর্শন
মাহাসুন্ধী বাজবারণে।
জয়ন্তী বিষকরুঞ্জ তমাল হেন্তালপুঞ্জ
পদ্ম কাষ্ঠ আর ছাত্রিঁয়ণে।
লতা আম্ব কুশিআর পাকিল *দ্রাক্ষা* আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।
খুরসুজা কাকড়ী বাঙ্গী আমৃত কাকড়ী
পেঁগুটী সাডর সোআশে॥ ৭॥[৩৪] ইত্যাদি।

এ বর্ণনার মধ্যে যে সব গাছ-পালার পরিচয় লাভ করা যায়-সেগুলো যথাক্রমে বাবুই তুলসী (গুলাল), মল্লিকা (মাহলী), মালতী, মাধবী, লবঙ্গলতা, বাতাবী লেবু, (ছোলঙ্গ), নব

মল্লিকা (নেআলী), আপেল (শেবতী?), কনক যুঁই, সেঁউতি জাতীয় ফুল-গাছ (সুখী), কনক কেতকী, পারুল, দুলী চাঁপা (দুলালী), ভুঁই চাঁপা, চাঁপা, গন্ধ (রাজ), টগর, বন মল্লিকা (বন মাহলী), নাগ কেশর, কেশর (পুন্নাগ), তিনিশ (?), শিরীষ, ববুল, মহুয়া (মহুল), শিউলী, বৈঁচী, কুসুম (ফুল), জবা (ওড়), হাতীশুড়ো (বেরুতী), রঙ্গণ, ধাই ফুল (ধাতকী), আমলকী (আমুলিঅ), কবরী, অশোক, পলাশ (কিংশুক), তিল (চুআঁ), চিতা, খঞ্জী (?), লতা, কাঞ্চন, বাঁধুলি ফুল, মাঁদার, কুজা, কুড়চী, কদম, বাসক, গাব, কুন্দ ধুতুরা, মথুর (?), নিসিনদা (সিন্ধুবার), রক্ত-আকন্দ (রবি), লোধ্রা, ছাতিম, ভাট (ঘেটু), ভৃঙ্গরাজ (মধুকর), বেড়েলা, সোনালু, কালকাসুন্দা, পিয়া, শাল, ছোলম, কমলা, কামরাঙ্গা, আম, লেবু, ডালিম, জাম, জাম্বীর (?), বদরী, পেয়ারা, জলপাই, জলপাই, থেকল (?), চালিতা, তেঁতুল, যাতকড়া (কমলাজাতীয়), আমরুল, পানিফল, নোযাড়ী (লরলী), বোহারী, করমচা, ডালিম, ডাইয়ো, চাল কুমড়ো, হ্যাঁচা, হিঞ্চে, পিয়াল, টাভাগুয়া (?), নারিকেল, কাঁঠাল, তাল, কলা, পিণ্ডখাজুর (?) খিরিখাজুর, বেল বনকেন্দু, বহুকুত (?), শ্বেতচন্দন, রক্ত-বন্দন, বকফুল,, কপিত্থ, সুন্দরী, খয়ের, পিণ্ডার (?), বট দেবদারু, আগুরু, নবধা গন্ধেশ্বরী, কাসিমল (কাসমর্দ্দ), সরল (?) ভল্লাতক, ভিলোল (লোধ্র), চামেলী, ক্ষীর কাকোলী, লোচনী, বন হরিতকী, আখরোট, জিগা, দ্রাক্ষা, সুদর্শন (?), মহাসুন্ধী (?), চড়কমণী, জয়ন্তী, বিষকরুন্তী, তমাল, হেঁতাল, পদ্মকাঠ, কুশিআর, লতা, জাম, খরমুজ, কাকুড়, বাঙি, পটল (পাহুটি), শসা প্রভৃতি। কবি বর্ণনা-মধ্যে কোন কোন গাছের একাধিক উল্লেখ ক'রেছেন। কোন কোন বিদেশী গাছেরও নামোল্লেখ ক'রেছেন। তিনি একবিতায় যেসব গাছ-গাছালীর বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলো চিকিৎসার জন্য ব্যবহার ক'রা হত কিনা-ব'লেননি। তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত তালিকার মধ্যে বহু গাছ-পালার নাম র'য়েছে-যেগুলো লোক-চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদী-ইউনানী-চিকিৎসায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

আদি-মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের নানা বৃক্ষলতা, ফল-ফুল ইত্যাদির উল্লেখ রামাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্মপূজা বিধানে'ও বিদ্যমান। এ গ্রন্থের "গৃহভরণমরূপ ধর্ম্মপূজাবিধানম' অধ্যায়ে পঞ্চদেবতার পূজায় প্রদেয় দ্রব্যাদির মধ্যে পঞ্চশস্য বা পঞ্চধাতু, পঞ্চফল, পঞ্চপল্লব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলো যথাক্রমে-সোনা, রূপা, তামা, পিতল, লৌহ এবং 'হরিতকী, গুবাক, জাতিফল, এলাচ, লবঙ্গ, আর 'ন্যাগ্রোধ, উডুম্বর, জম্বু, চম্পক ও পর্কটি।'[৩৫] কথিত ফল ও গাছ ছাড়াও কদলী, রক্তপুষ্প, কুমুদ, মল্লিকা, শ্বেত করবী, ডালিম, লোহিত পুষ্প, জবা, অর্ক, বিল্ব, তুলসী ও পদ্মের উল্লেখ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করা হ'য়েছে। কবি দেবতাদের প্রিয়-অপ্রিয় ভেদে অপরাজিতা, চম্মা, ভোঁচা, তিল, জগডুমুর, কুন্দ, কলা এবং নানা রকম ধানেরও উল্লেখ ক'রেছেন। রামাই পণ্ডিতের মনোনীত মুণি ও ঋষিদের জন্য নির্দিষ্ট পুষ্প হল-শ্বেতপদ্ম (নারদ), নারিকেল, রক্তপদ্ম এবং গুবাক (কোঙর ঋষি)। এমনিভাবে বট, পলাশ, মালতী, ধুতুরা, হরিতকী, নাগেশ্বর, জাতী, লোহিত করুণা, বাসক, বকুল, বাঘ সাটা, আম, বালা ফুল, পারুল, বৃহস্পতি, বকুল, শ্বেতজবা, চাঁপা কলা, সরিষা, সেপতিপুষ্প, মেঘড়া ফল, খেজুর, রক্তোৎপল, ধাত্রীফল, পান,

জামপাতা, শাদা মসূর, জবা, তাল, কুড়চী, ফুটি, বাংলা ফল, শিউলি, চন্দন প্রভৃতি ফুল-ফল, গাছ ও লতাপাতার বিবরণ "ধর্মপূজা বিধানে" বর্তমান।

আলোচ্য গ্রন্থের 'পুষ্পপাবন' অংশটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এজন্য ঐ অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"কুন্দ নিউলি তুলে মল্লিকা কহ্লার।
পুষ্প তুলেন শিব ভাবি নিরাকার॥
সেপতি মালতি তুলে কণুর কাঞ্চন।
বাক্‌সনা ফুল তুলে আর জে রাঙ্গন॥
অখণ্ড তুলসী দুর্ব্বা চাম্পা নাগেশ্বর।
সুগন্ধি মরুয়া ভোঁচা ওড় টগর॥
শ্যামলতা পুষ্প তুলে আর সর্ব্বজয়া।
রামনখি পুষ্প তুলে বড় দুঃখ পায়্যা।
আঁউচ আগর্‌্যা তুলে করি নানা ছন্দ॥
কুড়চি পুষ্প তুলে মনেতে আনন্দ॥
সুন্ধি সালুক তুলে আর জে কম্বল পারুল
কেয়া কেতকী তুলে আর কালা ফুল॥
অপরা পুষ্প তুলে মনের পিরিত।
কেশ পলাশ তুলে মনে হরসিত॥
শ্রী ফল পুষ্প তুলে আর জে ধুতুরা।
পদ্ম তুলিয়া শিব করিলেন সারা॥
বারফুলে সাজাইল নবরঙ্গ ঝারা॥"[৬]

শিব কর্তৃক পুষ্পচয়নের এই অংশসহ কিঞ্চিৎ বর্ধিত বিবরণ এ গ্রন্থের শেষভাগেও বিদ্যমান। উক্ত বর্ধিত অংশ নিম্নরূপ—

"আদ্যের পুষ্পগাছি নাহি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন দিলেন পদ্মহাত॥
সহস্র বাখড়ি পদ্ম হইল্যা সতদল।
আপনি রহিল্যা প্রভু কমল ভিতর॥
কমলের সন্ধিয়াছে চৌদিগে ঝারা।
হেন পুষ্প ফুটিল প্রভুর অপস্তিপ হরা॥
আছিলা ব্রাহ্মণ মহাদেব হইলেন মালি।
পুষ্প তুলিতে গেলেন কৈলাস
মালঞ্চের বাড়ি॥
সনার আঁকুড়ি লিল রূপার লিল সাজি।
বাছিয়া তুলেন পুষ্প জত সব আদি॥

তুলিতে লাগিলা পুষ্প বোকুল রঞ্জিত।
কেশ পলাশ তুলে হয়্যা হরশিত॥
কুন্দ লিঅলি মল্লিকা আঙলা দুলাল রাঙ্গন।
বসন্ত দনার পারুল কাঞ্চন॥
অশক কিংশক ঝিঁটি কিয়া কবিদার।
বাসকনা কোকনদ ভৈরব কল্হার॥
ভূঞিচাঁম্পা হলকশি তমাল সপ্তলা॥
কুষদ কুমুদ তিলা কুটজ্জ পাটলা॥
আউচ সিফল কালা পূর্ণ অজ্জগর।
সেতরক্ত করবীর ছুআ নাগেশ্বর॥
লবঙ্গ মাধবি লতা রক্ত সতদল।
মকরা বাসুকি জয়া কঞ্চজ্ঞ যুগল॥
লোহিত মল্লিকা দনার শাল লিল্ ঝিটি।
তেদতিলা আতইচ কদম্ব দুবটি॥
সমলা অপরাজিতা সিয়লি আতশি।
বাউলি মল্লার আর ধুত্তুরার রাশি॥
সতদল করবির কনল কেতকি।
সূর্য্যমনি শনা সদা রবিবির্ব্বিহর্ত্তকি॥
অপামাগ্র জটা চন্দ্রামল্লিকা সোভন।
সেবতি মালতি জুঞি কোনোর কাঞ্চন॥
অখণ্ড তুলসী দুর্ব্বা চাম্পা নাগেশ্বর।
সুগন্ধি মরুয়া ভোঁচা যোড় টগর॥
পুষ্প তুলে মহাদেব করিলেন সারা।
সত ফুলে সাজাইল নবরঙ্গ ঝারা॥
ইয়ের মর্দ্ধে কন ফুল শার।
বার ফুল বাছিয়া করিল সার।"[৭]

অতঃপর উক্ত বারোটি ফুল থেকে কি কি উৎপন্নহয়, তার ধর্ম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার পর, বারো ফুল থেকে—বারো দুর্বা, বারো গুবাক, বারো তুণ্ডুল, বারো "উত্তরী" (?), বারো ভক্তা (?) ইত্যাদির উৎপত্তির কথা বলা হ'য়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে আরও আছে অশোক, পলাশ, মহুল, এবং সূর্যের রথ সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'ষোল ফুলে'র উল্লেখ। কবির ভাষায় 'ষোল ফুলে'র বিবরণ—

"কেয়া কেতকী পালিধা মান্দার।
অশোক কিংশোক চাপা নাগেশ্বর আর॥
ওড় টগর আর কনুর কাঞ্চন পুষ্প পারিজাত।

অখণ্ড দুর্বা কালা তুলসীর পাত॥
শ্বেত উৎপল পুষ্প পুরাণে বাখানি।
হেন রথ সাজিয়া দিল অরুণ সাহিনী॥"[৮]

এ গ্রন্থের অপর এক স্থানে আছে চৌদ্দ ফুলের উল্লেখ। সেগুলো যথাক্রমে-"জম্বু, আম্বু, ঝটং, ঝিটিং, দুর্বা, তুলসী, ভৃঙ্গরাজ, জল, ফল, কলা, শ্রীফল, সীত, পীত, লোহিত, নীল, পাণ্ডর"। অথবা-"ধান্য, দুর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, রক্তোৎপল, ওকড়া, ধুতুরা, বালা, গোশিখা, ভৃঙ্গরাজ, বৃহতী, শিখণ্ডী, জম্বুপত্র (ও) কার্পাস পুষ্প।"[৯] আলোচ্য রচনায় চন্দন, শ্রীফল ও ধান্যের উৎপত্তির কাহিনীও ব্যক্ত করা হ'য়েছে।

গ্রন্থটিতে যে সব ফুল, ফল ও বৃক্ষ-লতার বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে, সেগুলোর কোন লৌকিক ভেষজ-প্রয়োগের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই যে এদেশীয় লোক-চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদী-হেকিমী চিকিৎসায় সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে-তা স্বীকার্য।

লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত সুপ্রসিদ্ধ হেঁতাল গাছের উল্লেখ আছে 'মনসা মঙ্গল'-এ। চাঁদ সদাগর বাধ্য হ'য়ে যখন মনসাকে পূজো দিতে এগিয়েছে-তখনও তার একহাতে পূজার সামগ্রী অন্য হাতে হেঁতালের লাঠি। তা দেখে ভীত মনসার উক্তি—

"আমাকে যদি পূজা দিবে চাঁদ বেনে।
হেঁতালের বাড়ী গাছি আগে ফেল টেনে।"

কারণ হেঁতাল গাছের নিকট সাপ থাকে না; ঐ গাছ মনসার নিকট ভীতিপ্রদ।

সে-যুগের আরও অনেক রচনায় লোক-চিকিৎসায় ব্যবহার্য গাছ-গাছালি, ফুল-ফল ও লতা-পাতার নামোল্লেখ বিদ্যমান। এমনকি 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ব বঙ্গ গীতিকা'য়ও নানা রকম গাছ-গাছড়ার বিবরণ লক্ষণীয়। সে সবের মধ্যে ধুতুরা, পদ্ম, রক্তজবা, পান, সুপুরী, মহুয়া, সজনে, দুর্বা, হিজল, তেলাকুচা, অপরাজিতা, মল্লিকা, মালতী, চম্পা, চন্দন, আম, জাম, নিম, বেত, কলা, গাছ, নারিকেল গাছ, হলুদ, ডালিম, শ্যাওলা, স্যাওড়া, লেবু মানকচু, শালি ধান, ইক্ষু, কদম, কমল, গন্ধরাজ, বকুল, নলখাগড়া, বেল, কাঁঠাল, মরিচ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনা বা উপমা স্বরূপ এসব গাছ-পালা, ফুল-ফল প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হ'য়েছে। তবে ঔষধি হিসেবেও এই লোক-রচনা সমূহে ঐসব বৃক্ষাদি, ফুল-ফলের কোন-কোনটির বর্ণনা প্রদত্ত হ'য়েছে। কোথাও কোথাও এইসব ঔষধি উত্তোলনের সময়, বার, তিথি এবং ব্যবহারবিধিরও বিবৃতি বিদ্যমান। উদাহরণত সুবিখ্যাত 'মহুয়া'-গীতিকার গভীর অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর উক্তি স্মরণীয়। সন্ন্যাসী মহুয়াকে ঔষধি উত্তোলনের সময় সম্পর্কে সচেতন ক'রে ঘুম থেকে উঠবার জন্য ব'লেছে—

"উভ উঠ কন্যা আরে কত নিদ্রা যাও।
পরাণে বাঁচাইলে পতি আমার কথা লও॥

আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে।
ঔষধ তুলতে কন্যা চল গহীন বনে।"[১০]

"সন্ন্যাসী" যে 'সাধারণ সন্ন্যাসী' নন, একজন দক্ষ চিকিৎসকও, সেকথাও কবি পূর্বেই জানিয়েছেন। তিনি প্রথম সাক্ষাৎকালেই মৃতপ্রায় ন'দের চাঁদকে দেখিয়ে মহুয়াকে সান্ত্বনা দিতে এবং তার প্রসন্নতা লাভ ক'রতে ব'লেছিলেন—

"বনে আছে গাছের পাতা তুইল্লা দিবাম আমি।
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী॥
দারুণ আকাল্যা জ্বর হাড়ে লাগ্যা আছে।
পরানে বাঁচিয়া আছে মইরা না সে গেছে॥
শ্বাসেতে ধরিয়া পাতা আন নদীর পানি।
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরাণি।"[১১]

এই 'ওষধি' আর 'মন্ত্রই লোক-চিকিৎসার বিশেষ উপকরণ। অতএব সন্ন্যাসী যে দক্ষ লোক-চিকিৎসক-তা স্বীকার্য।

মলুয়া-গীতিকায়ও এরূপ লোক-চিকিৎসার নিদর্শন লাভ করা যায়। স্মরণীয় যে, মলুয়ার স্বামী বিনোদ কোড়া শিকার ক'রতে গিয়ে সর্পদষ্ট হ'য়ে মৃত্যুবরণ ক'রে। খবর শুনে মলুয়া পাঁচ ভাইকে সাথে নিয়ে নৌকা যোগে মৃত স্বামীকে গারুড়ী ওঝার বাড়ীতে নিয়ে যায়। কবির ভাষায় সে যাত্রার ছবি—

"পাঁচ ভাইয়ে পাঁচ দাঁড় নায়েতে উঠিল।
মরা স্বামী কোলে লইয়া মলুয়া বসিল॥
গারড়ী ওঝার বাড়ী সাত দিনের আড়ি।
এক দিনে গেল মলুয়া গাড়রার বাড়ী॥"

তারপর চিকিৎসা—"নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাবা দিল।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল।
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়েতে নামাইল
কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল।
পাতালেতে কাল নাগ চুমকে লইল।
যখনে নাগিনী বিষ চুমকে লইল
বিষজ্বালা গেল বিনোদ আখি মেইল্যা চাইল।"[১২]

সর্প-বিষ চিকিৎসার প্রসঙ্গ 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'দস্যু কেনারামের পালাতে'ও বিদ্যমান। এ পালার 'বিষহরির কেচ্ছা'য় পদ্মাকে বলা হ'য়েছে—"অস্টকোটি নাগের জননী।"[১৩] লোক-চিকিৎসকদের মতে এই আট কোটি নাগের দংশন-চিকিৎসায় ৬৪ পটি মন্ত্র আছে। এসব মন্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকেই 'গারুড়ী ওঝা' ব'লে। এদেরকে 'ধন্বন্তরী ওঝা'ও বলা হ'য়েছে।[১৪]

সাপের উৎপাৎ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্পগন্ধা-ঔষধির বাগান রচনার বিবরণও পালাটিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"ওষধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয়া।
সীমে না আসিতে পারে সাপ বাঙ্গড়িয়া।"[১৫]

শোনা যায়, ছোট চিতার গাছ, কামীনী ফুলের গাছ, মহাসমুদ্রের গাছ, সর্পগন্ধ বা ছোট চান্দার গাছ প্রভৃতি যেখানে থাকে, সেখানে সাপ কখনও থাকে না। এসব গাছ রোপণ ক'রে সর্প-বিঘ্ন ঔষধির বাগান রচনা সম্ভব।

শুধু গাছ-গাছালি নয়, 'ধুলা পড়া' দিয়েও সাপকে নিষ্ক্রিয় করার কথা 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় 'কঙ্ক ও লীলা'পালায় বর্তমান ; কঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে ব্রাহ্মণগণ এই মিথ্যা কথাটি রটায় যে, কঙ্ক শুধু চণ্ডালিপুত্র নয়, সে মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষিত। এ রটনা ক'রে তারা-"সাপের চোখেতে যেন ধুলা পড়া দিল।"[১৬]

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'কমলা' পালায় এক কুটনী মন্ত্রজ্ঞা গোয়ালিনীরও পরিচয় আছে। তার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় দিতে গিয়ে কবির উক্তি—

"শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে।
ঘরতনে কুলের বধু বাইরে টাইনা আনে॥
তেল পড়া দেয় যদি চিকণ গোয়ালিনী।
সুয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী॥
আর একটা ওষুধ শুনি আছে তার কাছে।
গিরিনিধির কানে আর কালপনা মাছে॥
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পরিমাণ বড়ী ক'রে রৌদ্রে শুকাইয়া॥
এক এক বড়ীর দাম পাচ থুরি কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যতনারী॥
বাসী জলে বড়ি খায় উঠিয়া বিয়ানে।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে"।"[১৭]

উল্লেখযোগ্য যে, বশীকরণ-কার্যে পান পড়া তেলপড়া, ধূলি পড়া, পৃথিনীর কান, কালো মাছ (?), পেঁচার মাংস, কাকের জিহ্বা ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ কোন কোন তন্ত্র-গ্রন্থেও বিদ্যমান।

সর্বশেষে, 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র 'কাজলরেখা' উপাখ্যানের সূঁচ রাজার চক্ষু-চিকিৎসার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। কাজল রেখা-মন্দিরের মধ্যে মৃত, অসংখ্য সূঁচবিদ্ধ এক কুমারকে পিতার আদেশ-এ পতিত্বে বরণ ক'রে। কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে উপস্থিত হয়-ঐ মন্দিরবাসী সন্ন্যাসী। কাজলরেখা তার পায়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কেঁদে, সন্ন্যাসীর করুণা লাভের প্রয়াস পায়। সন্ন্যাসী কাজল রেখাকে সান্ত্বনা দিতে কুমারের পরিচয় ও তার

চিকিৎসার কথা জানাতে বলল–"তোমার কোন চিন্তা নাই। এই যে মরা কুমার, সে একজন রাজার পুত্র। আমিই তারে এই বনের মধ্যে আইন্যা রাখছি। এর গায়ের সূইচ কাঁটাগুলি তুমি এক–একটা কইরা খুলতে থাক। কেবল দুই চক্ষের যে দুইটি সূচ খুলিয়া এই যে গাছের পাতা দিলাম তার রস চক্ষে দিও, তা অইলেই সে আবার বাইচ্যা উঠবে।"[১৮] সন্ন্যাসীর এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট যে, সে নিজেই ঐসব সূঁচ ফুটিয়ে রাজকুমারকে মৃতপ্রায় ক'রে রেখেছে। আর ঐসব সূঁচ উঠিয়ে ফেলে একটি গাছের পাতার রস চোখে দিলেই সে বেঁচে ওঠে। আরও বোঝা যায়, এক্ষেত্রে চোখে ফোটানো সূঁচ দুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ পাতার রস চোখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলী সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। শরীরে জীবন–সঞ্চার হয়। এর সঙ্গে চীনা আকুপাংকচারের সম্পর্ক আছে কিনা–তা নির্ণয় করা আবশ্যক। কেননা, ময়মনসিংহ গীতিকার ঐ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুপ্রাচীন চীনা আকুপংকচারের কোন সম্পর্ক থাকা একেবারেই অসম্ভব নয়। যাহোক, লোক–চিকিৎসার ঐতিহ্য শুধু মধ্যযুগীয় সাহিত্য কিংবা 'ময়মনসিংহ গীতিকায় নয়, লোক–কথায়, লোক–গাঁথায়, বইয়ে এবং দোয়া–তাবিজের কেতাবেও বিদ্যমান।

লোক–গাঁথায় এই ধরণের চিকিৎসা ও চিকিৎসকের উদাহরণ দিতে, ড: আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক–সাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, নিম্নোক্ত রচনায় উল্লেখ করা যায়। যথা,—

"বৈদ্য চলিল—চলিল অষ্ট সিদ্ধিদাতা।
আড় লইল, পাঁচন লইল, (কত) মূল ছাল লতা॥
বৈদ্য চলিল—চলিল নামে ধন্বন্তরী।
বোচকার মধ্যে পাগাল লোহার যন্ত্র লইছে ভরি'॥
দৌড়ে দৌড়ে সাগরিত চলে নাম 'আইন্দা–গাইন্দা'॥
কোচার মধ্যে আশি রোগের বড়ি লইছে বাইন্ধা
বৈদ্য ব'লে আইন্দারে তুই লম্ফে লম্ফে চল।
কালন্ত বিলম্বে রোগীর নাড়ী না হয় তল॥"[১৯]

শেষোক্ত উল্লেখ থেকে 'বৈদ্যের বা লোক–চিকিৎসকের দক্ষতার পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি 'মরণোন্মুখ রোগী'কেও নিরাময় ক'রতে সমর্থ। বৈদ্য, প্রাণ থাকতে রোগীর শযাপার্শ্বে উপনীত হ'তে পারলে সে রোগীর আর ভয় নেই। শুধু মুমূর্ষু কেন, ক্ষেত্রবিশেষে 'মৃতরোগী' জীবিত করার ঘটনাও মাঝে মধ্যে খবর–এর কাগজে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ড: সিদ্দিকী এরকম একটি 'সাপে কাটা মৃত রোগীর চিকিৎসা–বিবরণ', তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন।[২০]

মোটের ওপর, বাংলাদেশের লোক–চিকিৎসার ইতিহাস কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এই চিকিৎসা এদেশের শুধু প্রাচীন সাহিত্যে এবং লোক–সাহিত্যে নয়–আধুনিক সাহিত্যেও যে প্রভাব ফেলেছে–তার অনেক নজরি আছে।

খ) লোক-চিকিৎসা

লোক–চিকিৎসার সঠিক বৃত্তটিকে উপলব্ধির জন্য লোক–চিকিৎসক কে বা কারা সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। লোক–চিকিৎসক বলতে আদিতে কোন বিশেষ

পেশাজীবী শ্রেণী ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সমাজ-বিকাশের অগ্রগতির ধারায় বিভিন্ন পেশায় মানুষের সামাজিক শ্রমবিভাগ বিন্যস্ত হওয়ায় লোক-চিকিৎসাও ক্রমে ক্রমে কারো কারো পেশায় পরিণত হয়। তাই আজও দেখা যায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লোক-চিকিৎসা জানেন। কেউ এক-আধটা রোগের চিকিৎসা জানেন, কেউ বা অনেক রোগের চিকিৎসা জানেন। পল্লীগ্রামে সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা মহিলারাই লোক-চিকিৎসার আদিম রূপটি আজও বিশেষভাবে আঁকড়ে আছেন। যে পরিবারের বর্ষিয়সী মহিলা একাজে বহুদর্শী বা অভিজ্ঞা, তাঁর পরামর্শ সকলে গ্রহণ ক'রেন। সেই পাড়ার এমন কি পার্শ্ববর্তী পাড়ার মেয়েরাও বিপদ-আপদে তাঁকে ডাকে এবং তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ ক'রে। তিনি কখনও শুনে, কখনও রোগী দেখে ওযুধের কথা ব'লে দেন ; ঝাড়-ফুঁক, তেল-পানি প'ড়ে দেন কিংবা কি ক'রতে হবে তার উপদেশ দেন। তাঁকে সবাই ডাক্তারের মতই মান্য ক'রে এবং তাঁর ওষুধ-পত্রও ব্যবহার ক'রে। তাঁর টুক-টাক চিকিৎসার গুণ আছে। তিনি যে ওষুধ দেন প্রায়শ তাতে কাজ হয়। তাঁর পরামর্শও মূল্যহীন প্রমাণ হয় না। এধরণের চিকিৎসা করা তাঁর পেশা নয়-নেশা, তিনি নিজে কখনও খুব সামান্য, 'সদ্‌কা' হিসেবে—পাঁচ আনা, পাঁচ পয়সা, পাঁচ পাই, সওয়া-ষোল আনা বা পাঁচ সিকা নিতে পারেন ; আবার নাও নিতে পারেন। তাঁর গৃহীত পয়সা তিনি দান ক'রে দেন, কিংবা মসজিদে সিন্নি কিনে দেন। কখনও বা নিজে ব্যয় ক'রেন। কিন্তু এ, 'ফি' নেওয়া নয়। এটি তাঁর উপার্জনের অঙ্গ নয়।

যে-সব গ্রাম্য নারী-পুরুষ পেশা হিসেবে চিকিৎসা কাজ চালিয়ে থাকেন—তারা 'সদকা' ছাড়াও পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। তবে তা আজকালকার ডাক্তারদের মত নয়। যার যা ইচ্ছা- সে তাই দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। কঠিন রোগ-বিশেষে এঁদের 'সদকা' পাঁচ টাকা পর্যন্ত হ'য়ে থাকে। এঁরা যেহেতু জীবনধারণের জন্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, সেজন্য এঁদের দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। তার জন্য গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রতে হয়। লোক-চিকিৎসার নানা বিভাগ থাকায় কোন গুরুই সব রকম চিকিৎসা শিক্ষা দিতে পারেন না। ফলে, পেশাদারী লোক-চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ কলেরা-বসন্তের, কেউ পালা জ্বরের কেউ বাত জ্বরের চিকিৎসা আবার কেউ অন্যান্য উপসর্গ পেটে ব্যথা, উদরাময়, মেহ-প্রমেহ, পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি আরোগ্যে পারদর্শী হন ; কেউ বা ভূত-প্রেতের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ক'রতে পারেন, কেউ বা জ্বিনপরী শাসনে দক্ষতা লাভ ক'রেন ; আর কেউ বা সর্পবিদ্যা আয়ত্ব ক'রেন। এইসব লোক-চিকিৎসকের অধিকাংশই বশীকরণ, শত্রুদমন, চোরধরা ইত্যাদিও জানেন। এসব বিদ্যা যাঁরা অর্জন ক'রেন তাঁদের পীর, ফকীর, ওঝা, বদ্দি, গুণীন, কবিরাজ ইত্যাদি বলা হয়।

লোক-চিকিৎসা পুঁথি-পুস্তক নিহিত চিকিৎসা নয়। তবে লোক-চিকিৎসার কিছু কিছু উপকরণ পুথি-কেতাব ও গ্রন্থাদিতেও লিখিত আকারে পাওয়া যায়। মূলত এই চিকিৎসা গুপ্ত-বিদ্যা-নির্ভর, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত গুরুমুখী শিক্ষা ভিত্তিকে হওয়ায়—লোক-চিকিৎসকদের বিদ্যালয় মারফৎ শিক্ষা দান সম্ভব নয়। কোন লোক-চিকিৎসককেই স্কুল-কলেজে এই বিদ্যা শেখানোর সুযোগ নেই। গ্রামের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নারী-পুরুষ

চিকিৎসা বিষয়ক আধুনিক জটিল জ্ঞান, অভ্যাস, দক্ষতা ও যন্ত্রপাতির সম্পর্ক ছাড়াই পুরুষানুক্রমে আগত ও জনমুখে প্রচলিত সহজ-সরল গ্রাম্য চিকিৎসা পরিচালনা ক'রেন। এ চিকিৎসা পল্লীর আলো-বাতাসের মতই স্বাভাবিক। পানাহারের দ্রব্য তৈরীর মতই এ চিকিৎসার সকল উপকরণ সুলভ এবং সেসব চয়ন ও সেবনোপযোগী করাও অনায়াসসাধ্য। ফলে মুখে মুখে যে কোন ব্যক্তিই তা অন্যকে শেখাতে, পারে এবং শ্রোতাও শুধু শুনে এবং দেখে তা আয়ত্ব ক'রতে পারে। এজন্য লোক-চিকিৎসকদের ল্যাবরেটরি-নির্ভর জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন হয় না।

বস্তুতঃ পেশাদার লোক-চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নোক্ত নাম পরিচয় লাভ করা যায়—

১. গুণীন :-গুণীনরা মূলত শক্তি সম্পন্ন তন্ত্র-মন্ত্র জানেন। শোভারাণী চক্রবর্তী লিখেছেন—"মনে হয়, এ গুণীন শব্দটি 'গুণী' বা 'গোনা'র শব্দের পরিবর্তিত রূপ, যার অর্থ হ'ল সাধারণ মানুষের রহস্য-ঘনীভূত ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা।"[২১] বলাবাহুল্য, লেখিকা এখানে 'গণকে'র গোনা'র সঙ্গে 'গুণীন'-এর কাল্পনিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রেছেন। 'গুণীন' এবং 'জ্যোতিষী' অভিন্ন নয়। এজন্য 'গুণী'-এর সঙ্গে 'গোনা'র সম্বন্ধ নেই, আছে 'গুণ'-এর তথা 'গুণ'-(উপকার, নিরাময় বা কার্যকারিতা) দেখানোর এবং গুণ-করার (বাধ্য করা, বশীভূত করা, আবত্বাধীন করা) সম্পর্ক। এই ধরণের 'গুণ-মন্তর' বা ক্ষমতাযুক্ত মন্ত্রজ্ঞাত-ব্যক্তিকেই 'গুণী'ন' বলা হয়। প্রকৃত গুণীনের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। তিনি তন্ত্রোক্ত ষটকর্ম-আকর্ষণ, বিদ্বেষণ, উচাটন, স্তম্ভন, সম্মোহন ও বশীকরণে পারদর্শিতা ছাড়াও ভূত-প্রেত বিতাড়ন, যাদু-টোনা-বশীকরণ থেকে মুক্তি দান, সর্প-দংশনজাত বিষ-চিকিৎসা কিংবা 'মৃতের পুনর্জীবন দান' ইত্যাদিতে সমর্থ ব'লে লোক-বিশ্বাস।

গুণীনদের প্রায় সবাই পুরুষ। তবে নারীদের মধ্যেও গুণবিদ্যার বিশেষত পূর্বোক্ত ষটকর্মের এবং কিছু কিছু চিকিৎসায় ব্যবহৃত গুণ-মন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। বশীকরণে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা গুণীন-ই শ্রেষ্ঠ। শোভারাণী চক্রবর্তী ব'লেছেন—"মেয়ে গুণীনকে বলা হয় ডাইনী বা ডাকিনী"।[২২] একথা ঠিক নয়। মহিলা গুণীনদের 'গুণীন' বা 'গুণীন বেটি', 'ফকীর বেটি' বা 'ফকীর বুড়ী' ইত্যাদি বলা হয়। 'ডাইনী' বলতে বোঝায় অপদেবতাকে এবং যাদের মন্তব্য থেকে ক্ষতি হয়-'নজর' লাগে, তাদের।

২. ওঝা : -যে উত্তম রূপে ঝাড়তে পারে তাকেই বলা হয় 'ওঝা'। সাধারণত সর্প-দংশন-চিকিৎসায় এরূপ ঝাড়ার বিশেষ আবশ্যক হয় ব'লে সাপের গুণীনদের-ই 'ওঝা' বলা হয়। সর্পদিষ্ট ব্যক্তির শরীর থেকে বিষ নামানোর জন্য ওঝারা নানা প্রকার গাছ-গাছড়ার 'জাব' ব্যবহার করা সত্বেও মূলত বিষ নামায়-'ঝেড়ে'। এজন্য তাঁরা যেসব মন্ত্র ব্যবহার ক'রে সেগুলো বহু বিচিত্র। লোকমতে শ্রেষ্ঠ ওঝারা '৬৪ পটি' মন্ত্র জানেন।

এসব ওঝা সর্প-বিষ চিকিৎসা ছাড়াও-সাপ ধরা, সাপের 'বিষভাঙা', সাপকে পোষ মানোনো, সাপকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসা, 'কড়ি চালান' দেওয়া প্রভৃতি ছাড়াও ভূত-প্রেত বিতাড়ন, পশু-চিকিৎসা ক'রে থাকেন। ভূতপ্রেতের ওপর আধিপত্য লাভকারী ওঝারা-ভূত

প্রেতকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 'চালান' দিতে পারেন। তাদের সব রকম উপদ্রব দূর ক'রতে পারেন। এমনকি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে সনাক্তও ক'রতে পারেন। তাঁরা পারেন— সেইসব ভূত-প্রেতকে হাজির করাতে, কথা শোনাতে বা আদেশ-নিষেধ মানাতে এবং শাস্তি দিতে। ভূতের দ্বারা আক্রান্ত নারী-পুরুষকে স্থায়ী চিকিৎসার উপযোগী ওষুধ-পত্র, ঝাড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র ও গাছ-গাছালির প্রয়োগও তাঁরা জানেন।

ওঝাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই আছে।

৩. **বদ্দি :** 'সাধারণত 'বৈদ্য' বলতে 'চিকিৎসক' বোঝায়। 'বৈদ্য' শব্দটি-ই লোক-ভাষায় 'বদ্দি' রূপে প্রচলিত হ'য়ে থাকতে পারে। বৈদ্যদের দুটি বিভাগ উল্লেখযোগ্য। 'বিষ-ভৈদ্য' বা' বিষ-বদ্দি', বা 'মাল-বদ্দি'। 'বিষ-বদ্দি'রা যে কোন ধরণেরই 'বিষ' চিকিৎসায় পারদর্শী। পক্ষান্তরে 'মালবদ্দি'রা বাত-চিকিৎসা-(যা রসবাত, বিষবাত, অগ্নিশ্বর বাত ইত্যাদি নামে পরিচিত) প্রভৃতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। মূলত অস্ত্র-চিকিৎসা বা শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত-মোক্ষণ, পূঁজ মোক্ষণ প্রভৃতির দ্বারাই বাত-ব্যাধি নিরাময় করা হ'য়ে থাকে। অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায়, অতি-আদিম এই চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণত যাযাবর 'বেদিয়া' বা বেদে-বেদেনীরাই অবলম্বন ক'রে আছেন। সেজন্য বৈদ্য শব্দের বদলে 'দেয়িয়া' শব্দ থেকেও 'বদ্দি' শব্দের উদ্ভব হ'য়ে থাকতে পারে। তাই কোথাও কোথাও বিষ-চিকিৎসায় পারদর্শী বেদিয়াদের 'বিষ-বদ্দি' এবং বাত চিকিৎসায় দক্ষ বেদেনীদের 'মাল-বাদ্দি' বলা হ'য়ে থাকে।

এরা রক্ত মোক্ষণ, পূঁজ মোক্ষণ, বড়ি খাওয়ানো, ঝারফুঁক ও প্রলেপাদির সাহায্যে চিকিৎসা ক'রে থাকেন। এরা প্রতিরোধমূলক তাবিজ-কবচও দিয়ে থাকেন। জারজ-সন্তানের স্থান বিশেষের হাড় যাদুর কাঠি হিসেবে এঁরা ব্যবহার ক'রে থাকেন।

৪. **হাজাম**-'হাজাম' ব'লতে মুসলমান ছেলেদের 'খৎনা'-(ত্বকচ্ছেদ) দানকারী এক শ্রেণীর বংশানুক্রমিক পেশাদর অস্ত্র-চিকিৎসকদের বোঝায়। এরা অতি ধারালো চাকু বা ছুরির সাহায্যে মুসলমান বালক ও তরুণদের খৎনা দিয়ে থাকেন। অস্ত্রোপচারের সময় কোন প্রকার এনেস্থেশিয়ার প্রয়োজন হয় না। পোড়া মাটির মিহি চূর্ণ, গোবরের বা ঘুঁটোর ছাই, সরিষার তেল, নেকড়া পোড়া ইত্যাদি একাজে ব্যবহৃত হয়। রোগীর সচরাচর কোন ক্ষতি হয় না। 'হাজাম'রা পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক উভয়-ই নিয়ে থাকেন।

৫. **দাই :** 'হাজাম'-এর কাজ যেমন পুরুষ লোকদের একচেটিয়া, তেমনি 'দাই'-এর কাজও মহিলাদের একচেটিয়া। সাধারণত বয়স্কা ও বিবাহিতা অভিজ্ঞ মহিলারাই 'সন্তান প্রসব'-এর দায়িত্ব পালন ক'রে থাকেন। তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে একাজ স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত হ'য়ে করলেও পারিতোষিক থেকে বঞ্চিত হননা। দাই বা ধাত্রীরা শুধু গর্ভমোচন নয়, প্রসূতীর রক্তবন্ধ, জ্বর-চিকিৎসা, স্তন্যবৃদ্ধি, পথ্যাদি প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। নবজাতককে সুস্থ রাখার দায়িত্বও তাঁদের পালন ক'রতে হয়।

৬. **ফকীর :** সাধারণত যাঁরা দোয়া-তাবিজ, ঝাঁড়-ফুক, পানি পড়া, তেলপড়া, সুতা পড়া, বিভিন্ন রকম ফল পড়া, 'নাকশি ভাঙানো', 'তেল জ্বালানো', 'বাণ-ফেরানো', ইত্যাদির

সাহায্যে জ্বরাদি কঠিন পীড়ার চিকিৎসা, বন্ধ্যাত্বমোচন প্রভৃতি ক'রে থাকেন, তাঁদের 'ফকীর' বলা হয়। এঁরা কলেরা, বসন্ত, শিশু ও স্ত্রীরোগেরও চিকিৎসা ক'রেন। মহামারী-চিকিৎসক ফকীরগণ সাধরণত অন্যান্য ধরণের চিকিৎসা কম ক'রেন। এসব ফকীর কেউ কেউ জ্বিন-পরী ও কলেরা বসন্তের রোগ-দেবতার ওপর আধিপত্য স্থাপন ক'রতে পারেন এবং তাঁরা মন্ত্র, দোয়া-কালাম, কোরানের আয়াত, তার নক্সা ইত্যাদির সাহায্যে জ্বিন-পরীকে ও রোগ-দেবতাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য ক'রতে পারেন। এমনকি অবাধ্য হলে শাস্তিও দিতে পারেন ব'লে আদেশ শোনা যায়। এঁরা বাত, জণ্ডিস, মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া, হাঁফানি, হাড়ভাঙ্গা ইত্যাদিও চিকিৎসা ক'রে থাকেন। চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে গাছ-গাছালি এবং কিছু পরিমাণ আয়ুর্বেদী এবং লোকজ ওষুধপত্র ব্যবহৃত হয়। মুসলমান-গুরুর নিকট দীক্ষিত হিন্দু ফকীর এবং হিন্দু-গুরুর নিকট শিক্ষিত মুসলমান ফকীরও দেখা যায়। তবে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাল্পতার কারণে দ্বিতীয় রকম 'ফকীর'-এর দেখা খুব বেশী মেলে না। এঁরা স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে অবনিবনা থাকলে তা দূর ক'রতে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠা ক'রতে এবং শত্রুদের শত্রুতার বদলা নিতে, কিংবা 'দুঃসময়'কে সুসময়ে পরিবর্তন ক'রতে পারেন ব'লে লোক-বিশ্বাস।

৭. **'পীর-দরবেশ', 'সন্ন্যাসী-পুরোহিত' চিকিৎসক।** এঁদের চিকিৎসা-পদ্ধতিকে 'পীরালী' চিকিৎসা ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে। আদিতে এঁদের চিকিৎসা-প্রণালী লোক-চিকিৎসা থেকে ভিন্ন ও উন্নত ছিল। কিন্তু অধুনা আরও উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, এবং পীরালী চিকিৎসা-রীতির অবনতি ঘটায়-এখন একে লোক-চিকিৎসার-ই পর্যায়ভুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের মোল্লা-মৌলবী-মুন্সী-হাফেজ-মৌলানা-পীর-দরবেশ, সন্ন্যাসী-গোসাই-পুরোহিত-ঠাকুররাই এধরণের চিকিৎসা ক'রে থাকেন। বর্তমান বাংলাদেশে, সন্ন্যাসী-গোঁসাই-পুরোহিত প্রভৃতির সংখ্যাল্পতার জন্য লোকচিকিৎসা হিসেবে হিন্দুদের এই ধর্মীয়। 'পুরোহিতী' চিকিৎসাবিদ, কালীসাধক সন্ন্যাসী কিংবা ঠাকুরের সাক্ষাৎ ভিত্তিক বীজমন্ত্র, বামমন্ত্র, কালীমন্ত্র, নক্সা, কবচ ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা ক'রেথাকেন। বর্তমান বাংলাদেশে অন্যপক্ষে পীরালী চিকিৎসার ব্যাপক প্রভাব র'য়েছে। গ্রামাঞ্চলে মসজিদের ইমাম, যিনি মোল্লা সাহেব, মৌলবী সাহেব বা মুন্সী সাহেব, হাজী সাহেব হিসেবে পরিচিত তিনি, কিংবা দরগা রক্ষণাবেক্ষণকারী অথবা গৃহকর্মে উদাসীন দরবেশ-সাধারণ মানুষের সাধারণ অসুখ-বিসুখ থেকে শুরু ক'রে দূরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য ক'রে থাকেন। এক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পীর সাহেবদের প্রভাব-ই অধিক। পীর-প্রথা বংশানুক্রমিক হওয়ায়-পীরালী-চিকিৎসা বংশানুক্রমিক পেশায় পরিণত হ'য়েছে এবং তা গুপ্তবিদ্যায় রূপ লাভ ক'রেছে। পীর-দরবেশদের অনেকেই অনেক রকম চিকিৎসায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁরা সাধারণভাবে চিকিৎসার অযোগ্য বহু জটিল ব্যাধি বিস্ময়কর রকম স্বল্প সময়ে আরোগ্য ক'রতে পারেন ব'লে প্রমাণ আছে। তাঁদের চিকিৎসার উপকরণ মূলত কোরানের আয়াত বা দোয়া-কালাম, সুরা ও তার নক্সা, তাবিজ-কবজ এবং কদাচিৎ

ঔষধপত্র। এঁদের চিকিৎসার সঙ্গে ইউনানী চিকিৎসার, কবিরাজি চিকিৎসার ও লোক-চিকিৎসারও কিছুটা যোগ আছে। যশোর জেলার নওয়াপাড়ার পীর সাহেবরা বংশানুক্রমিক দোয়া-তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক দানের মাধ্যমে চিকিৎসা ছাড়াও নানাবিধ মালিশ, তেল, আরক ইত্যাদি পেটেন্ট ওষুধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

৮. ও. পি. জ্যাগ্‌গি হেকিম-কবিরাজদেরও লোক-চিকিৎসকদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"২৩ বলাবাহুল্য, যথার্থ শিক্ষিত হেকিম-কবিরাজগণ সুপাচীন দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিরই উত্তরসূরী ; লোক-চিকিৎসার বৃত্তে তাঁদের অবস্থান নয়। কিন্তু যেসব নাম-সবর্স্ব হেকিম-কবিরাজ-হোমিওপ্যাথ, হাতুড়ে চিকিৎসক নামে পরিচিত-তারা 'লোক-চিকিৎসক' বটে। কিন্তু প্রকৃত লোক-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, স্বীকৃতি এবং জনপ্রিয়তা এদের থাকে না। তাই এদের নিকৃষ্টতম লোক-চিকিৎসক হিসেবেই গণ্য করা উচিত।

অতএব প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সাতরকম পেশাদার চিকিৎসককেই লোক-চিকিৎসক হিসেবে নির্দেশ করা সঙ্গত। বাংলাদেশের জনজীবনে-স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসায় এঁদের বিলুপ ভূমিকা বিদ্যমান। এসঙ্গে কিছু কিছু দরগা, মেলা, বার ঠাকুর বাড়ী ইত্যাদির 'অলৌকিক শক্তি'ও বাংলাদেশের গণ-চিকিৎসায় নিজস্ব ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। বাস্তবে না হোক-অন্তত বিশ্বাসে ; তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ) যশোর জেলার লোক-চিকিৎসা-কেন্দ্র

যাশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, দরগা, ভিটা, পীরবাড়ি ও মন্দির-বার মেলা কেন্দ্রিক যে-সব লোক-চিকিৎসাকেন্দ্র আছে-তার সংখ্যা কম নয়। এগুলোর সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। নিম্নে নমুনাসরূপ এ ধরণের কতিপয় লোক-চিকিৎসাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হ'ল। যথা—

১. **ছাদহীন মসজিদ**। স্থান-নলদী, ডাকঘর-নলদী, থানা-নড়াইল, জেলা-যশোর।

এটি একটি অতি পুরাতন ছাদহীন মসজিদ। স্থানীয় জনসাধারণ এই মসজিদকে অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন ব'লে মনে ক'রে। তারা রোগমুক্তি ও অন্যান্য কামনা পূরণের জন্য এ মসজিদে 'হাজত-মানত' দিয়ে থাকে।

২. **'ইছেখাদার দরগা'**। স্থান-ইছাখাদা, ডাকঘর-হাজরাতলা, থানা-মাগুরা, জেলা-যশোর।

স্থানীয় জনসাধারণ এখানকার দরগাস্থানকে পবিত্র ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব'লে মনে ক'রে। সেজন্য তারা নিজেদের কামনা পূরণ ও রোগমুক্তির অভিলাষে মানত ক'রে।

৩. **'বটতলার দরগা'**। গ্রাম-পাতরা, ডাকঘর মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আলোচ্য দরগার অলৌকিক মহিমায় ব্যাপকভাবে বিশ্বাস পোষণ ক'রে। সেজন্য রোগমুক্তি, সন্তান-কামনা ও অন্যান্য বাসনা চরিতার্থ হবার নিয়তে

এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই 'মানত' ক'রে থাকে। তবে সংখ্যাল্পতার জন্য হিন্দু মানতকারীও মানতকারীণীদের সংখ্যা পূর্বের থেকে এখন অনেক কম।

৪. **'ন্যাংটা শা-র দরগা'**। স্থান-কালীগঞ্জ, ডাকঘর-নলডাঙ্গা, থানা-ঝিনাইদহ, মহকুমা-ঝিনাইদহ, জেলা-যশোর।

এখানকার দর্গা লোকালয় থেকে দূরে-একটি ক্ষুদ্র শালবনের মধ্যে। স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণ রোগমুক্তি ও অন্যবিধ উদ্দেশ্যে 'হাজত-মানত' ক'রে এবং মাদুলি নিয়ে থাকে।

৫. **'গরীব শা-র দরগা'**। স্থান-বকুলতলা, মুল যশোর জেলা-শহরের ওপর কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ তীরে, দড়াটানা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত।

প্রায় সমস্ত যশোর জেলার অধিবাসীরা তো বটেই, এমনকি খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনার জনসাধারণও এই দরগার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তারা রোগ নিরাময়, সন্তান-কামনা ও অন্যবিধ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই দরগায় 'হাজত-মানত' ক'রে থাকে। প্রতিদিন এখানে অসংখ্য ব্যক্তি এখনও পয়সা, মোমবাতি, বাতাসা, ডাব, কুকড়ো, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে যায়। অধ্যায় শেষে এই দরগার ভিতর ও বাহিরের দুটি ছবি সংযোজন করা হল।

৬. **'বুরহান শা-র দরগা'**। স্থান-কারবালা, যশোর-শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

আলোচ্য 'দরগা'-তেও স্থানীয় জনসাধারণ রোগমুক্তি ও অন্যবিধ কামনা পূরণের নিমিত্ত মানত ক'রে থাকে এবং পীর বুরহন উদ্দীনের পরলোকগত আত্মার সন্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁর কবরস্থানে আগরবাতি, মোমবাতি, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এই দরগারও একটি ছবি অধ্যায় শেষে প্রদত্ত হল।

৭. **'গাজী শা-র দরগা'**। স্থান-বারোবাজার, ডাকঘর-বারোবাজার, থানা-কোতোয়ালী, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর।

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পার্শ্বে এই দরগা অবস্থিত। একে 'গাজী শাহের মাজার'ও বলা হয়। এখানে প্রতিদিন বহু নর-নারী হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে রোগমুক্তি ও অন্যবিধ কামনা পূরণের আশায় টাকা-পয়সা, বাতি, হাজত-মানত ইত্যাদি দিয়ে থাকে।

৮. **'চাঁদ মৌলবীর মাজার'**। স্থান-ইছালী, ঝিনাইদহ, জেলা-যশোর।

এ মাজারটিও লোক-মনে ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি ক'রেছে। এখানে প্রতিদিন বহু লোক রোগমুক্তির ও অন্যান্য কামনা পূরণের নিমিত্ত 'হাজত-মানত' ক'রে থাকে। আলোচ্য মাজারকে কেন্দ্র ক'রে স্থানীয় একদল জিকির-ফকীরের উদ্ভব হ'য়েছে-তাদের প্রধান ব্যক্তি 'পাগল' নামে পরিচিত। আর তার প্রচারিত মত 'পাগলার মত' বা 'ইছেলির মত' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। এরা চিকিৎসা-কার্যও ক'রে থাকে।

৯. **'গোপাল গ্রাম মসজিদ'**। স্থান-গোপাল পুর, ডাকঘর-নলডাঙ্গা, থানা ঝিনাইদহ, মহকুমা-ঝিনাইদহ, জেলা-যশোর। যশোর জেলার প্রাচীন মসজিদসমূহের মধ্যে এ

মসজিদটিও অত্যন্ত প্রাচীন। পূর্বোক্ত নলদীর মসজিদের মত এটিকেও অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন ব'লে মনে করা হয়। সেজন্য স্থানীয় লোকেরা এখানে রোগ নিরাময় ও অন্যান্য কামনা পূরণের জন্য মানত ক'রে থাকে। বর্তমানে মসজিদটি জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রয়েছে। অধ্যায় শেষে এরও একটি চিত্র সংযোজিত হ'ল।

১০. **'পৈজু দেওয়ানের আস্তানা'**। স্থান–কচু বাড়ীয়া, ডাকঘর–লক্ষ্মীপাশা, থানা–লোহাগড়া, মহকুমা–নড়াইল, জেলা–যশোর।

এই আস্তানা অত্যন্ত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব'লে স্থানীয় জনসারণের বিশ্বাস। এখানে প্রতি বছর 'ওরস' পালিত হয়। আলোচ্য আস্তানায় তিনটি মাজার বা সমাধি আছে। তিনটি মাজার–ই ইঁট দ্বারা বাঁধানো। নিকটেই আছে উত্তর–দক্ষিণে লম্বা একটি বৃহৎ দীঘি। আর আছে চার–পাঁচ একর জমিতে আস্তানার নিজস্ব বাগিচা। আস্তানা, বাগিচা, ও দীঘির বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক জনাব গঞ্জর আলী ফকীর। তাঁর বয়স ৫০/৫৫ বছর।

এখানে রোগমুক্তি, সন্তান–কামনা ও অন্যবিধ উদ্দেশ্যে প্রতিদিন অনেক হিন্দু–মুসলিম 'হাজত–মানত' দান ক'রতে এসে থাকে। এ আস্তানা–কেন্দ্রিক রোগ–নিরাময়মূলক অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট শোনা যায়।

১১. **'গোপালপুর'**। গ্রাম–গোপালপুর, ডাকঘর–নলডাঙ্গা, থানা–ঝিনাইদহ, মহকুমা–ঝিনাইদহ, জেলা–যশোর।

এ গ্রামের 'পীর বাড়ী' বিশেষ খ্যাত। যশোর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক লোক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ে সুফল লাভের আশায় 'পীর বাড়ী'তে সমবেত হ'তেন। কিছুকাল পূর্বে পীর সাহেবরা এখান থেকে বাসস্থান বদলিয়ে কালীগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে বাসস্থান স্থাপন ক'রেন। এখানেই এ–আমলের, এ–বংশের বড় পীর সাহেব, কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল ক'রেন। ছোট পীর সাহেব এখনও জীবিত। তিনি এখান থেকে পুনরায় বাসস্থান বদন ক'রে চলে গেছেন যশোর শহরের নিকটবর্তী এলেকা চাঁচড়ায়। তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ নানাবিধ রোগ, সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা ক'রে থাকে।

১২. **'নওয়াপাড়া'**। স্থান–নওয়াপড়া, ডাকঘর–নওয়াপাড়া, থানা–নওয়াপাড়া, মহকুমা–সদর, জেলা–যশোর।

এখানকার 'পীরবাড়ী'ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ স্থানের 'ইরাণী পীরের মাজার'ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব'লে মনে করা হয় এবং তথায় রোগমুক্তি ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসাধারণ 'হাজত–মানত' ক'রে থাকে। যশোর–খুলনা বাস–রোডের পার্শ্বে অবস্থিত এই মাজার–এ, প্রতিদিন অসংখ্য বাস–যাত্রীকে বাস থেকে মানতের টাকা–পয়সা নিক্ষেপ ক'রতে দেখা যায়। বর্তমান পীর সাহেবরা প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক আরোগ্যাভিলাষীকে দোয়াতাবিজ ফুঁক–নাকশী ইত্যাদি দেওয়া ছাড়াও নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত নানা প্রকার তেল, মালিশ, আরক ও অন্যান্য ওষুধপত্রও দিয়ে থাকেন। এসব ওষুধ পেটেন্ট আকারে বাজারেও বিক্রয় করা হয়।

১৩. মৈরেম'। গ্রাম–মৈরেম। ডাকঘর–বাঘার পাড়া, থানা–বাঘারপাড়া, মহকুমা–সদর, জেলা–যশোর।

এখানকার 'পীরবাড়ী'র খ্যাতি অধুনা ম্লান হ'য়ে গেছে। কিন্তু একসময় এ বাড়ীর পীর–সাহেবদের, সমগ্র অঞ্চলে চিকিৎসক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি ছিল। বর্তমানে এ বাড়ীতে রোগীদের তেমন ভিড় হয় না।

১৪. 'দয়ারামপুর'। গ্রাম–দয়ারামপুর, ডাকঘর–নারিকেল বাড়িয়া, থানা–বাঘারপাড়া, মহকুমা–সদর, জেলা–যশোর।

পীরালী ব্যতীত চিকিৎসার নিমিত্ত ও দয়ারামপুরের পীর সাহেবদের ব্যাপক খ্যাতি আছে। পূর্বের তুলনায় এই খ্যাতি বর্তমানে অনেক হ্রাস পেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। এই বংশের বর্তমান জীবিত পীরসাহেবরা দু'ভাই। তাঁদের এক জনের নাম বদরউদ্দীন ওর্ফে 'বদর পীর' এবং অপর জনের নাম সামসুদ্দীন ওর্ফে 'সামসু পীর'। উভয়েই কলেরা, বসন্ত রোগের তদবীর দান, প্রতিরোধের ব্যবস্থা, গ্রাম–বাড়ী 'বন্ধ' দেওয়া ইত্যাদি ক'রে থাকেন। তাছাড়া তেল–পানি পড়া, দোয়া–তাবিজ দেওয়া ইত্যাদির সাহায্যেও তাঁরা নানারোগ আরোগ্য ক'রে থাকেন। এঁদের পিতা মরহুম পীর আবদুর রহিম বিশেষ বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

১৫. 'পানিঘাটা'। গ্রাম–পানিঘাটা, ডাকঘর–নোহাটা, থানা–মোহাম্মদপুর, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর।

এই গ্রামের বর্তমান বুজর্গ ব্যক্তি জনাব মৌলানা মহীউদ্দীন। তাঁকে স্থানীয় সকলে 'পীর' ব'লে মান্য ক'রে। তিনি জ্বিন–পরীর আছর ছাড়ানো, বাড়ী বন্ধ দেওয়া, দোয়া–তাবিজ দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি ক'রে থাকেন। তবে চিকিৎসা তাঁর পেশা নয়। বহুলোক তাঁর নিকট থেকে রোগমুক্তির তদ্বির নিয়ে থাকে।

ii) হিন্দু লোক–চিকিৎসা–কেন্দ্র

১. 'তালবা'ড়ের ভিটে'। স্থান–বেতাল পাড়া, ডাকঘর–ছান্দড়া, থানা–বাঘারপাড়া, মহকুমা–সদর, জেলা–যশোর।

এই স্থানে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ আছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একটি কচা বা জিয়ল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ স্থানে হিন্দু–মুসলমান সকলেই রোগমুক্তি, সন্তান–কামনা ও অন্যবিধ বাসনা পূরণার্থে হাজত–মানত ক'রে থাকে। আগে এটি হিন্দুদের 'পূজাস্থান' ছিল ব'লে অনুমিত হয়। অধুনা প্রধানত মুসলমানরাই এ স্থানের দেখা–শোনা ক'রে।

২. 'আলম খালির বার'। স্থান–আলমখালি, ডাকঘর, থানা ও মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর।

'বার' 'থান' বা 'মেলা' মূলত হিন্দু–তীর্থস্থান, প্রতিবছর এসব নামাংকিত স্থানে সাধারণতঃ বারুণীস্নান উপলক্ষে জনসমাগম হয়। এইসব স্থানের স্নানঘাটে, যা গঙ্গাতীর্থরূপে বিবেচিত হয় ; নিরক্ষর জনসাধারণ দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি কিংবা সন্তান–কামনায় 'হাজত–মানত' ক'রে থাকে। আলোচ্য 'আলম খালির বারে'ও অনুরূপ মানতাদি করার নিদর্শন আছে।

৩. **'বারেঙ্গার মেলা'**। স্থান–কেছুয়াডুবি, ডাকঘর–ভাবনহাটি, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর।

এখানে একটি খাল আছে। এই খাল স্থানীয় ফটকীনদীর সঙ্গে যুক্ত। খালমুখে নদীর তীরে একটি প্রাচীন বটগাছ আছে। খালের অপর পারে অনতিদূরে পাথরে নির্মিত গৌর–নিতাইয়ের বিগ্রহ বর্তমান। বারেঙ্গার খালমুখেও এই স্থানে প্রতি বছর মেলা হয়। খালমুখে মেলা বসে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কিংবা আষাঢ় মাসের প্রথমে। আর বিগ্রহের স্থানে মেলা জমে ফাল্গুন মাসের শেষে বারুণী–স্নানের সময়।

স্থানীয় লোকজন বারেঙ্গার বটগাছের পাদমূলে 'হাজত–মানত' দেয়। নদীতে অসুস্থ শরীরে স্নান ক'রে–সুস্থ হবার আশায়। ত্রাণপ্রার্থীদের মধ্যে হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকে। তবে মুসলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

৪. **"লক্ষ্মী পাশার কালীবাড়ী'**। স্থান–লক্ষ্মীপাশা, ডারঘর, লক্ষ্মীপাশা, থানা–লোহাগড়া, মহকুমা–নড়াইল, জেলা–যশোর।

লক্ষ্মীপাশার কালীমূর্তীকে হিন্দুরা 'জাগ্রত কালী' ব'লে বিশ্বাস ক'রেন। এই স্থানে ১৮৬১ খৃ: একটি মুসলমান বালককে"[২৪] বলি দেওয়ার মত বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র হিন্দু নর–নারীরাই এখানে রোগমুক্তি ও অন্যান্য কামনা পূরণের নিমিত্ত 'মানত' ক'রে থাকেন।

৫. **'জয়পুরের গোঁসাই বাড়ী'**। স্থান–জয়পুর, ডাকঘর–লোহাগড়া, থানা–লোহাগড়া, মহকুমা–নড়াইল, জেলা–যশোর।

সুবিখ্যাত কবিয়াল তারক চাঁদ গোঁসাই ওর্ফে তারক কাঁড়াল–এর বাড়ী এটি। এখানে একটি ছোট্ট মন্দিরে তাঁর মূর্তি আছে। তারক চাঁদের বিপুল সংখ্যক শিষ্য ছিল। তাঁরাই এখানে প্রতি চৈত্র মাসে মেলার সৃষ্টি ক'রেছেন। তারক চাঁদের পরলোকগত আত্মার আশীর্বাদে রোগমুক্তি ও অন্যবিধ কল্যাণ–কামনায় তাঁর শিষ্য–প্রশিষ্য এবং স্থানীয় হিন্দু নর–নারীগণ 'মানতারি' ক'রে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বোক্ত দরগা, মসজিদ, আস্তানা, মেলা, বার, মন্দির, কালীবাড়ী ইত্যাদি স্থানে হাজত–মানত দ্বারা রোগ–চিক্যিসা খুব কমই সাধিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের বংশগত পীর সাহেবরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবদার। কেননা, তাঁরা সত্যি সত্যি সকল প্রকার রোগ চিকিৎসা ক'রতে সমর্থ না হলেও বহু রকম দূরারোগ্য ব্যাধি অত্যন্ত নিপুণভাবে নিরাময় ক'রে থাকেন। এজন্যই পীরালী চিকিৎসার এখনও কিছু কদর রয়েছে। সেই তুলনায় দরগা প্রভৃতির গুরুত্ব কার্যত লোপ পেয়েছে বললেই চ'লে। তবু প্রথা এবং ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্যই হয়তো রোগ–ক্লিষ্ট দুর্বল মানুষ এখনও এইসব স্থানে যায়, 'হাজাত–মানত' ক'রে, দোয়া–তাবিজ নেয়, গোসল ক'রে। তাতে রোগের শান্তি না হোক, মনের শান্তি খুঁজে পায়। ঐ টুকুই এইসব স্থানের আধুনিক ভূমিকা।

ঘ) যশোর জেলার লোক–চিকিৎসক

এবার যশোর জেলার বিভিন্নস্থানের কিছু সংখ্যক জীবিত লোক–চিকিৎসকের পরিচয় দেওয়া হবে। এইসব চিকিৎসকের অধিকাংশই কৃষক। লোক–চিকিৎসা তাদের সহযোগী পেশা মাত্র।

সার্বক্ষণিক চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত পেশাদার চিকিৎসকও আছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা দিন দিন লোপ পাচ্ছে। কেননা, অধুনা শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানের বিস্তৃতি, হাতুড়ে কম্পাউণ্ডার মার্কা ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে, গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যেও লোক-চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। পল্লীর একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্ররাই এখন 'ওঝা-ফকীর-বদ্দি'-দের মুখাপেক্ষী। তবু গ্রামাঞ্চলে এই উচ্ছন্ন সর্বহারাদের সংখ্যা বিপুল ব'লেই লোক-চিকিৎসার ধারা অচিরেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। যশোর জেলার বিভিন্নস্থানে এখনও যাঁরা-এই ধরণের চিকিৎসা-কর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, নিম্নে তাঁদের কিছু সংখ্যকের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হল।

i) মুসলিম লোক-চিকিৎসক

১. **আবুল ফকীর**। বয়স-৩০/৩৫ বছর। গ্রাম-রসুনপুর, ডাকঘর-ছান্দড়া, থানা-বাঘারপাড়া, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী তাড়ানো, বাতাস লাগা, মহামারী নিরোধ ও তার প্রতিকার ইত্যাদি চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

২. **আবদুল ফকীর**। বয়স-৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম-হুলোট, ডাকঘর-ছান্দড়া, থানা-বাঘারপড়া, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর। ইনি 'দাঁতের পোকা' পাতনে দক্ষ। একটি গাছের শিকড়ের সাহায্যে পোকা ধরা দাঁতের চিকিৎসা ক'রে থাকেন এবং তাতে স্থায়ী ফলালাভ হয়। 'দন্তরোগ' নিরাময় হ'য়ে থাকে।

৩. **আবুল ফকীর**। বয়স-৩৫/৩৬ বছর। গ্রাম-নরসিংহপুর, ডাকঘর-ছান্দড়া, থানা-নলডাঙ্গা, মহকুমা-ঝিনাইদহ, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত, আসর-উপরি ছাড়ানোসহ অন্যান্য রোগের ও চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৪. **আবদুল খালেক**। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-নোহাটা, ডাকঘর-নোহাটা, তানা-মোহাম্মদপুর, জেলা-যশোর। ইনি 'সাপের ওঝা' হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্পবিষ-চিকিৎসা, সাপধরা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ ক'রে থাকেন।

৫. **আমজাদ ফকীর**। বয়স ৩০/৩২ বছর। ঠিকানা-ঐ ইনি সর্পবিষ নিরাময় এবং জ্বিন-পরী ও ভূত-প্রেতের 'আসর' দূর ক'রে থাকেন। এর পিতাও এসব চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন।

৬. **ইসরাইল মিনা**। বয়স-৫০/৫২ বছর। গ্রাম-দশ পাকিয়া, ডাকঘর-ধলগ্রাম, থানা-বাঘারপাড়া, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর। ইনি পেটের ব্যথা, উপরি, বাধক, মেহ-প্রমেহ, রক্তোৎকাশ, রক্ত-প্রস্রাব, জ্বর, ঘরবাড়ী বন্দ ইত্যাদি চিকিৎসা ক'রে থাকেন। তাঁর চিকিৎসায় বহুক্ষেত্রে সুফল পেতে দেখা গেছে।

৭. **বদর ফকীর**। বয়স ৪০/৪২ বছর। গ্রাম-হুলোট, ডাকঘর-ছান্দড়া, থানা-বাঘার পাড়া, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী তাড়ানো ও অন্যান্য সাধারণ রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৮. ওয়াহেদ-এর স্ত্রী। বয়স ৬০/৬২ বছর। গ্রাম-পারছাতড়া, ডাকঘর-লোহাগড়া, থানা-লোহাগড়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। এর স্বামী মরহুম শেখ আবদুল ওয়াহেদ নানাবিধ চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাশি, মহামারী, ভূথ-প্রেত-উপরি ইত্যাদির চিকিৎসা ক'রতেন। সেই সূত্রে তাঁর স্ত্রী ও কিছু কিছু মন্ত্র ও ওষুধ শিখেছেন এবং চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৯. আকবর মোল্যা। বয়স-৪০/৪২ বছর। গ্রাম-তেলিডাঙ্গি, ডাকঘর-সুকতো, গ্রাম-থানা-কালিয়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। ইনি সর্পবিষ, জ্বর, হাড়ভাঙ্গা ইত্যাদির চিকিৎসা ক'রেন। পিতার নিকট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শোনা যায়, ইনি সাধারণ 'হাড়ভাঙা' একটি গাছের ব্যাণ্ডেজ-এর সাহায্যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য ক'রতে পারেন।

১০. আবুল মোল্যার বউ। বয়স-৪৫/৪৬ বছর। এই বংশের মহিলা। কাজেই ঠিকানা পূর্ববৎ। ইনি তাবিজ-কবচ ও গাছ-গাছড়ার দ্বারা শিশুরোগ, বালারোগ ও অন্যান্য, নানারকম রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

১১. ইক্তার আলী। বয়স ২৫/২৬ বছর। গ্রাম-তেলিডাঙি, ডাকঘর-সুকতো, গ্রাম-থানা-কালিয়া, মহকুমা-নড়াইল। জেলা-যশোর। ইনি নানা প্রকার রোগের চিকিৎসায় অভ্যস্ত।

১২. পাগল। আসল নাম ব'লে না। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-তেলকাড়া, ডাকঘর-বড়দিয়া, থানা-কালিয়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। ইনি 'ইছেলির মতে'র একজন সাধক ফকীর। নানা রোগের চিকিৎসাও ক'রে থাকেন। তার বহু অনুসারী আছেন।

১৩. আদম ফকীর। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-সীতারামপুর, ডাকঘর-মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি দোয়া-তাবিজ ও গাছ-গাছড়ার সাহায্যে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

১৪. আজাহার ফকীর। বয়স-৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম-আকাছি, ডাকঘর-মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী তাড়ানো, বাতাস লাগা, বাত-বেদনা জ্বর ও অন্যবিধ রোগ চিকিৎসা ক'রে থাকেন। এঁর চিকিৎসার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনি রোগীর শরীর না 'ঝেড়ে' নিজের শরীর নিজে 'ঝেড়ে' রোগীদের রোগ আরোগ্য ক'রে থাকেন।

১৫. আবদুল ফকীর। বয়স ৪২/৪৩ বছর। গ্রাম-রায়গ্রাম, ডাকঘর-মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা জেলা-যশোর। ইনি প্রধানত পশু-চিকিৎসক। বিশেষত গরুর রোগ চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতা বিদ্যমান। তবে মানুষের রোগ ও কিছু কিছু চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

১৬. আবদুর রাজ্জাক। বয়স ৪/৪২ বছর। গ্রাম-চরপুকুরিয়া, ডাকঘর-মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি দোয়া-তাবিজ ও গাছ-গাছড়ার সাহায্যে নানাবিধ রোগ চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

১৭. **আবদুল বিশ্বাস**। বয়স-৩৫/৩৬ বছর। গ্রাম-মাঝগ্রাম, ডাকঘর-ভাবনাহাটি, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী ছাড়ানোসহ অন্যান্য রোগেরও ক'রে থাকেন।

১৮. **আকবর আলী**। বয়স ৩০/৩২ বছর। গ্রাম-নিধিপুর, ডাকঘর, মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনিও জ্বিন-পরী তাড়ানোসহ নানারকম রোগ-চিকিৎসায় পারদর্শী।

১৯. **এদন আলী লস্কর**। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-মাঝগ্রাম, ডাকঘর-ভাবনহাটি, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি পালাজ্বরের চিকিৎসক। এঁর কাছে পালা জ্বরের চিকিৎসার জন্য গিয়ে রোগীর নাম ব:লে আসতে হয়। অতঃপর ঐ নাম উচ্চারণ ক'রে লস্কর সাহেব একটি লতার ডগা ঘুরিয়ে দিয়ে আসেন। তাতেই নির্দিষ্ট রোগীর জ্বর বন্ধ হয়। পরে ঐ গাছের গোড়ায় নাকি কিছুটা দুধ ঢেলে দিয়ে আসতে হয়।

২০. **'তালেবের মা'**। বয়স ৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম-কামার পাড়া, ডাকঘর-ভাবন হাটি, থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। এ মহিলা জ্বিন-পরী তাড়ানোসহ অন্যান্য প্রকার রোগেরও চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

২১. **'বারেকের মা'**। বয়স ৬০/৬২ বছর। গ্রাম-পাতরা, ডাকঘর-মাগুরা, থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি ভয় পাওয়া ও শিশুরোগ-চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষ।

২২. **বদন মোল্যা**। বয়স-৩৬/৩৭ বছর। গ্রাম-পাতরা, ডাকঘর-থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি প্রসিদ্ধ পশু-চিকিৎসক। গুরুর চিকিৎসাতেই সর্বাধিক পারদর্শী। তবে মানুষের নানাবিধ রোগ ও তিনি চিকিৎসা ক'রে থাকেন। এমনকি জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেতের 'আসর'ও ছাড়িয়ে থাকেন।

২৩. **নছর ফকীর**। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-ঘোড়ামারা, ডাকঘর-থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি প্রায় সব রকম রোগ চিকিৎসা ক'রেন। রোগ-চিকিৎসায় ইনি শুধু অলৌকিক উপকরণ নয়, কবিরাজি ঔষধাদিও প্রয়োগ ক'রেন। মাগুরা শহরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাবু মনোরঞ্জন বসুর নিকট ইনি কবিরাজি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ ক'রেন।

২৪. **দবীর ফকীর**। বয়স-৫৫/৫৬ বছর। গ্রাম-সাজিয়াড়া, ডাকঘর-থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনিও প্রায় সর্বপ্রকার রোগ চিকিৎসা ক'রে থাকেন। দোয়া-তাবিজ ও অন্যান্য লোকৌষধের সাহায্যেই চিকিৎসা পরিচালনা ক'রেন।

২৫. **আমীর সর্দার**। বয়স-৪০/৪২ বছর। গ্রাম-জয়পুর, ডাকঘর-লোহাগড়া, থানা-লোহাগড়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। ইনি জ্বিন-পরী ছাড়ানোসহ অন্যান্য রোগও চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

২৬. **আলতাফ আলী মীর**। বয়স ৭০/৭২ বছর। গ্রাম-ঘৌষগাতি, ডাকঘর-পুলুম, থানা-শালিয়া, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত-উপরি ইত্যাদি

চিকিৎসায় পারদর্শী। আগে পেশাদার চিকিৎসক ছিলেন, এখন এসব চিকিৎসা পরিত্যাগ ক'রেছেন। কৃষি এবং কাপ'ড়ের দোকানদারীই এখন তার জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন।

২৭. কাজী আবদুল খলিল। বয়স–৬৪/৬৫ বছর। গ্রাম–সাবেক খাটর, ডাকঘর–পুলুম, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি ভয় পাবার চিকিৎসা ক'রে থাকেন। 'ভয়' পেলে তা চিকিৎসার জন্য পানি প'ড়ে দেন। সে পানি খেলে প্রায়শ কোন অনিষ্ট হয় না।

২৮. আবদুল মজিদ সিকদার। বয়স ৬০/৬২ বছর। ইনি 'প্রমেহ' রোগ নিরাময়ের তদ্বির জানেন। একটি নতুন হাঁড়ি বা কলসীতে নদীর উজানি-ভাটোনি' পানি নিয়ে যেতে হয়। সে পানি তিনি প'ড়ে দেন। রোগীকে ঐ পানি ২১ দিন বা ৪১ দিন খেতে হয়। তাতে রোগ নিরাময় হয় ব:লে জনবিশ্বাস।

২৯. কালা মিয়া ফকীর। বয়স–৪২/৪৩ বছর। গ্রাম–শুঁইতলা, ডাকঘর পুলুম, থানা শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি সাপের ওঝা বা গুণীন হিসেবে প্রসিদ্ধ। মন্ত্র ও গাছ–গাছড়ার জাব প্রয়োগ দ্বারা ইনি সর্পবিষ চিকিৎসা ক'রেন। এঁর চিকিৎসা নির্ভরযোগ্য।

৩০. 'খোকার মা'। স্বামী–মরহুম কাজী ইসমাইল। বয়স–৬০/৬২ বছর। গ্রাম–সাবেক খাটর, ডাকঘর–পুলুম, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি শিশুদের চিকিৎসা–ব্যবস্থা প্রদান ক'রে থাকেন। গরম লাগা, পেট ব্যথা, বাত, মচকা, প্রসব সংক্রান্ত কার্য প্রভৃতি চিকিৎসাকার্যও ক'রে থাকেন। উত্তম 'ধাত্রী' হিসেবে সুনাম আছে। নানা রোগ–ব্যাধিতে পাড়া–প্রতিবেশীরা তাঁর পরামর্শ ও চিকিৎসা গ্রহণ ক'রে থাকে।

৩১. 'ফুল মিয়ার মা'। স্বামী–কাজী আবদুল খালেক। বয়স–৫৫/৫৬ বছর। ইনি চক্ষু প্রদাহ, ভাঙা–মচকা ঝাড়া, স্তন–প্রবাহ, অগ্নিদগ্ধ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন। তাঁর চিকিৎসায় সুফল লাভ হয়।

৩২. গণি ফকীর। বয়স ৩৫/৩৬ বছর। গ্রাম–সাবলাট, ডাকঘর–ছান্দড়া, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি কলেরা–বসন্তের তদ্বির দান ও জ্বিন–পরী–ভূত–প্রেত তাড়ানো চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৩৩. গরিবুল্লাহ। বয়স–৬০/৬২ বছর। গ্রাম–পাথরঘাটা, ডাকঘর–ছান্দড়া, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি প্রায় সব রকম রোগেরই চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৩৪. সামসুদ্দীন সিকদার। বয়স ৩৫/৩৬ বছর। গ্রাম–সিরেট (শ্রীহট্ট), ডাকঘর–আড়পাড়া, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি ফোঁড়া চিকিৎসায় দক্ষ। ফোঁড়া চিকিৎসার জন্য এর নিকট গিয়ে শুধু রোগীর নাম এবং তার কোথায় ফোঁড়া উঠেছে–তা ব:লে আসতে হয়। বিনা ওষুধ-পত্র, ঝাড়–ফূঁক, দোয়া–তাবিজে সে ফোঁড়া আরোগ্য হ'য়ে থাকে। তিনি এক স্থানের ফোঁড়া অন্য স্থানেও সরিয়ে দিতে পারেন।

৩৫. 'ছাদু ফকীর' (শেখ সাদেক আলী)। বয়স–৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম–রামানন্দকাঠি, ডাকঘর–পুলুম, থানা–শালিখা, মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি প্রধানত কলেরা–বসন্তের

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় পারদর্শী। অন্যান্য ব্যাধিরও সামান্য চিকিৎসা ক'রে থাকেন। এর পরলোকগত পিতা শেখ জহুরুল হক একজন বিশিষ্ট মহামারী চিকিৎসক ছিলেন।

৩৬. **হাতেম ফকীর**। বয়স-৫৫/৫৬ বছর। গ্রাম-শুঁইতলা, ডাকঘর-পুলুম, থানা-শালিখা, মহকুমা-মাগরা জেলা-যশোর। ইনি শিশুরোগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় পারদর্শী। কলেরা-বসন্তের তদ্বির, উপরি ছাড়ানো, মেহ-প্রমেহ ইত্যাদি রোগেরও চিকিৎসা ক'রে থাকেন। কৃষিকার্য ও চিকিৎসাই তাঁর জীবিকা নির্বাহের মূল অবলম্বন।

ii) হিন্দু লোক-চিকিৎসক

১. **'কোমল'**। বয়স ৫০/৫২ বছর। গ্রাম-আঁধার কোঠা, ডাকঘর-ধলগ্রাম, থানা-বাঘার পাড়া, মহকুমা-সদর, জেলা-যশোর। ইনি সাপের ওঝা বা গুণীন হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত। (ইনি ১৯৬১ সালে বর্তমান গ্রন্থকারের পিতার সর্প-দংশনের চিকিৎসা ক'রেন ও বিষ নামিয়ে তাকে সুস্থ ক'রেন।)

২. **জগদীশের স্ত্রী ওর্ফে, 'জগা ঠারোণ'**। বয়স-৫৫/৫৬ বছর। এঁর স্বামী বিখ্যাত ফকীর ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে লোক-চিকিৎসায় হাতেখড়ি প্রাপ্তা। শিশুরোগ, উপরি ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৩. **কালীপদ বিশ্বাস**। বয়স-৪০/৪২ বছর। গ্রাম-বড়খড়ি, ডাকঘর-মাগুরা, থানা-মাগুরা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি চোখের রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। তবে অন্যান্য রোগও কিছু কিছু চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৪. **ননী বিশ্বাস**। বয়স-৪৫ ৪৬ বছর। গ্রাম-বড়খড়ি, ডাকঘর-থানা ও মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি দাঁতের পোকা ফেলতে তথা দন্তরোগ নিরাময়ে পারদর্শী। অন্যান্য রোগও কিছু কিছু চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

৫. **গোবিন্দ বিশ্বাস**। বয়স-৪০/৪২ বছর। গ্রাম-ভাটোয়াইল, ডাকঘর-ভাবনহাটি, থানা-শালিখা, মহকুমা-মাগুরা, জেলা-যশোর। ইনি 'সাপের ওঝা' বা গুণীন হিসেবেই অধিক খ্যাত।

৬. **যোগীবর**। বয়স-৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম-কলাগাছি, ডাকঘর-কলাগাছি, থানা-লোহাগড়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। ইনিও 'সাপের ওঝা' বা 'গুণীন' হিসেবে খ্যাতিমান।

৭. **নিতাই গাছি**। বয়স-৩৫/৩৬ বছর। গ্রাম, ডাকঘর ও থানা-লোহাগড়া, মহকুমা-নড়াইল, জেলা-যশোর। ইনি পূর্বোক্ত যোগীবরের শিষ্য এবং 'সাপের ওঝা', বা 'গুণীন'। সর্পবিষ চিকিৎসায় এরা বেশ নির্ভরযোগ্য ব:লে জানা যায়।

৮. **প্রাহলাদ চন্দ্র বিশ্বাস**। বয়স ৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম-টিওরি, ডাকঘর-কোলা, থানা-কালীগঞ্জ (নলডাঙা), মহকুমা-ঝিনাইদহ জেলা-যশোর। ইনি বিশেষত বসন্তরোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক। এরোগ চিকিৎসার গাছ-গাছড়াজাত বড়ি প্রয়োগ ক'রতে দেখা যায়। তাতে রোগীর শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না এবং বসন্তের উদ্ভেদ বসে যায়। এই বড়ি প্রতিরোধ মূলকও। বসন্ত রোগ সেরে যাবার পর ইনি রোগীকে কলমী শাক ও পুঁটি মাছ রান্না ক'রে খাইয়ে চিকিৎসা শেষ ক'রেন।

৯. **নারায়ণ ওর্ফে 'নারাণ ফকীর'**। বয়স–৪৫/৪৬ বছর। গ্রাম–পাতরা, ডাকঘর–থানা ও মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি সাপের বিষ নামোনো, কলেরা বসন্তের তদ্বির দান, জ্বিন–পরী ভূতপ্রেত বিতাড়ন ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্ম ক'রে থাকেন।

১০. **'শরতের মামী'**। বয়স ৬৫/৬৬ বছর। গ্রাম–পাতরা, ডাকঘর, থানা ও মহকুমা–মাগুরা, জেলা–যশোর। ইনি উপর্যুক্ত নারায়ণের মাতা। আলোচ্য মহিলা শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, কলেরা–বসন্ত প্রভৃতি চিকিৎসা ক'রেন। তাছাড়া অবৈধ গর্ভপাত করানো, বন্ধ্যাত্বমোচন, গর্ভপাতরোধ, বশীকরণ ইত্যাদি কর্মেও সুপটু।

তথ্য–সংকেত

১. শিবকালী ভট্টাচার্য চিরঞ্জীব বনৌষধি–১ম খণ্ড, (কলি, ৩য় মুদ্রণ)–১৩৮৪), পৃ. ২৮৮।

২ দ্রষ্টব্য, বড়ু চণ্ডীদাস, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ–সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, (কলিকাতা–৭ম সংস্করণ, ১৩৬৮), পৃ. ৩৮।

৩. ঐ, পৃ. ৩৯।

৪. ঐ. পৃ. ৮০–৮১।

৫. দ্রষ্টব্য, রামাই পণ্ডিত, ধর্ম্মপূজা–বিধান, (কলিকাতা–১৩২৩), পৃ. ৪।

৬. ঐ, পৃ. ২৭।

৭. ঐ, পৃ. ১৯১–৯৮।

৮. ঐ, পৃ. ১২৩–'২৪।

৯. ঐ, পৃ. ১৬১।

১০. দীনেশচন্দ্র সেন–সম্পাদিত, মৈমনসিলহ্–গীতিকা, পৃ. ৩৪।

১১. ঐ, পৃ. ৩৩।

১২ ঐ, পৃ. ৯৫–৯৬।

১৩. ঐ, পৃ. ২১২।

১৪. ঐ, পৃ. ২২১।

১৫. ঐ, পৃ. ২২১।

১৬. ঐ, পৃ. ২৭৯।

১৭. ঐ, পৃ. ৫৩।

১৮. ঐ, পৃ. ৩২৪।

১৯. উদ্ধৃত আশরাফ সিদ্দিকী, লোক–সাহিত্য, ২য় খণ্ড, (ঢাকা–২য় সংস্করণ–১৯৮০), পৃ. ১৯৩।

২০. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩। ১৯৭৮ সালের ৩০শে জুলাই, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বরিশাল জেলার আব্দুর রশীদের ডেমরায় এসে মৃত রোগীর চিকিৎসার বিবরণ।

২১. শোভারাণী চক্রবর্তী, বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা, (মেদিনীপর–১৯৭৬), পৃ. ৫৭।

২২ ঐ, পৃ.।

২৩. See, O.P. jaggi, FM, Ibid, p.

২৪. দ্রষ্টব্য, ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার কর্তৃক ২৯শে মে ১৮৬৬ তারিখের 'দি ইংলিশম্যান' নাম পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত বিবরণ। অনুবাদক ওসমান গণি, পল্লী বাংলার ইতিহাস, (ঢাকা–১৯৬৯), পৃ. ১১১।

তৃতীয় অধ্যায়
লোক–চিকিৎসার প্রতি বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি

অধুনা বিশ্বব্যাপী লোক–চিকিৎসার প্রতি চিকিৎসা–বিজ্ঞানীদের বিশেষ দৃষ্টি পতিত হ'য়েছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা–বিদ্যাবিদগণ ক্রমশ এ কথা উপলব্ধি ক'রেছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মানব–জাতি চিকিৎসার জন্য এক রকম ওষুধ ব্যবহার ক'রেন না। বরং তাঁরা নানা ধরনের ওষুধের সাহায্যে নিরাময় লাভ ক'রেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানব–জাতি, যেসব বিচিত্র পদ্ধতিতে, বিচিত্র, রকম ওষুধের সাহায্যে আরোগ্য লাভ ক'রছে তার বাস্তব মূল্য, চিন্তাশীল চিকিৎসা–বিজ্ঞানীদের নিকট দিন দিন স্বীকৃতি লাভ ক'রছে। তাঁরা উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ হ'চ্ছেন যে, 'সত্য' কোন একটি পদ্ধতির মধ্যেই মাত্র বৃত্তবদ্ধ নয়। তাঁরা বনজ, জলজ, প্রাণীজ ও খনিজ ওষুধের প্রতি লোক–চিকিৎসকদের আগ্রণের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত তথ্যাদি সংগ্রহে নিয়োজিত হ'য়েছেন এবং সেগুলোর মূল্য ও নিরূপণ ক'রছেন। জেনিস রীড এ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে ব'লেছেন..."The principles of the Aboriginal medical system are basic to the most recent thinking of Western medical practitioners. The social and personal dimension of health which has increasingly come to be of concern within Western medicine in recent years has long been recognised by Aboriginal medicine."[১]

আদিম জাতির ও গ্রাম্য মানুষের এই লোক–চিকিৎসার প্রতি, পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কতিপয় কারণ আছে। তা হল—

১. রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত সিন্‌থেটিক ও আধাসিন্‌থেটিক ওষুধের নানারকম প্রতিক্রিয়া।

২. ঔষধজ রোগের ব্যাপ্তি এবং নতুন নতুন দূরারোগ্য রোগের উৎপত্তি।

৩. নকল, ভেজাল, নিম্নমান ও অপরীক্ষিত নতুন ওষুধের উৎপাদন ও তা বাজারজাতকরণ।

৪. নতুন ওষুধের উৎস–সন্ধান ও অনুন্নত দেশের সস্তা কাঁচামাল আত্মসাৎ।

৫. সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের লোকৌষধের প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রভাব।

মূলতঃ এই পাঁচটি কারণে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা শিকারী পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশসমূহ লোক–চিকিৎসার নতুন অধ্যয়নে মনোনিবেশ ক'রেছে।

পশ্চিমা চিকিৎসা–বিজ্ঞানীগণ আজ স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছেন যে, "There are many ways in which drugs may react in the body to produce unpredictable,

রোগে পরবর্তীকালে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রেও কোন ফললাভ ক'রা যায় না। এমন কি, কোন কোন ওষুধ পুনরায় প্রয়োগ ক'রাই সম্ভব হয়না। একে বলা হয় 'ট্যাকিফিল্যাক্সি'স। এরকম আরও প্রচুর ওষুধজ রোগ-বিস্তার দেখা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা চিকিৎসার বিজ্ঞান-নির্ভর আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হ'চ্ছে।

অনুন্নত দেশে অপরীক্ষিত, নতুন, নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের সরবরাহ পূর্বোক্ত বিপদসমূহকে যে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ঔষধ-ব্যবসা' সম্পর্কীয় একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়,—"ঔষধ রপ্তানী ক'রার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রস্তুতকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের শোষণের মাত্রা রেখেছে অব্যাহত। প্রতি বছর দেখা যায়, সাধারণ ঔষধের পাশাপাশি কিছু কিছু ঔষধ পরীক্ষামূলকভাবে জোর ক'রে আমাদের মত গরীব দেশগুলোকে কিনতে বাধ্য ক'রা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের চাইতে দেশের লোকদের ওপর সেই বিশেষ ঔষধটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রাই থাকে তাদের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবলীলাক্রমে তারা...অনুন্নত দেশের গরীব মানুষ গুলোকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার ক'রে থাকেন।"[৫] বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে টিসিবি কর্তৃক আমদানিকৃত ওষুধের মধ্যে ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর তৈরী 'লিগুেভ্যাল', 'ল্যামপ্রিন', 'সিবালিং' ইত্যাদি কয়েকটি ওষুধ ছিল এ রকমের।[৬]

অনুন্নত দেশে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু ওষুধের মান নির্ণয় ক'রবার ভাল ব্যবস্থা নেই বরং সাম্রাজ্য বাদী দেশগুলোর ওষুধ-কোম্পানির অনুমতি ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেবার এবং তা কার্যকরী ক'রারও এসব দেশের কোন ক্ষমতা থাকে না-সেজন্যে শুধু ঐসব নতুন ও ক্ষতিকর ওষুধ-ই নয়, 'সময়-অতিক্রান্ত ওষুধ'ও বাজারে চলতে দেয়া হয়। বাংলাদেশে এর উদাহরণস্বরূপ '১-৯-৭৪ তারিখে মেদাদ'-উত্তীর্ণ ইন্সুলিন, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সময়-নির্দিষ্ট 'হাইড্রোকর্টিসন', প্রভৃতি—মেয়াদ-উত্তীর্ণ হবার বহু পরও বাজারে কিনতে পাওয়া গিয়েছে।

এমনকি, ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার জন্য নিষিদ্ধ ওষুধ ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিদেশের বাজারে চালান দিয়ে মুনাফা লুটে থাকে। এ রকম ওষুধের মধ্যে ১৯৬২ সালে আমেরিকাতে নিষিদ্ধ 'নোভালজিন', 'এন্টারডায়োফর্ম' এবং পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ 'কম্বায়োটিক' এবং 'সেক্লোমাইসিন' প্রভৃতি ইনজেকশন ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবহার-এর অযোগ্য[৭] ঘোষণা ক'রা সত্ত্বেও আজও এগুলো আমাদের দেশে চ'লছে।

সর্বশেষে আধুনিক অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণ যেহেতু রোগীদের রোগ অনুযায়ী আগের মত মিকশ্চার, পুরিয়া, ট্যাব'লেট ইত্যাদি প্রস্তুত ক'রে দেন না, শুধুমাত্র বাজার থেকে কেনা যায়, এমন সব ওষুধের নাম ও ব্যবহারবিধি লিখে দেন না, শুধুমাত্র বাজার থেকে কেনা যায়, এমন সব ওষুধের নাম ও ব্যবহারবিধি লিখে দেন, সেজন্য ওষুধের অপক্রিয়ার কোন দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায় ব'লে মনে ক'রেন না। তিনি একমাত্র নির্ভর ক'রেন ওষুধ-ফেরীওয়ালার নিকট প্রাপ্তব্য প্রত্যেকটি ওষুধের নির্দিষ্ট, 'লিটারেচার'-এর উপরে। আর যেহেতু আমাদের দেশের প্রত্যেক অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের একটি ক'রে ওষুধের দোকানসহ 'প্রাকটিস-চেম্বার' থাকে,

সেই জন্য, যে 'ফেরীওয়ালা' যত বেশী কমিশন দিতে পারেন, তাঁর ওষুধ তত বেশী বাজার পায়। বাংলাদেশের মত প্রায় সব অনুন্নত দেশের তথাকথিত 'জিঞ্জিরা মেড' ওষুধ গুলোরও বাজারে কাটতির রহস্য এখানেই।

এসব কারণেই যে শুধু লোককৌষধের প্রতি পাশ্চাত্য দেশগুলোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছে— তা নয়, বরং নতুন ওষুধের উৎস আবিষ্কার এবং তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও তাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত ক'রেছে। এ প্রসংগে আমেরিকার ইলিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফার্মাকোগনোসি'র অধ্যাপক ড: নরম্যান আর ফার্নসওয়ার্থ–এর ১৯৭৪ সালের বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রা যায়। তিনি ব'লেছিলেন—"আমি আগামী পাঁচ বছরে প্রকৃতিজাত ওষুধ তৈরীর এক বিশেষ হার বৃদ্ধি আশা ক'রছি। আংশিকভাবে এর কারণের মধ্যে র'য়েছে প্রাকৃতিক খাদ্য ও পরিবেশের প্রতি সাধারণের আগ্রহ, অশোধিত ওষুধের নতুন নতুন উৎস এবং প্রয়োজনীয় উপাদান নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতি প্রভৃতি। আমাদের সবজি এবং পশুজগৎকে, ব'লতে গেলে, ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা স্পর্শই করিনি।"[৮] অতএব লোকহিত নয়, নতুন ওষুধের উৎস সন্ধান এবং অনুন্নত দেশের কাঁচামাল সস্তায় আহরণ ক'রে বিরাট মুনাফার সম্ভাবনা থাকাতেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো লোকৌষধ সম্পর্কে আগ্রহী হ'য়ে উঠেছে।

বিশ্বব্যাপী এই আগ্রহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হ'য়েছে..."নতুন এবং উন্নততর প্রাকৃতিক ওষুধের সন্ধান শুধু জঙ্গলে, মরভূমিতে কিংবা টেস্টটিউবেই ক'রা হয় না, প্রাচীনকালের চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথি এবং উপকথার মধ্যেও এইসব লতা–পাতার সন্ধান ক'রে ফেরা হয়।... (চীনে) বড় বড় নাগরিক হাসপাতালের সুশিক্ষিত চিকিৎসক'রা প্রাদেশিক কলিটিগুলোকে সাহায্য ক'রছেন। এ সমস্ত কমিটি গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তাররা যে সব গাছ–গাছড়ার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন সেই সমস্ত উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং প্রসেস ক'রে থাকে।...ড: জোনাথন হাটওয়েল প্রাচীন কালের চিকিৎসা বিষয়ক পুথি ঘেঁটে এবং উপকথা থেকে প্রায় তিন হাজার জাতের উদ্ভিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন। (এবং) নতুন নতুন জাতের উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।... ড: শুল্‌জ চল্লিশ বছর ধরে দুষ্প্রাপ্য আর্কিড এবং বন্য রাবার থেকে শুরু ক'রে ভারতীয় উপজাতির ঘুমপাড়ানি উদ্ভিদ খুঁজে ফিরেছেন।... উদ্ভিদ সংগ্রহ অভিযানে আমাজানের অববাহিকায় ড: শুল্‌জ এক নাগাড়ে কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত পুরাতন উপজাতির সাথে বাস ক'রেছেন। ...তিনি যে সব ওষুধী সংগ্রহ ক'রেছেন, পরবর্তী সময়ে তা ওষুধ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ামক হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়েছে। সব চাইতে অবাক হ'তে হয় যে, এইসব ওষুধী অনেক আগে থেকেই আমাজান অববাহিকায় বিভিন্ন উপজাতি নানা উপায়ে ব্যবহার ক'রে আসছে।"[৯] এরূপে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের 'ঔষুধ অভিযাত্রী'রা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো ছেয়ে ফেলেছেন। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন..."প্রাচীন ব্যবিলনীয়, অ্যাসেরীয় এবং মিশরীয় চিকিৎসা–পদ্ধতির সাথে তুলনা ক'রলে সেদিনের ব্যবহৃত ওষুধীকে আজও প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হবে। যেমন নীলনদের ধারের মানুষরা 'রাত–কানা' রোগ সারাতে ঝলসানো বৃষের (?) যকৃৎ খেত। আধুনিক বিজ্ঞানেও বলা হয় যকৃত ভাইটামিন 'এ'

র'য়েছে। আর ভাইটামিন 'এ' হ'চ্ছে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।"[১০] উল্লেখযোগ্য যে, 'রাতকানা' রোগে বৃষ কিংবা ভেড়ার যকৃৎ আহার ক'রা আর ভিটামিন 'এ' খাওয়া এক কথা নয়। অতএব, লোকৌষধের কাছে ফিরে যাওয়া আর লোকৌষধ থেকে প্রয়োজনীয় তীব্র ক্রিয়াত্মক উপাদান নিস্কাশন ক'রা—দু'টি পৃথক ব্যাপার।

এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রয়োজনীয় উপাদান নিস্কাশন নয়, বরং মূল পদ্ধতিটাকেই পশ্চিমী অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার ক'রেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চীনে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড়ভাঙা জোড়া লাগাতে পশ্চিমী চিকিৎসকদের মত প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ ক'রে অনড় অবস্থায় রাখা হয় না। চীনারা এরকম ক্ষেত্রে, ভাঙা স্থানে একটি বিশেষ গাছের পাতা চেপে ছোট একখানা পাত বেঁধে ছেড়ে দেয়। তাতে অঙ্গটি পুরোপুরি নাড়ানোও যায় না, আবার একেবারে আড়ষ্টও থাকে না। এতে হাড় জোড়া লাগে দ্রুত। সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে পশ্চিমা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী ভাঙা হার জোড়া লাগতে যেখানে ৮৫দিন সময় লাগে সেখানে চীনা লোকৌষধের সঙ্গে আধুনিক ঔষধের মিলিত প্রয়োগে সময় লাগে মাত্র ৫২ দিন। তাই চীনা চিকিৎসাবিদ হো পেং ইয়ক ব'লেছেন—"Combined use of traditional medicine and western medicine has eliminated the necessity of surgery in some clinical cases. One report concerns the successful removal of gallstones under four centimetres in diameter with herbal medicine. It is said that 82% of the over six hundred patients with gallstones in the common bile duct admitted to the Qingdao Hospital in Shandong Province during the past few years had their stones removed without surgery. Acute abdoninal diseases have also been successfully treated with combined traditional and western methods."[১১]

শুধু গণপ্রজাতন্ত্রী চীন দেশে নয়, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েৎ ইউনিয়নেও লোক-চিকিৎসার কোন কোন বিষয় আজও অনুশীলিত হ'য়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রগামী সোভিয়েৎ ইউনিয়নে এখনও জোঁক লাগিয়ে প্রাচীন রীতির রক্তমোক্ষণ পদ্ধতির চিকিৎসা পরিত্যক্ত হয়নি। সেদেশ থেকে আজও উঠে যায়নি টোটকা রীতির গাছ-গাছালির শিকড়-বাকড়ের ব্যবহার। বরং সোভিয়েৎ ইউনিয়নে এই বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগেও 'কাপিং-লিচিং' পদ্ধতির পুরোণো চিকিৎসার পুন: প্রবর্তনের গবেষণা চ'লছে। এধরনের লোক-চিকিৎসার সমীক্ষা ও লব্ধ ফলাফল থেকে গ্রহণ-বর্জন চ'লছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও।

আমাদের দেশেও লোক-চিকিৎসার প্রতি সসংকোচ দৃষ্টিপাত ক'রা হ'চ্ছে। কেননা "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের দিকে তাকালে একটা করুণ চিত্রই দেখা যায়। তিনবছর আগের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কয়েকটি মূল পরিসংখ্যান তুলে দিচ্ছি। প্রতি ১০ হাজার রোগীর জন্য ১ জন ডাক্তার ও হাসপাতালে একটি বেড, প্রতি ৮০ হাজার রোগীর জন্য ১ জন নার্স। জনসংখ্যার প্রতিজনের মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ৫ টাকা। দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তী তিন বছরে প্রায় হাজার তিনেক ডাক্তার বৈধ ও অবৈধভাবে

দেশত্যাগ ক'রেছেন। চ'লে গেছেন বহুনার্স প্যারামেডিক টেকনিশিয়ান। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা বিশেষজ্ঞদের দেশত্যাগ।... ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক টেকনিশিয়ান এখনো যা'চ্ছেন একে একে।... দেশের ছেলে ডাক্তার হ'য়েই স্বদেশ থেকে পালাচ্ছে।"[১২] বলাবহুল্য ১৯৭৮ সালের এই বক্তব্য বর্তমানকালের জন্যও প্রযোজ্য।

আমাদের দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের চিকিৎসা লাভের ধারার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, যে-কোন রোগ প্রথমত তাঁরা পারিবারিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কিংবা প্রতিবেশী বুড়ো-বুড়ীর পরামর্শ অনুযায়ী গাছ-গাছালির রস পান, শিকড়-বাকড় ধারণ, পট্টি বা জাব ইত্যাদি টোটকা-চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য ক'রার প্রয়াস পান। তাতে না সারলে যান, গ্রামের মোল্লা-মৌলবী কিংবা এলাকার পীর-ফকীর, ওঝা-বৈদ্যের কাছে। সে-সব তদ্বিরে উপকার না হলে তাঁরা যান কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ কিংবা, হাতুড়ে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, যিনি হয়তো দুমাস আগেও কোন এল.এম.এফ. কিংবা 'পাশ ক'রা ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন তাঁর কাছে। তাঁর চিকিৎসায় ফল না হ'লে, সামর্থ্য থাকলে যান শহরে, এম. বি. বি. এস কোন ডাক্তারের কাছে কিংবা হাসপাতালে। আর সে সামর্থ্য নেই যাঁদের, তাঁরা ক'রেন মানত-প্রার্থণা, দোয়া-কালাম ইত্যাদির চিকিৎসা।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর টাকার ওষুধ ও কাঁচামাল আনা সত্ত্বেও এবং বাংলাদেশে দেড় শতাধিক (১৬০টি?) ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ৮০ কোটি টাকায় ওষুধ উৎপাদন ক'রলেও দেশের মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় ওষুধের দুর্মূল্য ও দুর্লভতা বেড়েই চ'লেছে দিন দিন।[১৩] এ সমস্যা ছাড়াও অ্যালোপ্যাথি ওষুধের আভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে এবং বিদেশীদের প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ ব'লছেন—"আমাদের দেশজ ওষুধের পুনর্বিবেচনা এবং যথাযথ ব্যবহার আজকে অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে উঠেছে।" এটা যে 'চুলকানি' বা ধ্বনিই শুধু, তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, এখনও পর্যন্ত এমন কোন সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, ল্যাবরেটরি, সংঘ, সংস্থা কিংবা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি-যারা লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ, গবেষণা কিংবা অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাতো দূরের কথা, ঘরের কাছের গাছের পাতায় কি উপক্ষার লুকিয়ে আছে, সেটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন কিংবা দেখে থাকলেও তার ফলাফল জনসমক্ষে উপস্থিত ক'রেছেন কিনা সন্দেহ। অথচ চট্টগ্রামে ইউনেস্কো'র উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ রিসার্স ল্যাবরেটরি' স্থাপিত হ'য়েছিল দেশীয় চিকিৎসার-ই তথ্য যাচাই ক'রতে। শোনা যায়, পি.জি. এবং 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে'ও এ ধরনের গবেষণা ক'রার উপযোগী বিভাগ আছে। কিন্তু তাদের কার্যকলাপের কোন পরিচয় পাওয়া যায়না।

তথাপি ড: আবদুল মান্নান, ড: এ.কে. আজাদ চৌধুরী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবণতা বশেই স্বীকার ক'রেন যে, "প্রাণী দেহে ক্রিয়াশীল যে সব রাসায়নিক অণু দিয়ে আধুনিক ঔষধ প্রস্তুতঃ সেই সব রাসায়নিক উপাদান প্রায় সব লোকায়ত ঔষধে অপরিশোধিত অবস্থায় অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। তাই কার্যকারিতার দিক থেকে এই শ্রেণীর ঔষধকে একদম দূরে ফেলে দেবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।"[১৪] বলা বাহুল্য,

বাংলাদেশের অধিকাংশ ডাক্তার ও শিক্ষিত লোকের মনে লোকায়ত ওষুধ, লোক–চিকিৎসা ও লোক–চিকিৎসক সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। তাঁদের এ সম্পর্কে হাস্যকর মূর্খতা পাথরের মত অনড় এবং সেটাকে তাঁরা 'বিজ্ঞানমনা' চিন্তাভাবনা ব'লে জাহির ক'রেন। এসব অজ–পণ্ডিত–বিজ্ঞানীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদেশী কোন রাষ্ট্র বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি যদি দেশীয় চিকিৎসা বা লোক–চিকিৎসা সম্পর্কে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রেন কিংবা তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান–তখন এইসব ব্যক্তিই লোক–চিকিৎসার মহিমা ঘোষণায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু সম্মেলন–ভবন থেকে বেরিয়ে যে–কে সেই।

তাই দেখা যায়, ১৯৭৭ সালের পহেলা এপ্রিল শ্রীলংকার কলম্বোয় 'দক্ষিণ পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে' প্রত্যেক সদস্য–রাষ্ট্রকে "দেশীয় চিকিৎসা–পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান, উন্নয়ন, পূনর্বাসন ও গ্রামবাসীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক প্রয়োগের সুপারিশ"[১৫] ক'রা হ'লেও উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত বাংলাদেশ আজও সে সম্পর্কে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রেনি। অতঃপর ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল চীন ভ্রমণ ক'রে ফিরে এসে চীনা লোক–চিকিৎসার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রা সত্ত্বেও বাংলাদেশের লোক–চিকিৎসার উন্নয়ন ও পরিশীলনের আজও কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই ভ্রমণের প্রায় সপ্তাহকাল পূর্বে ঢাকাতে বাংলাদেশ সরকার, 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' ও 'ইউনিসেফ'–এর যৌথ উদ্যোগে "প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় দেশীয় চিকিৎসার প্রয়োগ" সম্পর্কে একটি জাতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ; কবিরাজি, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা–পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ক'রা হয়, লোক–চিকিৎসা সম্পর্কে কোন আলোচনা ক'রা হয়নি। লোক–চিকিৎসা ও দেশীয় চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্যই প্রায়শঃ হেকিমী–কবিরাজী–পীরালী–টোটকা ইত্যাদি, লোক–চিকিৎসা ব'লে নির্দেশ ক'রা হয়।

তথাপি দু'একজন প্রণ্ডিত বাংলাদেশের লোক–চিকিৎসার একমাত্র লতা–গুল্মজ ওষুধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এগুলোর সংরক্ষণ, সন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রেছেন। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: এ.কে. আজাদ চৌধুরী "ঔষধ সংকট নিরসনে লোকায়ত ঔষধের ভূমিকা" সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে 'লোকায়ত' ঔষধ থেকে রোগারোগ্যকর 'উপাদান নিস্কাশন–এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন এবং 'লোকায়ত' ওষুধ প্রস্তুতের দু'টি সমস্যার উল্লেখ ক'রেছেন। তার একটি হ'ল—"মান নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের জটিলতা আর দ্বিতীয়টি হ'ল ঔষধের কার্যকর উপাদানের ক্ষণস্থায়ীত্ব।"[১৬] এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড: আবদুল মান্নান পূর্বোক্ত ওয়ার্কশপে পঠিত প্রবন্ধে তথাকথিত 'দেশীয় চিকিৎসা'র প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রে ষোল দফা সুপারিশের উল্লেখ ক'রেছেন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—

১. "প্রতিটি থানায় সাধারণ রোগের শ্রেণীবিভাগ, ঔষধের প্রয়োজন ও চাহিদা নিরূপণ ক'রে, সেখানকার স্থানীয় গুল্ম ব্যবহার ক'রে ছোট আকারের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প স্থাপন ক'রতে হবে, যাতে স্থানীয়ভাবে ঔষধ চাহিদা মাফিক উৎপন্ন হয়।"

২. "সনাতম ঔষধের মূলকথা ও সূত্র আধুনিক চিকিৎসা কোর্সের অন্তর্ভূক্ত ক'রতে হবে এবং সাথে সাথে চিকিৎসকদের ৫-৬ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দ্বারা আধুনিক চিকিৎসার মূলনীতি সম্বন্ধে অবহিত ক'রা দরকার।"

৩. "অপারেশনাল গবেষণা দ্বারা কবিরাজ, হাকীম, ধাই, হাজাম-এদের প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ক'রতে হ'বে।"

৪. "স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বনজ সম্পদ দ্বারা স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ঔষধবিধি তৈরী ক'রে সাধারণ রোগ দমনে সফলতার পুনঃমূল্যায়ন।"

৫. "প্রতি থানায় প্রাপ্ত মেডিক্যাল প্লান্ট চিহ্নিত ক'রা।"

৬. "দেশীয় কৃষ্টি ঐতিহ্য ও Folk-loric medicine সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও সংবিধানের জন্য নৈতিকতা বজায় রাখার আন্দোলন গড়ে তুলতে হ'বে এবং এ সম্বন্ধে জার্নালের ব্যবস্থা ক'রতে হবে।"

৭. সব সিস্টেমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে "একটি সার্বজনীন কো-অর্ডিনেশন বোর্ড গঠন ক'রতে হবে... ....।"[১৭] ইত্যাদি।

ড: মান্নান-এর এসব মূল্যবান সুপারিশের অনেকাংশ অবশ্য লোক-চিকিৎসার বহু ক্ষেত্রে কার্যকর ক'রা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী লোকৌষধের বনজ অংশটির যে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব-তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এমনিভাবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই বাংলাদেশেও লোক-চিকিৎসার এবং দেশীয় চিকিৎসার প্রতি দিন দিন অধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রা হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে লোক-চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা

এবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লোক-চিকিৎসার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসার বর্তমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা ক'রা বিধেয়।

বিভিন্ন দেশের লোক-চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা আলোচনা ক'রতে গিয়ে সর্বপ্রথম আদিম জাতি অধ্যুষিত আফ্রিকার লোক-চিকিৎসার আধুনিক রূপ সম্পর্কে আলোকপাত ক'রা আবশ্যক।

আফ্রিকার লোক-চিকিৎসা

আফ্রিকা আদিম অন্ধকার থেকে ক্রমশঃ আলোকের দিকে যে এগুচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অগ্রগতি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। ফলে, ক্রমাগত যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘ'টছে, তার-ই পাশাপাশি পরিবর্তন হ'চ্ছে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কার, বিশ্বাস ও আচার আচরণেরও। আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই আজও অনুন্নত, অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ জীবনে অবস্থিত। তাই তাদের মধ্যে প্রচলিত চিকিৎসা-রীতিও প্রাচীন সংস্কার-বিশ্বাস দ্বারা আকীর্ণ। রোগের

উৎপত্তি সম্পর্কে দৈবী, আধি-দৈবী, আধিভৌতিক ও ভৌতিক ধারণা এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা আজও তাদের মধ্যে প্রচলিত র'য়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্ হোবেল ও ফ্রস্ট-এর 'কালচারাল অ্যান্ড সোশাল অ্যানথ্রোপলজি'তে প্রদত্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের মধ্যে প্রচলিত একটি চিকিৎসা-পদ্ধতির ছবি থেকে দেখা যায়—'একজন জুলু লোক-চিকিৎসক জনৈক ব্যক্তির 'মাথার যন্ত্রণা' (?) তার কানের মধ্যে জন্তুবিশেষের শিং দ্বারা তৈরী শিঙা লাগিয়ে আরোগ্য ক'রছেন।[১৮] এধরনের চিকিৎসা শুধু জুলুদের মধ্যে নয়—আফ্রিকার 'বুশম্যান', টোঙ্গা', 'নুয়ের', 'ডাহোমীয়', 'নিয়াকিউসা' প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিদ্যমান। দক্ষিণ আফ্রিকার লতা-গুল্ম-লোকৌষধের মধ্যে 'ডেভিলস ক্ল' বা 'দানবনখী' গাছ বাত-রোগের বিশিষ্ট ঔষধ।[১৯] এ ধরনের লতা-গুল্মজ লোকৌষধ ব্যতীত 'সঙ্গীত', 'নৃত্য', 'প্রার্থণা' ও 'মানত' ইত্যাদির. সাহায্যেও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণ চিকিৎসাকার্য সমাধা ক'রে থাকেন। আর.বি. টেইলর বুশম্যানদের মধ্যে প্রচলিত চিকিৎসাদায়ক লোক-সঙ্গীতের উল্লেখ ক'রেছেন। এধরনের গান 'শ্যামন' বা লোক-চিকিৎসক স্বপ্নে লাভ ক'রেন এবং জাগরণের পর তিনি তা অন্যদের শেখান। যখন কোন রোগীকে চিকিৎসা ক'রা হয়, তখন একটি আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে তার পাশে সেই রোগী বা রোগিনীকে বসিয়ে দলবদ্ধভাবে উক্ত সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং তালে তালে বাদ্য ও নৃত্য ও চ'লতে থাকে। আর—"during the dance the shamans suck evil from their patient's bodies and send it away."[২০]

এ ধরণের সঙ্গীত, নৃত্য ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা অন্যান্য আফ্রিকান জনগোষ্ঠীতেও বিদ্যমান। মন্ত্র-মানত ইত্যাদি প্রয়োগের নিদর্শন সুসভ্য মিশরীয়দের মধ্যে ও বর্তমান। মিশরীয় লোক-চিকিৎসায় 'ভেড়ার যকৃতে'র প্রভাব প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন। আফ্রিকার মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধান অঞ্চলসমূহে লোক-চিকিৎসায় ইসলামী উপকরণ বিশেষতঃ আরবী আয়াতাদির ব্যবহারেরও নিদর্শন র'য়েছে। মিশর, সুদান, মরক্কো, লিবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত লোক-চিকিৎসায় প্রাচীন উপাদানের সঙ্গে উক্ত ইসলামী উপকরণের সংমিশ্রন বিদ্যামান।

অস্ট্রেলিয়ার লোক-চিকিৎসা

আফ্রিকার মত অস্ট্রেলিয়ারও আদিম জাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত চিকিৎসাকেই লোক-চিকিৎসা ব'লে নির্দেশ ক'রা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে কিম্বার্লি উপত্যকার দক্ষিণে বসবাসকারী গুগাজা আদিবাসীদের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক জরীপ চালাতে গিয়ে 'বালগো মিশন'-এর সদস্য ফাদার অ্যান্টনি আর পাইল তাদের মধ্যে প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতিরও তথ্য সরবরাহ ক'রেছেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়-এদের মধ্যে চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে হলুদ ও লাল রঙ ব্যবহৃত হয়। উভয়ের মধ্যে লাল-রঙ-এর ব্যবহার-ই অধিক। সাধারণতঃ ক্ষত বা আহত হ'লে, তা নিরাময়ের জন্য লাল রঙ প্রযুক্ত হয়। কিভাবে তাঁরা এ রঙ প্রয়োগ ক'রেন, সে সম্পর্কে জনৈক গুগাজাকে জিজ্ঞেস ক'রা হ'লে, তিনি যা ব'লেন, তা টেপ-রেকর্ডে বাণীবদ্ধ ক'রা হয়। উক্ত তথ্য থেকে জানা

যায়—বর্শার আঘাতে উৎপন্ন ক্ষত চিকিৎসার জন্য "Cover the spear wound with warm leaves. Chew ochre and spit it out all over the wonnd, wet it (in the mouth) and spit it out all around. The wound will soon dry up. Sing and it will become well The wound will from a scab and the skin on the wound will soon fall off."[২১] পাইল ব'লেছেন-ক্ষত কিংবা কাটা ঘা-এর ওপর থুথু নিক্ষেপ অস্বাস্থ্যকর ও আমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু মনে রাখা উচিত ক্ষতাদির ওপর ওষুধ ছড়িয়ে দেবার মত কোন যন্ত্রপাতি আদিবাসীদের নেই।

এমনিভাবে গাছের পাতা চিবিয়ে বা লাল রঙ মুখের লালার সঙ্গে মিশিয়ে (কুলি ক'রে) তারা ক্ষতে প্রয়োগ ক'রে। সেই সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে 'মন্ত্র'।

লাল রঙ মাটিতে, পাথুরে বাটিতে কিংবা কাঠের পাত্রে ঢেলে পানি মিশিয়েও নানা রোগে নানাভাবে ব্যবহার ক'রে তারা। এ রঙের মলম বানিয়ে এবং এর সঙ্গে ছাই, চর্বি ইত্যাদি মিশিয়ে ; তারা অগ্নিদগ্ধ ক্ষত, পাকস্থলীর বেদনা, পক্ষাঘাত ইত্যাদিও আরোগ্য ক'রে থাকে। এমনকি, নবজাত সন্তানের শরীরেও তারা উক্ত পদার্থ প্রয়োগ ক'রে থাকে। কোন কোন ভ্রমণকারীর রচনা থেকে ক্ষত-চিকিৎসায় কাদার বিশেষ প্রলেপ ব্যবহার-এর ও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব চিকিৎসায় সর্বদাই সঙ্গীত (মন্ত্র ?) ব্যবহৃত হয়।

গুগাজাদের চিকিৎসারীতি সম্পর্কে পাইল, 'মুনিজা' নামক জনৈক মধ্য বয়স্কা মহিলার যে বিবৃতি উদ্ধৃত ক'রেছেন তা নিম্নরূপ—

"They rub with red ochre, they sing, they rub red ochre on the stomach, on the navel, on the legs of a person who can't get up, thwy rub on ash, they rub where the pain is inside. They tie up, the head and both arms with a hair belt in order that he may get well. They sing and lay the person down.They sing and he becomes light (well). They put him in the sun in the middle of the day, sweat comes out of him. He scratches his head, he remains quiet, they sing and then leave him to sleep. He gets up, scratches himself and feels good. They give him water and bush tucker. He is well again. (Text recorded 21.03.78)."[২২]

এমনিভাবে, গাছ-গাছালির পাতা, লাল রঙ, কাদানা মাটি, ছাই, গান বা মন্ত্র সূর্যোত্তাপ, মস্তক-বন্ধন ইত্যাদির সাহায্যে তো বটেই আরও অনেক উপায়ে তারা রোগারোগ্য ক'রে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার আর্নহেম ল্যান্ড-এর উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে ড: জেনিস রীড নামক সিড্‌নি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী ব'লেছেন—'এরা কেউ সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লে আদিবাসী কোন চিকিৎসক 'বা ওঝাকে ডাকা হয়। ঐ অঞ্চলে এরকম অনেক ওঝার সাক্ষাৎ পায়া যায়।

সাধারণতঃ মনে ক'রা হ'য়ে থাকে যে, ওঝারা দৈবশক্তি সম্পন্ন এবং তারা এ শক্তি লাভ ক'রে থাকে জ্বিন-পরী-ভূত-প্রেতের সহায়তায়। ওঝারা যখন চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ ক'রেন তখন এইসব অশরীরী শক্তিও তাদের সহায়ক হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মাও এদেরকে নানা রকম আরোগ্যকরী বস্তু প্রদান ক'রে থাকে। কিন্তু "The healer's main task is to counter the effects of sorcery and to heal the patient. He may also, though, be asked to define the identiy of the sorcerer when some is critically ill or has died."[২৩]

অতএব যাদুক্রিয়া বা বাণ-টোনা, বশীকরণ, স্বপ্নাদ্য ওষুধ ইত্যাদিও অস্ট্রেলিয়ার জনসমাজে প্রচলিত র'য়েছে। এজন্য অস্ট্রেলীয় ওঝারা রোগ চিকিৎসায় বহুমুখী ভূমিকা পালন ক'রে থাকেন। রীড এর কারণ স্বরূপ ব'লেছেন—আদিবাসী ওঝার বহুমুখী ভূমিকার হেতু রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের বহুবিধ ধারণার মধ্যে নিহিত। তাঁরা মনে ক'রেন—মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় শুধু ব্যক্তিগত কর্ম-পাপের জন্য নয়-সামাজিক পাপের ফলেও। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, বিধি-অবিধি এবং আচার-অনাচারের ফলেই 'রোগ' দেখা দেয়। এজন্য সে-সব রোগ-চিকিৎসারও বিবিধ পন্থা অবলম্বন ক'রা আবশ্যক হ'য়ে প'ড়ে। তাই বৃক্ষ-লতা, মন্ত্র, সঙ্গীত, নানা আচার-আচরণ, রোগ-দেবতার বা মৃতের আত্মার তুষ্টি ইত্যাদিরও সহায়তায় ওঝারা চিকিৎসা ক'রে থাকেন।

আমেরিকার লোক-চিকিৎসা

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোক-চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ সুলভ নয়। আমেরিকান 'লোকভাষ্যবিদ' ও 'নৃতত্ত্ববিদ'গণ উত্তর আমেরিকার 'লোক-চিকিৎসা' সম্পর্কে যতটা আলোকপাত ক'রেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার আধুনিক আমেরিকানদের নিম্ন ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক-সমাজের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে তার শতাংশের একাংশও আলোচনা ক'রেননি। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক সুসভ্য আমেরিকাতে লোক-চিকিৎসার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে ধনী, উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া সত্ত্বেও, দেশটি যে শ্রেণীবিভক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য "American cultural responses vary among families, socio-economic levels and other social divisions, and from one time level to another. Middle class and upper class Americans customarily seek professional medical advice and supervision."[২৪]

পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর গরীব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের প্রাচীন রীতিনীতি বিশ্বাস ও আচরণ অনুযায়ী প্রথমতঃ রোগমুক্তির প্রয়াস পায়। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের ধারণা অনুযায়ী ক্ষতিকর বহির্বস্তুর প্রভাবেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। এই বস্তু অদৃশ্য অণুজীব (জীবাণু) কিংবা জীবনের খুব নিকটবর্তী। আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ও পেশাদার চিকিৎসকগণ রাসায়নিক পদার্থ খাইয়ে কিংবা শরীরে ঢুকিয়ে অথবা জটিল শল্যচিকিৎসার দ্বারা রোগীকে নিরাময় ক'রেন।[২৫] অন্যপক্ষে পশ্চাৎপদ আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান কিংবা উত্তর আমেরিকার

উপজাতীয় জনসাধারণ সমস্ত পশ্চাৎপদ জনগণের মতই 'রোগ'কে নৈসর্গিক, আভিচারিক, আধি দৈবী (ভূত–প্রেতাদি দ্বারা উৎপন্ন) ও দৈবী (রোগ–দেবতা ও দেবাত্মা প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত) ব'লে মনে ক'রেন। এঁদের নিকট পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়সমূহের পার্থক্য খুব বেশী নয়। তাই নৃতত্ত্ববিদ্ জি.পি. ক্যাম্টিল লিখেছেন—"For most American Indian societies there is no such clear-cut dichotomy, and the worlds of the natural and the supernatural cannot so easily be seperated. Hunging and planting and the curing of disease are all as much religious as practical acts, and belief and practice grow up togather...People believe in what we call magic in the same way we believe in science."[২৬]

বস্তুতঃ সমস্ত দেশের সমস্ত রকম চিকিৎসা–পদ্ধতির মতই আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য লোকগোষ্ঠীর নিজস্ব চিকিৎসাতেও 'কারণ' নিরসনের মধ্যেই চিকিৎসার প্রয়াস লক্ষণীয়। এ জন্য রোগ নিরূপণের নানাপ্রকার লৌকিক রীতিও তাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের দেশে কোন কোন রোগ নিরূপণের সুপরিচিত 'হাত চালান' দেওয়া পদ্ধতি আমেরিকান 'নাভাহো' উপজাতির মধ্যে দেখা যায়। যে কোন ব্যক্তির–ই হাত চালান দেওয়া যায় না, একমাত্র 'তুলারাশি' সম্পন্ন ব্যক্তি এ কাজের উপযুক্ত। এ ধরনের 'হ্যান্ড ট্রেম্বলার'রাই নাভাহোদের রোগ নির্ধারণের কাজে লেগে থাকে। এছাড়া স্বপ্ন ও অন্যান্য লৌকিক উপায়েও তারা 'রোগ'–নির্দেশ ক'রে থাকে। 'ঘোস্ট সিকনেস' বা জ্বিন–পরী ও ভূতপ্রেতে ধরার চিকিৎসাও নাভাহো লোক–চিকিৎসক বা 'শ্যামন'গণ তাঁদের নিজস্ব–পদ্ধতিতে মন্ত্র, প্রার্থনা, নৃত্য প্রভৃতির দ্বারা আরোগ্য ক'রেন। 'মৃগী' জাতীয় উন্মাদ রোগকেও এই পর্যায়ে ফেলা হয়। নাভাহোদের বিবেচনায় উপদংশ রোগ হ'ল–অজাচারেচ্ছার ফল। চেরকীদের বিবেচনায় শিকার ক'রতে গিয়ে ভল্লুক বা অন্য কোন প্রাণীর আত্মার কোপে প'ড়লে 'ভালুকজ্বর' হ'য়ে থাকে। তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানত, প্রার্থনা, কোরবাণী ইত্যাদি ক'রাই বিধি।[২৭] ট্রোবিয়েণ্ড দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা হঠাৎ আবির্ভূত, তীব্র ও মৃত্যু অবধারক রোগগুলোকে ভূতপ্রেতের দ্বারা সৃষ্ট ব'লে মনে ক'রে। তাদের মতে 'মহামারী' সমূহ দৈবী শক্তি–প্রদত্ত। আমাদের দেশের ওলা–শীতসার মতই ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা 'মহামারী'র দেব–দেবতা আছে ব'লে মনে ক'রেন। তারা ট্রোবিয়েণ্ড গ্রামে আগমন ক'রলেই অধিবাসীরা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে। উক্ত রোগ থেকে ওষুধের দ্বারা রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র 'যাদুবিদ্যা'র সাহায্যেই এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ দ্বীপের ওঝা–বৈদ্যগণ মন্ত্রপূত গাছ–গাছড়াও চিকিৎসার নিমিত্ত ব্যবহার ক'রেন।[২৮]

এক–ই রকম লোক–চিকিৎসার ধারা 'নেটসিঙ্ক', 'সুয়াই', 'হিডাসা' প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও বর্তমান।

ইউরোপীয় (তুর্কী) লোক–চিকিৎসা

ইউরোপ উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য হওয়া সত্ত্বেও বহু ইউরোপীয় ভূখণ্ডে এখনও লোক–চিকিৎসা কোন না কোন প্রকারে টিকে আছে। ঐসব অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ ক'রে তুর্কী

লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে একটি চমৎকার তথ্য-বহুল প্রবন্ধ লিখেছেন মার্গারেট বেইনব্রিজ। এ প্রবন্ধে তিনি এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রাচীনতম উল্লেখ-এর সন্ধান দিতে গিয়ে ১৭১৭ খ্রী: লিখিত লেডি এম, ডব্লিউ মন্টেগুর একটি পত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পূর্বে আলোচিত এই পত্রে তুরস্কে গুটি বসন্তের তৎকালীন লৌকিক চিকিৎসার বিবরণ লাভ ক'রা যায়। তিনি লিখেছেন-'গুটি বসন্ত এখানে সাংঘাতিক হ'লেও মারাত্মক রোগ নয়। কেননা, এখানকার একদল বৃদ্ধা মহিলা এনগ্রাফটিং বা 'কলমবাঁধা' চিকিৎসার সাহায্যে এই রোগ প্রতিরোধ ক'রে থাকেন। তাঁরা শরীরের চারপাঁচটি শিরা চিরে, সূঁইয়ের আগায় যতটুকু ধরে, ততটুকু রোগ-বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেন। তার ফলে লোকটির পরিমাণে ঐ রোগ দেখা দেয় এবং দু'এক দিনের মধ্যেই তা মিলিয়ে যায়। শরীরে দাগটুকুও থাকে না। ঐ রোগে সে আর আক্রান্তও হয় না। এটি যে আসলে ইমমিউনিটি-ই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তুর্কী-লোক-চিকিৎসকরা 'হোঝা' বা ওঝা নামে পরিচিত। ওঝাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়-ই র'য়েছে। তুরস্কের সমাজ-জীবনে রোগ-চিকিৎসায় তাঁরা আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকেন। তাঁরা মনে ক'রেন সমস্ত রোগ-ই আল্লাহর দেওয়া এবং ঐ সব রোগ চিকিৎসার নিমিত্ত—ওষুধ এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাও তিনি ক'রেছেন।

বর্তমান তুর্কী সমাজে চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে সুঁই ফুটানো ছাড়া-দোয়া-তাবিজ ধারণ, ঝাড়-ফুঁক দান, মূত্র পান, চোষণ-মোক্ষণ, গাছ-গাছড়া ইত্যাদিও প্রযুক্ত হয়। তুর্কী লোক-চিকৎসকগণ এখনও মানত, প্রার্থনা, পানি, মাটি, ছাই, আগুন, প্রহার, হস্তাব'লেপন, পদদলন, দোয়া-কালাম পাঠ, নানাবিধ ফল, ফুল, গাছ-গাছড়া ধারণ কিংবা সেগুলোর রস পান, সাপের খোলস ধারণ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ ক'রে থাকেন। যাদুক্রিয়া মূলক কিংবা বিশ্বাসসমূলক অনেক তুর্কী লোক-চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের দেশেরও কিছু কিছু সমজাতীয় চিকিৎসার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সুপ্রসবের জন্য ব্যবহৃত তুর্কী লোক-চিকিৎসার একটি বিশেষ উপকরণের উল্লেখ ক'রা যায়। যে সব মহিলার প্রসবকালে বিশেষ কষ্ট হয়—তাদের প্রসবকষ্ট লাঘব ক'রার জন্য তুর্কী পরিবারের লোকজন বাড়ীর সমস্ত জানালা-দরজা খুলে দেয়। সবাই নিজ নিজ বোতাম ও বেল্ট খুলে ফেলে, চুলও আউলিয়ে দেয়। তারা কখনো কখনো 'রোজ অব জেরিকো' বা পুষ্প বিশেষ (আমাদের দেশে একে 'মক্কার ফুল' ব'লে)-যা শুকনা অবস্থায় মুদ্রিত থাকে এবং পানিতে ভিজালে প্রস্ফুটিত হ'য়ে প'ড়ে—তা পানিতে ভিজিয়ে রাখে এবং প্রসূতিকে সেই পানি পান ক'রায়। আর এমনিভাবে প্রকৃতিতে জরায়ুর মুখ খুলে যাবার একটি নকল তোলে। তুর্কী বুড়ো-বুড়ীরা মনে ক'রেন এসব ব্যবস্থার দ্বারা প্রসূতীকে প্রসবে সাহায্যদান বা চিকিৎসা ক'রা হয়। তার প্রসব হয় সহজ। অনুরূপ যাদুক্রিয়া মূলক 'রোজ অব জেরিকো'র ব্যবহার আমাদের দেশেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যশোরেই এটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু তাতে প্রসবের কষ্ট লাঘব হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি।

এক-ই ভাবে মৃতবৎসা-নারীর সন্তান রক্ষা, নিঃসন্তান, রমণীর সন্তান লাভ প্রভৃতিতে সহানুভূতি মূলক যাদুবিশ্বাস কেন্দ্রিক আচারানুষ্ঠানের আরও নজীর তুর্কী লোক-সমাজে

বিদ্যমান। মন্ত্র ও যাদুক্রিয়ার সাহায্যে দন্তবেদনা নিরাময়ের একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বেইনব্রিজ লিখেছেন—"A friend of mine once witnessed a treatment for toothache. The hodja sat looking at the sufferer for a time, murmuring some indistinguishable words.Then with a sudden movement, he hurled an open penknife through the air, apparently straight at the patients head.It flew past his cheek and embedded itself in the wall behind his head-and no trace of the toothache remained."[২৯]

তিনি জণ্ডিস চিকিৎসারও প্রায় অনুরূপ বিরণ দিয়েছেন। তাতে ছুরি, গাছের ফল apricots এবং chick peas, নতুন কাপড়, প্রার্থনা এবং কোরাণের আয়াত ব্যবহারের উল্লেখ ক'রেছেন। ওঝা এইসব দ্বারা প্রথম দিন চিকিৎসা ক'রার প্রতিদিন সকালে, পূর্বোক্ত ফল একটি ক'রে খাবার নির্দেশ দেন। আর এই চিকিৎসাতেই রোগী নিরাময় হ'য়ে ওঠে। তুর্কীদের সামাজিক জীবনে এই ধরনের চিকিৎসক ও চিকিৎসার ভূমিকা সম্পর্কে বেইনব্রিজ ব'লেন—"However, side by side with these practices there is a more down-to-earth kind of folk-medicine in Turkey, EacH neighbourhood has at least one" old wife "skilled in many of the techiques of nursing, she can reduce fever, cure an upset stomach and so on, in fact deal with all common ailments-and even offer remadies for conditions whih science cannot cure."[৩০] বস্তুতঃ এধরনের কিছু কিছু অলৌকিক চিকিৎসা প্রায় সব দেশের লোক–চিকিৎসার মধ্যে বিদ্যমান।

এশীয় (চৈনিক) লোক–চিকিৎসা

চৈনিক লোক–চিকিৎসার অতীত ও বর্তমান ভিন্ন। পূর্বেই বলা হ'য়েছে—'প্রচলিত চিকিৎসা' ও 'লোক–চিকিৎসা' এক নয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের প্রচলিত চিকিৎসার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়– লোক–চিকিৎসার নয়। প্রাচীন চৈনিক প্রচলিত চিকিৎসার প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো লিখিত বিবরণ লাভ ক'রা যায়। কিন্তু লোক–চিকিৎসার তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীনে, শ্রেণী–সংগ্রাম বি'লোপের ধারায় চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি সাধনের জন্য ১৯৫৬ সালে মাও সেতুং চীনের প্রচলিত চিকিৎসা–পদ্ধতি ও পশ্চিমা চিকিৎসা–পদ্ধতির সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ ক'রেন। তিনি বিপ্লব সফল হবার আগে 'রেড আর্মি'কে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "give both Chinese and Western Medicine"[৩১] তিনি ১৯৪৪ সালের অক্টোবর–এর ইয়েনান ফোরামে পুনরায় উভয় রীতির চিকিৎসা–পদ্ধতির সম্মিলনের ওপর জোর দেন। প্রচলিত ও লোকজ চীনা চিকিৎসা–পদ্ধতির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত ক'রে তিনি আরও ব'লেছেন—"Chinese medicine and pharmacology are a great treasure house : efforts should be made to explore them and raise them to a higher level."[৩২] যাহোক মাও সেতুং–এর এই আবেদন ও নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৫৮ সাল থেকে চীনা লোক–চিকিৎসা ও প্রচলিত চিকিৎসার

বস্তুগত উপাদানসমূহ নতুন গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে চিকিৎসার্থ প্রয়োগ ক'রা হ'তে থাকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নয়া চীনে পশ্চিমা ও চৈনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির কার্যকর অংশগুলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মাধীনে প্রয়োগ ক'রা হ'চ্ছে। এক্ষেত্রে চীনের প্রচলিত চিকিৎসা, লোক-চিকিৎসা ও পশ্চিমী চিকিৎসা সমন্বিত হ'য়ে নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির জন্ম হ'চ্ছে।

ভাববাদের বিলুপ্তির ধারায় চীনে এখন তার তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া, তাবিজ কিংবা মানত-বিশ্বাসের সাহায্যে চিকিৎসা চালানো হয় না। লোক-চিকিৎসার এই অবস্তুজ দিক একেবারে পরিত্যাগ ক'রা হ'য়েছে, (কিন্তু তার বস্তুসম্পৃক্ত দিক বর্জন ক'রা হয়নি)। কেননা, তা দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদের বিরোধী। তাই চীনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা চৈনিক লোক-চিকিৎসার বস্তুগত ধারায় নিহিত প্রাণীজ, খনিজ ও বনজ লোকৌষসমূহ নতুন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখছেন এবং সেগুলোর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন ক'রে পশ্চিমী চিকিৎসার সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রয়োগ ক'রছেন। আবার অন্যদিকে, তারা প্রাচীন চীনা চিকিৎসা-পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিক ও ভাববাদী অংশ পরিত্যাগ ক'রে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত অংশগ্রহণ ক'রছেন। এভাবে আধুনিক চীনের চিকিৎসকগণ লোক-চিকিৎসা-রীতির সারাংশ, ইউরোপীয় চিকিৎসা রীতির সারাংশের সঙ্গে মিলিয়ে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নতুন চিকিৎসা-রীতির প্রচলন ক'রেছেন। ফলে, জনসাধারনের আরোগ্যলাভ সহজ, দ্রুত, কম বেদনাদায়ক, কম ঝুঁকিপূর্ণ ও নিশ্চিত হ'তে পারছে। এ ধরনের চিকিৎসার উদাহরণস্বরূপ হাড়ভাঙা আরোগ্যে আধুনিক চৈনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির উল্লেখ ক'রা যায়। পশ্চিমা রীতি অনুযায়ী ভাঙা হাড়-অনড় প্লাস্টার বা ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে কিংবা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে চিকিৎসা ক'রা হয়। ভগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়নচড়ন বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। প্রাচীন চৈনিক লোক-চিকিৎসায় এ রকম ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গাছের পাতা ভাঙা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর বেঁধে দিয়ে হাড় জোড়া লাগানো হ'ত। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী এ রকম ক্ষেত্রে-"The new method takes a leaf from traditional Chinese medicine by using small splints instead of plaster. এ রকম উভয় রীতির ওষুধ প্রয়োগের ফলাফল সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—"It has succeeded in speeding up the healing process.For example, a fracture of the femur which normally takes about eighty five days to heal when treated by modern Western methods now takes fifty-two days under the combination method."[৩৩]

এমনিভাবে লোক-চিকিৎসা ও প্রচলিত বা দেশীয় চিকিৎসাকে পশ্চিমী চিকিৎসার সঙ্গে সমন্বিত ক'রার ধারায় চীনের সুবিখ্যাত আকুপাংকচার বা সুঁই চিকিৎসার উল্লেখ ক'রা আবশ্যক। দু'হাজার-এরও অধিক বছরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকে নতুন গবেষণার সাহায্যে পুষ্ট ক'রে পাথুরে পিনের বদলে স্টেইনলেস স্টীলের আলপিনে মৃদু বৈদ্যুতিক প্রবাহ যুক্ত ক'রে—গত দু'দশকাধিক কাল অস্ত্রোপচারের বেদনা নিবারণ থেকে বহু জটিল রোগ নিরাময়ে প্রযুক্ত হ'চ্ছে। এমনকি যে সব সাংঘাতিক রোগীকে 'ড্রাগ এনেস্থেশিয়া' দেওয়া সম্ভব নয়, তাদের 'আকুপাংকচার এনেস্থেশিয়া' দিয়ে অজ্ঞান ক'রেই মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের মত কঠিন ক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ ক'রা সম্ভব হ'য়েছে।

চীনে এখনও "Old peasants were asked for their family remedies and medical personnel were invited to give instructions on prescrptions."[৩৪] ১৯৭৫ সালে এ ধরনের কুড়ি জন বৃদ্ধ কৃষকের নিকট থেকে ৮০টিরও অধিক পারিবারিক 'ব্যবস্থাপত্র' সংগৃহীত হয়। তার মধ্যে কুড়িটি ওষুধের উন্নয়ন সাধন ক'রে প্রয়োগের ফলে চমৎকার সাফল্য অর্জিত হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল সর্প দংশন-চিকিৎসায় একটি বুনো গাছের পাতার ব্যবহার। রিপোর্টে তুলনামূলক আলোচনা ক'রে বলা হ'য়েছে—"several years ago, a peasant was bitten on the foot by a poisonous snake and had to spend 18 days in the commune hospital at a cost of 27 yuan before he was well. In 1969 when a womon was bittenin the foot by a poisonous snake a health worker applied the crushed leaves of this plant mixed with a little sugar. Three days later she was well, and the cure had cost practically nothing."[৩৫]

এমনিভাবে চীনে লোক-চিকিৎসার বনজ ঔষধের ব্যবহার-ই বিশেষ প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। হাজার হাজার বছর ব্যাপী লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত গাছ-গাছড়া এখন নতুন রীতিতে বিভিন্ন হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। সেখানে এখন আর পীর-পুরোহিতী, দৈবী, আধা-দৈবী, আধি ভৌতিক চিকিৎসা-পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই, কিন্তু বস্তুকেন্দ্রিক লোক-চিকিৎসা পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের সদয় বিবেচনা লাভ ক'রেছে। ফলে চীনের লোক-চিকিৎসায় এখন রূপান্তর সাধিত হ'য়েছে। বিপ্লবপূর্ব চীনের ওঝাবৈদ্য, পীর-ফকীরদের স্থান নিয়েছে এখনকার সময়ের ভালভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুড়ি লক্ষাধিক নগ্নপদ ডাক্তার। এরাই এখন চীনের লোক-চিকিৎসক। এরা পশ্চিমী প্রথা অনুযায়ী বনজ ওষুধের সক্রিয় উপাদানটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে তা রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্যে রাসায়নাগারে প্রস্তুত ক'রে প্রয়োগ ক'রে না, বরং গোটা গাছ, পাতা বা ফুলটাই অন্য পদার্থের সঙ্গে একত্রে প্রয়োগ ক'রে। ফলে তাদের লোক-চিকিৎসার নব জাগরণের ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফার্মাকোপিয়ার অভাব, 'স্টান্ডার্ড' বা 'মান বজায় রাখার সমস্যা' ইত্যাদির মুখোমুখি হ'তে হয়নি। অথচ অন্যান্য দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসা-বিজ্ঞাণীদের নিকট লোক-চিকিৎসাকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ অত্যন্ত সমস্যা সংকুল। কারণ এই চিকিৎসার স্বরূপ তাদের অজ্ঞাত। লোক-চিকিৎসার নব-জাগরণে চীনের অনুশীলন তাই মৌলিক ও সার্থক।

ভারতীয় লোক-চিকিৎসা

পূর্বে বলা হ'য়েছে, লোক-চিকিৎসার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতীয় লোক-চিকিৎসার বর্তমান রূপের লিখিত বিবরণ পূর্বোক্ত ও.পি. জ্যাগ্‌গির 'ফোক মেডিসিন' গ্রন্থে বিদ্যমান। এছাড়া সাহেব হেলাল শ্রীবাস্তব-এর 'ফোক কালচার অ্যান্ড ওরাল ট্র্যাডিশন', শোভারাণী চক্রবর্তীর "বর্তমান বঙ্গ সমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা" এবং গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুর "বাংলার লৌকিক দেবতা'য় ভারতীয় আধুনিক লোক-চিকিৎসার অনেক তথ্য লাভ ক'রা যায়।

এসব বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারতীয় গ্রাম্য জনগণ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত লৌকিক চিকিৎসা-ধারায় গ্রাম্য ওঝা বৈদ্য, পীর-সন্ন্যাসী প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ ছাড়াও মানত, বলিদান, প্রার্থনা, পূজা, তাবিজ, কবচ, মাদুলি, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া, কালাম ও বনজ গাছ-গাছালি এবং লতাপাতার সাহায্য গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভূত-প্রেত, জ্বিন-পরী, পিশাচ, যক্ষরক্ষ, গ্রাম-দেবতা, পারিবারিক ও সামাজিক দেবতাদি ছাড়াও বৈদিক পৌরাণিক দেব-দেবী এবং আল্লাহ-বিশ্বাস ভারতীয় মুসলমান-অমুসলমান-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান। অপদেবতা এবং রোগদেবতার ধারণাও ভারতীয় সমাজে প্রায় সার্বভৌম। বৃক্ষ, নদী, গ্রাম, পথ ইত্যাদি কেন্দ্রিক দেব-দেবতার ধারণাও তাদের মধ্যে প্রবল।

ভারতীয় গ্রাম্য জনসাধারণের মতে রোগের কারণ দেবতার ক্রোধ, দুষ্ট আত্মার বদ নজর, যাদু, বাণ-টোনা ইত্যাদি। তাই তারা রোগ-চিকিৎসার জন্য ঐ সব দেব-দেবতার ক্রোধ-শান্তির উদ্দেশ্যে পূজা, প্রার্থনা, মানত, ভীতি প্রদর্শন কিংবা অত্যাচার, উল্টো যাদু, উল্টো বাণ-টোনার সাহায্যে রোগারোগ্য ক'রার প্রয়াস পায়। তাছাড়া বনজ লতা-গুল্ম, ছাই-মাটি-পানি ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর 'থানে' কিংবা মন্দিরে, তীর্থভূমিতে পূজার ব্যবস্থা ক'রা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ওলাই চণ্ডী'র পূজার উল্লেখ ক'রা যায়। ওলাই চণ্ডী একা নন। তার আরও ছয় বোন আছে। এরা যথাক্রমে ঝোলা বিবি, আজগৈবী বিবি, চাঁদ বিবি, বাহোড়বিবি, ঝেটুনে বিবি ও আসান বিবি। এই 'সাত বোন' কলেরা বসন্ত, হাম ইত্যাদি সাত প্রকার সাংঘাতিক রোগের দেবতা। মহামারী দেখা দিলে পল্লীবাসীরা গ্রাম্য মোড়লের নেতৃত্বে শনি বা মঙ্গলবারে সমষ্টিগতভাবে এদের পূজো দেয়। এছাড়া এদের নিকট মানতাদি ক'রা হয় এবং ছাগ বলি দেওয়া হয়। নামভেদে এদের পূজা উড়িষ্যা, মহিশূর, দক্ষিণ ভারত এবং আসামেও প্রচলিত আছে।[৩৬]

বস্তুতঃ সারা উপমহাদেশেই কলেরা ও বসন্ত রোগ চিকিৎসার একটি সর্বভারতীয় গ্রাম্য রূপ আছে। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত বসন্তরোগের মূল কারণ হিসেবে ঝোলা বিবি বা দেবী শীতলাকে দায়ী ক'রা হয়। এ দেবী অনার্যা এবং গ্রামীণ। বসন্তের মহামারী দেখা দিলে, তা থেকে রেহাই পাবার জন্য শীতলাকে পূজা-উপচার নৈবেদ্যাদি দিয়ে তুষ্ট ক'রা হয়। হিন্দুদের মত মুসলমানরাও তাকে মানে এবং দুর্যোগকালে 'রণ দেওয়া', 'জিকির', 'সিন্নি' ইত্যাদির মারফত তাকে দূরে রাখার প্রয়াস পায়। হিন্দুরা মনে ক'রেন দেবী শীতলা ক্রুদ্ধ হ'লেই বসন্ত, মহামারী আকারে দেখা দেয়। বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাই তারা তন্ত্র-মন্ত্র ও পূজা-নৈবেদ্য মানতাদি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট ক'রে।

সিন্ধু প্রদেশে বসন্তরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাত দিন ব্যাপী চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ও.পি. জ্যাগ্‌গি। শোভারাণী চক্রবর্তী "পশ্চিম বঙ্গে"র মুসলমানদের মধ্যে বসন্ত রোগ আরোগ্যর একটি মুসলমানী তদ্বিরের উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি 'ছহি তাজ ছোলেমানি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব'লেছেন—"কাহারও শরীরে বসন্তরোগ দেখা দিলে একগাছি নীল সুতা লইয়া সুরা "আর রহমান-"এর প্রথম থেকে" ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান" পর্যন্ত

প'ড়ে সুতায় ফুঁদিয়ে ঐ সূতা রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আর কোন ভয় থাকিবে না।"[৩৭] শোভারাণী 'ভূত ঝাড়ন', 'ভূত তাড়ন' প্রভৃতির মন্ত্র ও প্রক্রিয়ারও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সাত প্রকার গাছের শিকড়ের সঙ্গে "ছিঁড়াজুতার টুকরা, লৌহ চূর্ণ, বালি, হিং প্রভৃতি জিনিস একত্র করিয়া লাঙ্গল ফাঁসির মাদুলীতে পুরিবে"–ব'লে এক রকম ভৌতিক কবচের উল্লেখ ক'রেছেন। সম্ভবতঃ সে কবচ ধারণ ক'রলে ভূত দূরে থাকে।

সাহেব লাল শ্রীবাস্তব রাজস্থানের আসালপুর গ্রাম সমীক্ষায় দেখেছেন, সেখানকার অধিবাসীরা শরীরের ফুসকুড়ি, ঘামাচি বা ব্রণ–চিকিৎসায় রোগীকে ভৈরুঞ্জীর মন্দিরে নিয়ে যায় এবং দেবীর সামনে রোগী নতজানু হ'য়ে রোগমুক্তির প্রার্থনা জানায়। তারপর—"some oil, vermillion, pooa, puri and papadi etc, are offered to the deity with this belief that the deity will get the child cured of this disease."[৩৮] ইনি উক্ত গ্রামে আধকপালে মাথাধরা, টাইফয়েড, জ্বর, সর্প, কুকুর প্রভৃতি জীব–জন্তু–দংশন, ভূতে পাওয়া ইত্যাদি চিকিৎসায় মন্ত্র ও ওষধি ব্যবহারের নজীর উল্লেখ ক'রেছেন।

ও.পি. জ্যাগ্‌গিও জ্বর–চিকিৎসায় মন্ত্র প্রয়োগের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"Charm against fevers of different types are many. In a cass of continuous fever, dust collected at night from the junction of three streets is placed under the patient's cot on the side of his head with a bread laking pan placed inverted over it. The sbipper of a female is then placed inverted over the pan. In the early morning the dust is thrown away at the crossing, from where it was procured. This is done three nights consecutively."[৩৯] জণ্ডিস চিকিৎসার জন্য পড়া, তেল–পানির ব্যবহার এবং কান্দি (?) গাছের ডাল সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবার কথাও জ্যাগ্‌গি উল্লেখ ক'রেছেন।

বাত চিকিৎসায় ভারতের কোন কোন স্থানে রোগীকে 'ঘুটের তাপ' দেওয়া হয়। এজন্যে মাটিতে একটি বড় গর্ত ক'রে তার মধ্যে 'ঘুটে' পুড়িয়ে আগুন তৈরী ক'রা হয়। গোবর বা ঘষি পোড়া আগুন তীব্র হ'য়ে উঠলে গর্তের মুখে একটি পিঁড়ি পেতে রোগীকে তার ওপর প্রায় নগ্ন অবস্থায় কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়। এরপর তাকে তুলে এনে কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হয়। আর এভাবেই হয় বাত চিকিৎসা।

ভারতের রাজস্থান প্রদেশের কোন কোন ওঝা রোগ চুষে খেয়েও রোগীকে নিরাময় ক'রে থাকেন। 'চোখে ওঠা রোগ' চিকিৎসার জন্য ভারতের কোন কোন স্থানে, রোগী গভীর রাত্রে উঠে পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে গিয়ে ঘরের দরজার কড়া নাড়ে। ঘরের ভেতর থেকে তখন যদি কেউ ব'লে 'কে ডাকে' ? তখন সে ব'লে—'আমি চোখ ওঠার মা।' এভাবে পরপর তিন রাত তিন বাড়ী গিয়ে ব'ললে—তার চোখ ওঠা সেরে যায় এবং ঐ রোগ অন্যদের চোখে দেখা দেয়।

ও.পি. জ্যাগ্‌গি গ্রাম লোক–চিকিৎসায় সর্প–দংশন–জাত বিষ–চিকিৎসার কোন উল্লেখ ক'রেননি। তিনি 'আদিবাসী চিকিৎসা'য় এর বিবরণ দিয়েছেন। সর্প–বিষ চিকিৎসার লৌকিক পদ্ধতি আদিবাসীদের মধ্যে তো বটেই গ্রাম্য জনগণের মধ্যেও বর্তমান। শোভারাণী চক্রবর্তী

"পশ্চিম বঙ্গে" সর্প ও সর্পদংশন-চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা মন্ত্রের উল্লেখ ক'রেছেন। সর্পকুলের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতীয় বাংলায় মনসা পূজার ও ব্যাপক প্রচলন র'য়েছে।

বস্তুতঃ ওঝারা মন্ত্র ও বনৌষধির সাহায্যে সর্প-বিষ চিকিৎসা ক'রে থাকেন। তাদের মন্ত্রের মধ্যে আলী-কালি, আল্লা-রসুল, ফাতেমা, দুর্গা, শিব ইত্যাদি মুসলিম-অমুসলিম উভয় সংস্কৃতি থেকে আহরিত উপাদান বর্তমান।

ভারতে গাছ-গাছালির সাহায্যেও বহু রোগের লৌকিক চিকিৎসা ক'রা হয়। সে সম্পর্কে জ্যাগ্‌গির অভিমত—"As regards the use of drugs most of the villagers take drugs, mostly herbals, that form part of the kitchen grocery of every village home."[৪০]

এমনিভাবে ভারতীয় লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে, তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া-তাবিজ, মাদুলি, ঝাড়-ফুঁক, মানত, পূজা, প্রার্থনা, তেল, পানি, ধুলি, সুতা, লতা-গুল্ম, দেব-দেবতা প্রভৃতির সমধিক গুরুত্ব ও ভূমিকা র'য়েছে। মূলতঃ গ্রামের ওঝা, পীর, পুরোহিত, ধাই ইত্যাদি পেশাজীবীরাই ভারতের বর্তমান জন-সমাজের বিশিষ্ট লোক-চিকিৎসক। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং এই সব পেশাদার চিকিৎসকরাই ভারতের সর্বত্র লোক-চিকিৎসা চালিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা

বাংলাদেশের বর্তমান লোক-চিকিৎসার প্রচলিত রূপের মধ্যে মানত, প্রার্থনা, কোরবাণী, (সম্প্রদায় বিশেষ পূজা-উৎসর্গ), দান-দোয়া-কালাম, তাবিজ, কবজ, মন্ত্র, ঝাড়, ফুঁক, বাণ-টোনা, ছাই, পানি, মাটি, গাছ গাছালির রস, শিকড়, বাকড়, নানা ধরনের ওষুধ, প্রলেপ, জাব ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বর্তমান বাংলাদেশের জনবসতির অধিকাংশই মুসলমান বিধায় লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্বতন হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রভাবের যথেষ্ট বি'লোপ ঘ'টেছে এবং মুসলিম লৌকিক সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার বিস্তৃতি লাভ হ'য়েছে। আগে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মুসলমানরা হিন্দুদের 'বারে', 'মেলায়' 'থানে' বা 'মন্দিরে' মানত ক'রত, উপহার দিত, 'গঙ্গা-স্নান' ক'রত। হিন্দুরাও মুসলমানদের মসজিদে, দরগায় কিংবা পীর-বাড়ীতে হাজত-মানত, মোমবাতি, আগরবাতি নিয়ে উপস্থিত হ'ত। কিন্তু হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগের ফলে এদেশের মন্দির, থান-বার-মেলা-রথ যাত্রা, গঙ্গা-স্নান প্রায় উচ্ছন্ন হওয়ায় ঐ সব স্থানে চিকিৎসার্থ মুসলমানদের গমনাগমন লোপ পেয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মুসলমানদের মধ্যেও পীর, দরবেশ, দরগা, মসজিদ, মানত বালার সদকা স্বরূপ বিশেষ 'কোরাবাণী'দান প্রভৃতির ওপরও আর তেমন নির্ভরতা নেই। তথাপি, সারা বাংলাদেশে এখনও যেসব দরগা-মসজিদ এবং পীর দরবেশ আছেন-তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষ এখনও কথঞ্চিৎ ভয়-ভক্তি সম্পন্ন এবং নানা ধরনের রোগ-চিকিৎসায় ; যেমন বন্ধ্যাত্ব নিরাময়ে মৃতবৎসা দোষ দূরীকরণে, শিশুর কল্যাণে, বাস্তুকল্যাণে, জ্বিন, পরী, ভূত-প্রেতের আছর ও

উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য, পুরুষত্বহীনতা, মেহ্‌–প্রমেহ, গণোরিয়া সিফিলিস, কুষ্ঠ ইত্যাদি নিরময়ে কিংবা দূরারোগ্য কোন কঠিন ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁদের নিকট যেয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিখ্যাত হাজত–মানত–এর দর্গাসমূহের মধ্যে সিলেটের শাহজালাল–এর দর্গা, বাগেরহাটের খান জাহান আলীর দর্গা, যশোরের গরীব শাহের দরগা, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন এইসব দর্গায় প্রচুর সংখ্যক রোগী রোগ–মুক্তির জন্য হাজত–মানত–প্রার্থনা ক'রে এবং মোমবাতি, সিন্নি, লোবান, টাকা–পয়সা–খাসি–মোরগ ইত্যাদি উপহার দিয়ে থাকে। স্থানীয় পীর–দরবেশদের নিকট থেকেও তারা গ্রহণ ক'রে থাকে নানা রকম ওষুধ, দোয়া–তবিজ, পানিপড়া, তেল পড়া প্রভৃতি।

মানসিক রোগ–নিরাময়ে বা জ্বিন–ভূত–প্রেতের আছর ছাড়াতে ওঝা–ফকীরদের সাহায্যও নেওয়া হয়। তাঁরা নানা রকম গাছ্‌–গাছড়া, দোয়া, তাবিজ ও মন্ত্রের দ্বারা রোগীকে চিকিৎসা ক'রে থাকেন। সর্প–দংশনজাত বিষ–চিকিৎসাও এদেশের ওঝা–গুণীণরা মন্ত্র ও গাছ্‌–গাছড়ার সাহায্যে দক্ষতার সঙ্গে ক'রে থাকেন। তাঁরা 'সাপে কাটা' বিশেষ ধরনের মৃত মানুষের পুনর্জীবন দান ক'রতে পারেন ব'লেও শোনা যায়। অশরীরী আত্মা বা জ্বিন–পরীর উপদ্রব থেকে গৃহ ও পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্য, বসতবাড়ীর ওপর দিয়ে তাদের চলাফেরা বন্ধ ক'রার জন্য, মহামারীর হাত থেকে গ্রাম বা জনপদ রক্ষার জন্য এবং বাণ–টোনা–যাদুক্রিয়া থেকে জীবন রক্ষার জন্য ও ওঝা–গুণীন–ফকীর–পীর–দরবেশ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হ'য়ে থাকে। বাংলাদেশে কলেরা বসন্তের রোগ–দেবতাদের জনগণ এখনও মানে এবং ভয়ভক্তি ক'রে বটে কিন্তু তাদের আর পূজা–হাজত দেয় না। বরং মহামারীর সূচনা হ'লে, গ্রাম বা মহল্লায় মুসলমানী রীতি অনুযায়ী জিকির ও দোয়া–কালাম–এর সাহায্যে, 'বন্ধ' দেয়া হয় এবং গ্রাম বা মহল্লার সকলকেই একটি ক'রে প্রতিরোধমূলক তাবিজ প্রদান ক'রা হয়। বসতবাটিতে ভূত–প্রেতাদির উপদ্রব বন্ধ ক'রার জন্য 'বাড়ীবন্ধ', ঘরের মধ্যে যাতায়ত ও উৎপাৎ নিবারণ কল্পে 'ঘরবন্ধ' এবং ব্যক্তি বিশেষকে রক্ষা ক'রার জন্য 'শরীর বন্ধ' ক'রার প্রথা এখনও বাংলাদেশের জনসমাজে প্রচলিত র'য়েছে। শিশুজন্মের পর আঁতুরঘর বন্ধ দেওয়া, যষ্ঠী পালন, 'নোয়ার কামান' সারা, একুশ দিনের মধ্যে শিশুকে ঘরের বাইরে না নেওয়া, আঠারো মাস পর্যন্ত মাকে 'বেছে–গুছে চলা' (নিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা ক'রা)—শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশে প্রচলিত র'য়েছে। চোখ লাগার চিকিৎসায় পানি প'ড়ে, চোখে–মুখে ঝাপ্টা মারা, 'হুয়ার উঠানো' এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিশুর কপালের বাম পার্শ্বে কাজল বা বিশেষ ধরনের কালির ফোঁটা দেওয়ার প্রথা এখনও সুপ্রচলিত। ক্রিমির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এখনও আমরা কাঁচা হলুদ খাই। মুখে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ নিবারণের জন্য ব্রণের ওপর নাকের পোঁটা মাখিয়ে দেওয়া হয় কিংবা ঘরের মেঝেতে মাটির ওপর পানি ঢেলে কাদা তৈরী ক'রে সেই কাদা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাতে যন্ত্রণা নিবারণ হয়, স্ফোটক বসে যায়। প্রস্রাব বন্ধ হলে গ্রামদেশে আজও রোগীর নাভির চারপার্শ্বে পচা কাদার প্রলেপ, ঘাস বিশেষের 'জাব' ইত্যাদি দেওয়া হয়। আর শিশুদের বুকের 'কড়া' বাড়লে তিনদিন বা সাতদিন সকালে বাসি বিছানায় বসে, বাসি 'ঘুটের ছাই' দিয়ে ঐ 'কড়া' উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে 'মাজলে' তা সেরে যায়। এক–ই ভাবে ছাই দিয়ে 'ড'লে' প্লীহার বিবৃদ্ধি চিকিৎসার রেওয়াজও আমাদের দেশে প্রচলিত র'য়েছে। অস্ট্রেলীয় পূর্বোক্ত

গুগাজা গোত্রের মানুষের মতই বাংলাদেশে আজও অল্প-স্বল্প হাত-পা কেটে গেলে দুর্বার কচি ডগা তুলে নিয়ে চিবিয়ে লালা মাখিয়ে ক্ষতে প্রয়োগ ক'রা হয় ; তাতে রক্ত বন্ধ হয় এবং ক্ষত আরোগ্য হয়।

এমনিভাবে সারা বাংলাদেশে অসংখ্য রকম লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা র'য়েছে। সেগুলোর সবটাই যে সব রোগে ফলপ্রদ, এমন নয়। বস্তুতঃ লোক-চিকিৎসা কেন, কোন চিকিৎসা-পদ্ধতিই সর্বরোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। লোক-চিকিৎসাও সে নিশ্চয়তা দেয় না। বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসায়ও-যে সর্বরোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা র'য়েছে তা নয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই জানেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যেখানে ঠাঁই পায় না, লোক-চিকিৎসা সেখানে বিস্ময়কর সুফল দেখিয়ে থাকে। এটি বাস্তব সত্য। লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্যসন্ধানের সার্থকতাও এখানে।

বলাবাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসার প্রসার হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক সাধারাণ ডাক্তারদের সংখ্যাধিক্য ওঝা-ফকীর, গুণীন, পীর-দরবেশদের প্রতি অনাস্থা, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির জন্য বাংলাদেশের লেগক-চিকিৎসা বর্তমানে বিপর্যস্ত অবস্থায় পর্যবসিত হ'য়েছে। গ্রামে এখন আর আগের মত দক্ষ কবিরাজও নেই। ওঝাও নেই। নেই জবরদস্ত পীর কিংবা নামকরা ফকীর। বাংলাদেশের লোক-চিকিৎসা তাই এখন বিক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত, রিক্ত-প্রায়, ম্লান এবং হৃত-গৌরব। তথাপি এখনও কোন কোন পল্লীতে, কোন কোন অঞ্চলে এমন দু'একজন ওঝা-ফকীর-গুণীণ এবং এমন কিছু কিছু গোপন চিকিৎসার অস্তিত্ব আছে যার বিস্ময়কর কার্যকারিতা বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের অতি বিকশিত চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অনায়ত্ব।

যশোর জেলার লোক-চিকিৎসার পরিচয় থেকে তার নিদর্শন লাভ ক'রা যাবে।

তথ্য-সংকেত

১. Janice Reid, Health As Harmony, Sickness As Conflicts, Hemisphere, Vol 23, No.4 (July/August 1979), p. 199.

২ Betty S. Bergersen, Pharmacology in Nursing (13th ed., U.S.A.-1976), p.97.

৩. See, Bergersen, Ibid, p. 98.

৫. ক) জগলুল আলম, ঔষধ-ব্যবসা, বিচিত্রা,৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (৬ই জুন-১৯৮০), পৃ. ২২ এবং খ) ফারুখ ফয়সল, ওষুধ সাম্রাজ্যবাদ, বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ, ২৩তম সংখ্যা, (৫ই নভেম্বর, ১৯৭৬), পৃ. ২২।

৬. দ্রষ্টব্য, জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৭. দ্রষ্টব্য, জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩।

৮. দ্রষ্টব্য, 'ঔষধি, প্রকৃতির অবদান' শীর্ষক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি। বিচিত্রা, ৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, (২৭শে ডিসেম্বর-১৯৭৪), পৃ. ৩২।

৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১০. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১১. Ho Peng-Yoke, Traditonal Chinese Medicine-Up To Date, Hemisphere, Ibid, p.253.

১২. আহমেদ নুরে আলম, দেশীয় চিকিৎসা, বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ৪২, সংখ্যা, (মার্চ–১৯৭৮), পৃ. ২০।

১৩. দ্রষ্টব্য, ইসলাম, বাংলাদেশে ওষুধ শিল্প, সচিত্র বাংলাদেশ, ১ম সংখ্যা, ১৫শ সংখ্যা, (১৬ই জুলাই–১৯৮০), পৃ. ১৫।

১৪. ড: এ.কে. আজাদ চৌধুরী, ঔষধ সংকট নিরসনে লোকায়ত ঔষধের ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, স্মরণিকা, ৮১, পৃ. (অনুক্ত)।

১৫. আহমেদ নূরে আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

১৬. ড: এ.কে. আজাদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. পরবর্তী (পৃ.–সংখ্যা অনুক্ত)।

১৭. ড: আবদুল মান্নান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গুল্মলতাজাত ঔষধ, স্বাস্থ্য সাময়িকী, বর্ষ ৭, সংখ্যা–১, (জানুয়ারী–১৯৮১), পৃ. ৫৪–৫৫।

১৮. See. E. Adamson Hoebel & Everett Frost, Cultural And Social Anthropology, (U.S.A. 1976), p.356.

১৯. See, Lorna Cartwright, Health From Herbs, Hemisphere, Vol.23. No.4. (July/August-1979), p. 237.

২০. Robert B. Taylor, Introduction to Cultural Anthropology, (Boston-1973), pp. 440-'41.

২১. See, Anthony R. Peile, Colours that Cure, Hemisphere, Ibid,p.214.

২২ Ibid, p.217.

২৩. Ganice Reid, Health As Harmony, Sickness As Conflict, Hemisphere, Ibid, p.196.

২৪. Robert B. Taylor, Ibid, p.493.

২৫. Ibid, p.494.

২৬. George Pierre Castile, North American Indians, (U.S.A. 1979), p.95.

২৭. See, Ibid, pp. 103-05.

২৮. Robert B. Taylor, Ibid, p.486.

২৯. Margaret Bainbridge, Turkish Folk Medicine, Hemisphere, Ibid, p.241.

৩০. Ibid, p.243.

৩১. See, Acupuncture Anaesthesia, (peking-1972) p. 23.

৩২ Ibis, p.l.

৩৩. Ho peng-Yoke, Traditional Chinese Medicine-Up To Date, Hemisphere, Ibid, p.254.

৩৪. Se. Medical Care For China's Millions, China Reconstracts Supplement, (october, 1979), p.19.

৩৫. Ibid, p.20.

৩৬. See, O.P. Jaggi, FM Ibid, p.27.

৩৭ শোভারাণী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।

৩৮. See, sahab Lal Srivastava, Folk Culture And Oral Tradition, (New Delhi-1974), p.257.

২৯. O.P. Jaggi, Folk Medicine, (Delhi-1973), p.202.

৪০. O.P. Jaggi, FM., Ibid, p.

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞান

(The Science of Medicine)

চতুর্থ অধ্যায়
বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির আলোকে
লোকচিকিৎসা-পরিচয়

প্রত্যেক চিকিৎসা-পদ্ধতির-ই তিনটি প্রধান বিভাগ বিদ্যমান। যথা,—

১. রোগ-বিজ্ঞান (Pathology)

২. ঔষধ-বিজ্ঞান (Pharmacology) ও

৩. চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Medicine)।

বিবিধ চিকিৎসা-প্রণালীর মত, একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে, লোক-চিকিৎসারও এই বিভাগত্রয় বর্তমান। তবে লোক-চিকিৎসার রোগ-বিজ্ঞান, ঔষধ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান কোন উন্নত যন্ত্রপাতি-নির্ভর কিংবা বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল-নির্ভর নয়। বরং তা' আদিম,অনুন্নত, সহজ-সরল রীতির লোক-বিজ্ঞান-সম্মত বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির রোগ-বিজ্ঞান, ঔষধ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-চিকিৎসার রোগ-বিজ্ঞান, ঔষধ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সম্ভব।

ক. রোগ-বিজ্ঞান (Pathogenesis, Pathology or The Science of Diseases).

'রোগ-বিজ্ঞান-এর সম্যক পরিচয় লাভের জন্য প্রথমে বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী 'রোগ ও স্বাস্থ্য' সম্পর্কে কি ধারণা করা হয়-তার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। অতঃপর রোগের সঙ্গে দেহ ও মনের সম্পর্ক, রোগের কারণ, রোগের নিদর্শন, রোগ-নিরূপণ, রোগের শ্রেণীগত বিবরণ ও রোগ-নিবারণের দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

১. 'রোগ' ও 'স্বাস্থ্য'

রোগ ব'লতে কি বোঝায় এবং তার সঙ্গে 'স্বাস্থ্যে'র সম্পর্ক কি-সে বিষয়ে সকল চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই মোটামুটি অভিন্ন বক্তব্য লক্ষণীয়। রোগ ব'লতে প্রায় সর্বমতেই শারীরিক ও মানসিক 'অসুবিধা', 'অসুস্থতা', 'অস্বাভাবিকতা', স্বাস্থ্যগত বৈষম্য', 'বিপর্যয় প্রভৃতি বোঝায়। এজন্য জেনিস রীড তার পূর্বালোচিত প্রবন্ধটির নামকরণ ক'রেছেন—"Health is harmony, sickness as conflict."[১] শুধু ইউরোপীয় মতে নয়, এশীয়দের ধারণাও 'সুখের সঙ্গে দুঃখের দ্বন্দ্বই অসুস্থতা'। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী-'দুঃখই ব্যাধি' অথবা 'দুঃখের জন্য যাদের সংযোগ-তারা ব্যাধি', কিংবা 'যে সব থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয়-সে সব-ই ব্যাধি' নামে অভিহিত।[২] অতএব আলোচ্য চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী 'দুঃখের অভাব', 'দুঃখ সংযোগের অভাব' বা 'দুঃখ উৎপন্ন হয়-এমন কারণে'র অবর্তমানতাই স্বাস্থ্যবান মানুষের লক্ষণ।

হোমিওপ্যাথির উদ্ভাবক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ও তাঁর 'অর্গ্যানন'–এর ঊনবিংশ সূত্রে ব'লেছেন—"মানবের সমস্ত রোগ কেবল তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্তন সকলের সমষ্টি মাত্র।"[৩] তাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা–রীতি অনুযায়ী সুস্থতা হ'ল—"সুস্থ জীবনী শক্তি–সম্পন্ন অবস্থা"।[৪]

অনুরূপভাবে লোক–মতেও 'অসুখ' ই 'রোগ' এবং স্বাভাবিক সুখ ও আনন্দই স্বাস্থ্যের পরিচয়।

অতএব প্রায় সর্বমতেই 'রোগ' এবং 'স্বাস্থ্য' এক–ই টাকার এপিঠ–ওপিঠ মাত্র। একের আবির্ভাবে অন্যের বিকৃতি। 'রোগে'র আবির্ভাবে স্বাস্থ্যের বিপর্যয় এবং স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের বিদূরণ–ই রোগনাশ ও সুস্থতা–সম্পাদন। লোক–মতও এ থেকে ভিন্ন নয়।

২. রোগ, দেহ, মন ও তাদের সম্পর্কে

রোগের সঙ্গে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধেও প্রায় সর্বমতেই অল্প–বিস্তর ঐক্য আছে। 'রোগ' দ্বারা শুধু 'দেহই আক্রান্ত হয়' না'–দেহের সঙ্গে 'মন'ও 'আচ্ছন্ন' হয়, 'আবিষ্ট' হয়, 'রুগ্ন' হয়। অর্থাৎ রোগের প্রকাশ ঘটে 'দেহে' এবং 'মনে' উভয় ক্ষেত্রেই। এ বিষয়টিকে অনুধাবন ক'রেই আয়ুর্বেদে, মানুষের অসুস্থাবস্থাকে 'শারীরিক' ও 'মানসিক' ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে। শারীরতত্ত্ববিদ্ সুশ্রুত স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছেন—"মন ও শরীর ব্যাধির অধিষ্ঠানভূমি।"[৫] অর্থাৎ ব্যাধি দ্বারা 'মন' ও 'শরীর' উভয়–ই আক্রান্ত হয়।

আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যাবিদগণ যদিও 'শারীরিক রোগ' এবং 'মানসিক রোগ'কে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা ক'রতে অভ্যস্ত, তথাপি শারীরিক রোগ যে 'মনকেও আক্রান্ত' ক'রতে পারে'–সে সম্পর্কে তাঁরা স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি। তাই জন ফর্বস এবং ডব্লিউ এন, মান লিখেছেন–"Bodily disease may affect the mind as well : whenever it is of any severity if certainly affects the emotions."[৬] বলাবাহুল্য, শারীরিক অসুস্থতা 'মনকে আক্রান্ত ক'রতে পারে'–এমন নয়, অবশ্যই আক্রান্ত ক'রে এবং আচ্ছন্ন ক'রে–মানসিক ভাবাবেগকেও।

তাই 'রোগ' এবং তার সঙ্গে মানুষের 'দেহ' ও মনের সংযোগ কি রকম সে বিষয়ে হোমিওপ্যাথিতে বলা হ'য়েছে যে, 'রোগ' প্রথম সঞ্চারিত হয় 'মনে' এবং তারপর তা প্রস্ফুটিত হয় 'দেহে'। তাই 'ভারতের কেন্ট' ডাক্তার নীলমণি ঘটক লিখেছেন–"পীড়িত অংশে পীড়ালক্ষ্মণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে অগ্রে মনে পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেননা মন–ই দেহ–যন্ত্রের চালক, মন বিকল না হইলে দেহ বিকল হয় না। সর্ব প্রথমেই মনে বিকৃতি দেখা দেয়, তাহার পর যন্ত্র বিশেষে ঐ বিকৃতি বিকশিত হয় মাত্র।"[৭] কিন্তু আকস্মিক আঘাতাদি, ব্যতিরেকে মানুষের শরীরে ও মনে রোগ এক–ই রকমে প্রকাশ পায় না। কেননা, সমস্ত মানুষের ই মন ও শরীর এক নয়। এজন্য মানুষের দেহে এবং মনেও রোগ–প্রকাশের নানারকম বৈচিত্র্য ঘটে।

লোকমত অনুসারেও মানুষের দেহ এবং মনের সঙ্গে রোগের ওতোপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্যেই লোক-চিকিৎসকগণ ব'লেন-"মানুষের 'মনের রোগ' তার দেহকে জীর্ণ ক'রে এবং মানুষ দেহ ও মন উভয়তঃই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক 'মানসিক রোগ', হোমিওপ্যাথিক 'মনোব্যাধি', আর লৌকিক ধারণা অনুযায়ী 'মনোরোগ' এক নয়। সাধারণতঃ দুশ্চিন্তা, অতিচিন্তা, কুচিন্তা ও প্রেম-চিন্তাই লোক-মত অনুযায়ী 'মনের রোগ'। লোক-চিকিৎসকদের মতে এগুলো থেকে রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যে কোন প্রকার রোগ-ই যে মনকে আক্রান্ত ক'রে দেহে প্রকাশিত হয়—হোমিওপ্যাথদের এই সিদ্ধান্ত লোক-চিকিৎসকগণ স্বীকার ক'রেন কিনা সন্দেহ। তবে পীড়িত মানুষের মন যে সুস্থ থাকে না, অবিচল থাকেনা—সেকথা সবাই স্বীকার ক'রেন।

৩. রোগের উৎপত্তি বা কারণ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়, অতি প্রাচীন কালে, অ্যালোপ্যাথিক মতে-'দৈবশক্তি'র প্রভাব ও ক্রিয়াকেই রোগের উৎপত্তিমূল' ব'লে মনে করা হত। তারপর 'চার প্রকার দেহরসে'র বিকৃতি ই রোগের কারণ ব'লে স্বীকার করা হয়। আরও পরে একটি ভৌম জীবনী শক্তির বিপর্যয়কেই 'রোগ'-এর উৎস ব'লে মনে করা হ'তে থাকে। অতঃপর এসম্পর্কে নানা মতবাদের বিবর্তনের পর অধুনা পশ্চিমী চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কোষাণু বিকৃতিতত্ত্ব, বীজাণুতত্ত্ব, ভাইরাস তত্ত্ব ইত্যাদি প্রচলিত হ'য়েছে। আলোচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুযায়ী অধিকাংশ 'রোগ'-বাইরের নানাপ্রকার জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। নানা সূত্র থেকে জীবাণু শরীরে প্রবেশ ক'রে মানুষের স্বাস্থ্যের নানারকম অবনতি ঘটায়।

উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় রোগতত্ত্বের সঙ্গে কোন বিশেষ 'রোগ-দর্শনে'র সংযোগ নেই। আছে শুধু 'রোগ-বিজ্ঞান'-এর সম্বন্ধ। এজন্য এমতে রোগের উৎসমূল কোন 'শক্তি'-বিশেষর মধ্যে নিহিত নয়, বরং তা মানুষের পরিবেশ তথা আলো-হাওয়া, পানি-মাটি, জীব-জন্তু ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত।

কিন্তু প্রাচীন পন্থী চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী রোগের উৎস তিনটি 'দোষে'র মধ্যে নিহিত। একে আয়ুর্বেদের 'ত্রিদোষতত্ত্ব' বলা হয়। অথর্ববেদে 'ত্রিদোষ'কেই রোগমূল বলা হ'য়েছে।[৮] উক্ত বেদ অনুযায়ী 'ত্রিদোষ' যথাক্রমে 'জল', বায়ু ও 'অগ্নি'। 'চরক ও সুশ্রুত এগুলোকে যথাক্রমে শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্তে রূপান্তর ক'রেছেন। যদিও রোগমূল-নির্দেশে চরক ও বাগভটে মতভেদ আছে, তথাপি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য মত হিসেবে দেহস্থ পঞ্চবায়ু, পঞ্চ অগ্নি, সপ্তধাতু ও তিনটি দোষের মধ্যে-দোষবৈষম্যেই রোগের উৎপত্তি ঘটে"[৯] ব'লে মনে করা হয়। বৈশেষিক দর্শন অনুযায়ী 'তেজ'-এর প্রভাবেই 'পরামাণুর সৃষ্টি এবং এই 'তেজ' দ্বারা খাদ্য 'পাক' হয় এবং 'পাক' এর ফলে 'ধাতু' ও 'দোষ' এর উৎপত্তি ঘটে। কিভাবে তা হয়, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হ'য়েছে—'মানুষ আহার্য গ্রহণ ক'রলে, তা প্রাণ-বায়ু গ্রহণ ক'রে এবং খাদ্য পাকস্থলীতে পাঠায়। কিছুক্ষণ পর ঐ খাদ্য হজম করাবার জন্য অগ্নি উদ্দীপক 'সমান বায়ু'-অগ্নি উদ্দীপন ক'রে এবং ষড়রসের বিক্রিয়ায় 'কফ' বা 'শ্লেষ্ম' দোষের

উৎপত্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য অর্ধ–হজম হবার সময় দ্বিতীয় স্তরের বিক্রিয়া ঘটে এবং 'পিত্ত' দোষের উদ্ভব হয়। এ সময় ভুক্ত দ্রব্যের অল্পাংশ ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ ক'রে এবং বাকি অংশ বৃহদন্ত্রে প্রবেশ ক'রে 'মলে' পরিণত হয়। তখন যে তৃতীয় রকম বিক্রিয়া ঘটে–তা থেকেই উদ্ভূত হয় 'বাত' বা 'বায়ু'।[১০] এমনিভাবে খাদ্য গ্রহণের ফলে সৃষ্ট তিনটি দোষ–এর উৎপত্তি হয়। বাগভটের 'অস্টাঙ্গ–সংগ্রহ' অনুযায়ী উক্ত ত্রিদোষের সাম্যই স্বাস্থ্য আর বৈষম্যই রোগ। তাঁর মতে এই দোষত্রয়ের বৈষম্যেই 'ধাতু' বিকৃত হয় এবং রোগোৎপত্তি ঘটে।

পক্ষান্তরে, ইউনানি মতে, মানব–শরীর চার প্রকার রসের সাম্যে সুপরিচালিত। এগুলো হ'ল–'বলগম' বা 'শ্লেষ্ম', 'খুন' বা 'রক্ত' 'সাফরা' বা 'হলুদ পিত্ত' এবং সৌদা 'কালো' পিত্ত। মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ ক'রে, উইনানি মতে, তা চার পর্যায়ের পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে শরীরে পূর্বোক্ত চার রকম রসের সঞ্চার হয়। এগুলোর সাম্যে মানুষ সুস্থবোধ ক'রে এবং বৈষম্যে হয় পীড়িত। অতএব আলোচ্যমতে রোগের মূল, মানব–শরীরের চারি রসের বিকৃতির মধ্যেই নিহিত।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগের উৎসমূল নির্দেশ ক'রতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করা হ'য়েছে। হানিম্যান 'অর্গ্যানন'–এর দ্বাদশ সূত্রে লিখেছেন–"রোগোৎপাদক শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত জীবনীশক্তি নিজেই রোগ উৎপাদন ক'রে।"[১১] অর্থাৎ 'রোগশক্তি' ও জীবনীশক্তি এক নয়–পৃথক। উভয়েই শক্তিশালী, উভয়েই সূক্ষ্ম, উভয়েই অদৃশ্য। উভয়ের মধ্যে–'রোগশক্তি'–'জীবনী শক্তি'র ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারলেই মাত্র 'রোগ' হয়। কিন্তু সে রোগ 'রোগশক্তি' কর্তৃক উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় ঐ শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন 'জীবনী শক্তি'র সাহায্যেই। এ ক্ষেত্রে 'রোগশক্তি' যে মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, হ্যানিম্যান তাকে ব'লেছেন—'রোগবিষ'। তাঁর মতে 'রোগবিষ'-তিন রকম। যথা,—'সোরা' 'সাইকোসিস' ও 'সিফিলিস'। এই তিনটি 'রোগবিষ'–ই হোমিওপ্যাথি মতে সমস্ত রোগ–শক্তির তথা রোগের মূল। স্বয়ং হ্যানিম্যান এ সম্পর্কে লিখেছেন—"In Europe and also in other contiments so far as is known, according to all investigations, only three chronic miasms are found, the diseases caused by which manifest themselves through local symptoms, and from which most, if not all, the chronic diseases originate, namely, first, SYPHILIS, which I have also called the veneral chancre disease ; then SYCOSIS, or the fig-wart disease, and finally the chronic disease which lies at the foundation of the eruption of the itch ; i.e. the PSORA ; which I Shall treat of first as the most important."[১২] অতএব হোমিওপ্যাথি অনুযায়ী রোগমূল অদৃশ্য 'রোগবিষ'জাত রোগশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন জীবাণুশক্তিতেই নিহিত।

পক্ষান্তরে, বায়োকেমিক মতে,–মানবদেহ অসংখ্য কোষাণুর সমষ্টিমাত্র। এগুলোর পরিপোষণে বারোটি খনিজ লবণ–এর বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। তাই সেগুলোর ঘাটতির মধ্যেই রোগমূল নিহিত। সুসলার এই বারোটি খনিজ লবণজনিত ঘাটতিকে 'সেল–সল্ট ডেফিশিয়েন্সি' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।"[১৩] শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উক্ত বারোটি

লবণের এক এক রকম কোষাণুগত ঘাটতির ফলে টিস্যু বা তন্তু নানাভাবে আক্রান্ত ও বিকৃত হয়। তখন শরীরে বিশেষ বিশেষ ধরনের অসুস্থ লক্ষ্মণাবলী আত্মপ্রকাশ ক'রে এবং এগুলো থেকেই রোগের অবস্থা তথা, শরীরে কি ধরনের লবণগত ঘাটতি দেখা দিয়েছে—তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অতএব বায়োকেমিক মতে রোগমূল কোন 'অদৃশ্য 'রোগবিষে' নয়–বরং দেহস্থ 'সেল–সল্ট—ডেফিশিয়েন্সি'–র মধ্যেই নিহিত।

এক ই ভাবে লোক–চিকিৎসকরাও রোগ–মূল সম্পর্কে সচেতন এবং এ সম্পর্কে তাদেরও স্বতন্ত্র বক্তব্য বিদ্যমান। আলোচ্য চিকিৎসা, যেহেতু লোকায়তিক এবং অশিক্ষিত মানুষের কিংবা প্রাচীন পন্থী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের চিকিৎসা, সেজন্য রোগমূল সম্পর্কে 'ওঝা', 'ফকীর' প্রভৃতির নিকট থেকে কোন দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক বক্তব্য আশা করা যায় না। লোক–মন যেহেতু প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী, সংস্কারপরায়ণ ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন–সেজন্য তাদের রোগের কারণ সম্পর্কীয় চিন্তা–চেতনা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই ও. পি. জ্যাগ্‌গি লোক–মতে রোগের কারণ কি তা বর্ণনা ক'রতে গিয়ে লিখেছেন—গ্রাম্য চিকিৎসকদের মতে—" "Sickness is the resull of wrongdoing, sin (papa) and fault (dosha), If one has indulged in such acts in this life or in the past lives, he has to suffer from sickness and deprivations, the degree of which depends upon the extent of his sinfulness. Through one's sinful acts one not only brings sickness upon oneself, but also on the members of one's family or community."[১৪] তাদের এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে জ্যাগ্‌গি লোক–মতে রোগের কারণকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা, ১. শারীরিক বা প্রাকৃতিক কারণ ও ২. অতিপ্রাকৃত কারণ। এ দু'ধরণের কারণের মধ্যে প্রথোমক্ত কারণকে আবার পাঁচ ভাগে এবং শেষোক্ত কারণকে সাত ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। এগুলো যথাক্রমে ক. অপবিত্র আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কর্ম, খ. শারীরিক অপবিত্রতা, গ. অসম্যক আহার, ঘ. দূষিত জলবায়ু, ঙ. অতি মৈথুনাসক্তি এবং ক. পূর্বজন্মের পাপ, খ. দেব–দেবতার ক্রোধ, গ. অপদেবতার বা দুষ্ট আত্মার প্রভাব (এদের আবার দু'টি ভাগ–পূর্বপুরুষের দুষ্ট আত্মা ও ভূত–প্রেত), ঘ. যাদুক্রিয়া ঙ. বশীকরণ, চ. কুনজর এবং ছ. ট্যাবু লংঘন।[১৫]

উল্লেখযোগ্য যে, রোগের কারণ সম্পর্কে ও. পি. জ্যাগগির পূর্বোক্ত বিবরণ আংশিক সত্য এবং অসম্পূর্ণ। তিনি শুধু ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণের ধারণার অসম্পূর্ণ একাংশ উল্লেখ ক'রেছেন। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত 'রোগ–কারণ' পীরালী মতে নিম্নোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা,—

১. আসমানি বালা বা দৈবী ব্যাধি–আল্লাহ্ প্রদত্ত রোগ
২. জিসমনী বালা বা দুর্বিপাকজা পরিবেশগত ব্যাধি।
৩. জেসমানী বালা বা শারীরিক ব্যাধি–প্রকৃতি প্রদত্ত রোগ
৪. রুহান্নী বালা বা জ্বিন–পরী ঘটিত ব্যাধি–অশরীরী আত্মাপ্রদত্ত রোগ
৫. হাযওয়ানী বালা বা পশু–প্রাণীর দেহ থেকে আগত রোগ।[১৬]

এগুলোকে লৌকিক ধারণা অনুযায়ী নিম্নোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত করাই সমীচীন। যথা—

১. দৈবীরোগ বা আসমানী বালা বা খোদার গজব

২. আধি–দৈবী রোগ বা রুহাণী বালা জ্বিন–পরী, ভূত–প্রেত ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত ব্যাধি

৩. আধি–ভৌতিক রোগ বা জমিনী বালা তথা প্রাকৃতিক ও আকস্মিক (ভাঙা, মচকা, পুড়ে/যাওয়া, প'ড়ে যাওয়া, আহত হওয়া ইত্যাদি) ভাবে উৎপন্ন ব্যাধি ও

৪. ভৌতিক ব্যাধি বা জিছমানী বালা তথা শারীরিক ব্যাধি। আর

৫. জীবজন্তু থেকে আগত রোগ।

লোক–চিকিৎসকগণ দৈবী রোগ বা আল্লাহ'র গজব হিসেবে কুষ্ঠ, মহামারী, দুঃসাধ্য জ্বর, শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতিকে নির্দেশ ক'রেন। অতএব এর মধ্যে সাময়িক ও চিরস্থায়ী উভয় প্রকার রোগ–ই বর্তমান। আধি–দৈবী রোগ হিসেবে মনে করা হয়–এক বিশেষ ধরনের মৃগীরোগ ও মানসিক রোগকে যা–মূলত সাধারণ মৃগী বা মূর্ছা রোগ ও উন্মাদ রোগ থেকে ভিন্ন। এসব রোগকে 'জ্বিন–পরীর আছর', 'ভূত–প্রেতের আছর' ইত্যাদি বলা হয়। উপরি' ঘটিত বালা রোগ, কুনজর প্রভৃতিও এই পর্যায়ের। আধি ভৌতিক রোগের মধ্যে আকস্মিকভাবে আহত হওয়া, হাত–পা ভেঙে যাওয়া, কেটে যাওয়া, মচকে যাওয়া, গাছ বা উঁচু স্থান থেকে প'ড়ে যাওয়া, প্রসব–বেদনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর ভৌতিক ব্যাধি হিসেবে জ্বর, কাশি, হাঁফানি, ক্ষত, দাদ, চুলকানি, পেটের পীড়া, মাথার যন্ত্রণা, প্লীহা বেড়ে যাওয়া, আমাশয়, মেহ–প্রমেহ, স্তন প্রদাহ, পুঁয়ে পাওয়া বা অপুষ্টি, চোখ ওঠা, কান পাকা, বাগী, রক্তস্রাব, প্রভৃতি সমুদয় সাধারণ রোগকেই বোঝায়। অসম্যক আহার, দূষিত জলবায়ু, অতি মৈথুনাসক্তি ইত্যাদি কারণে এসব রোগের উৎপত্তি ঘটে। আর জীবজন্তু কর্তৃক সৃষ্ট বা গৃহপালিত পশু–কুকুর, বিড়াল, বানর, মশা, মাছি প্রভৃতি থেকে আগত ব্যাধি–ই হাওয়ানী ব্যাধি।

বলা–বাহুল্য, রোগের কারণ সম্পর্কীয় লোক–চিকিৎসকের অনেক কথাই বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করার উপায় নেই। সাধারণের নিকট সেগুলো বিশ্বাস এমন কি 'কুবিশ্বাস' তথা 'কুসংস্কার' মাত্র। কিন্তু 'বিশ্বাস' দিয়ে চিকিৎসা চলে না, বিশ্বাস, রূপ ধারণ ক'রে ক্ষতিও ক'রতে পারে না। লোক–চিকিৎসকগণের রোগের কারণ সম্পর্কীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সাধারণ বিশ্বাসের প্রধান পার্থক্য এই খানে যে, তিনি সে–বিশ্বাস দিয়ে চিকিৎসা ক'রতে পারেন এবং তাতে অবহেলা দেখালে আক্রান্ত, আহত, এমনকি সপরিবারে ক্ষতিগ্রস্থও হ'য়ে থাকেন।[১৭] অতএব রোগের উৎস সম্পর্কীয় ধারণা বা রোগ–দর্শন যে, চিকিৎসা–পদ্ধতি ভেদে বিভিন্ন তা স্বীকার্য। এই ভিন্নতা লোক–চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রকট ; তা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪. রোগের নিদর্শন

অসংখ্য রোগ বিভিন্ন রকমে মানব শরীরে ও মনে আত্মপ্রকাশ ক'রে। কারণ সমস্ত মানুষেরই মন ও শরীর এক নয়। প্রত্যেকেরই জীবনীশক্তি স্বতন্ত্র, রোগাক্রান্ত হবার প্রবণতাও আলাদা।

তাছাড়া রোগের প্রকৃতিভেদে, তার প্রকাশ ভঙ্গিটিও বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্যই কোন রোগ, কোন শরীরে ও মন দ্রুত লক্ষণ প্রকাশ ক'রে। আবার কোন শরীরে ও মনে ঐ রোগটিই দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ ক'রে। পুনরায়-কোন কোন রোগ—কারো কারো শরীরে ও মনে একই সময়ে ক্রিয়া প্রকাশ ক'রে, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে, আগে শরীরে ও পরে মনে ; কিংবা আগে মনে ও পরে শরীরে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন রোগে, মনেই লক্ষণাবলীর প্রকাশ ঘটে অধিক, শরীরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় অল্প, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন রোগে, শরীরেই লক্ষণ প্রকাশ পায় অধিক, মনে প্রকাশ পায় স্বল্প। তাছাড়া রোগ-বিশেষ সর্বশরীরে লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে, দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে বা অঙ্গে সর্বদাই নির্দিষ্ট রকমের লক্ষণাদি উৎপন্ন ক'রে। যেমন, চর্মরোগ, নেত্ররোগ, গণোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি। আবার কোন কোন রোগ সর্ব শরীরেই আপন ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটায়। যেমন, জ্বর, বসন্ত, শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। 'উন্মাদ' রোগে তো দেহ অপেক্ষা মনেই অধিকাংশ রোগ-লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রোগ-প্রকাশের এ রকম বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী রোগের বিভিন্ন রকম লক্ষণ নির্দেশ ও নামভেদ। তাই রোগ-নাম সর্বমতে ও সর্বকালে অভিন্ন নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাশয় রোগের উল্লেখ করা যায়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী আমাশয় তিন রকম। যথা, 'অ্যামোবিক ডিসেন্ট্রি, 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি' ও 'ক্যাটারাল ডিসেন্ট্রি'। এগুলোর মধ্যে 'অ্যামোবিক ডিসেন্ট্রি' সাংঘাতিক আন্ত্রিক ক্ষত রূপে, মৃদু লক্ষণ সম্পন্ন আন্ত্রিক ক্ষতরূপে লক্ষণ বিহীন আন্ত্রিক ক্ষত রূপে, লিভার-স্ফোটক রূপে কিংবা অন্য কোন অন্ত্রবহির্ভূত ক্ষত রূপেও প্রকাশ পেতে পারে। এই ক্ষতের উৎপত্তি মূলে যে-জীবাণু সক্রিয় ভূমিকা পালন ক'রে তার নাম-'Entamoebat hysolytica' এই পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণুটি দুভাগে শরীরে বিদ্যমান থাকে। প্রথমত 'ট্রোফোজোয়াইট' বা সক্রিয় ও স্বতন্ত্র রূপে এবংঅচল 'সিস্টিক' কোষাণু আকারে। এরকম অবস্থায় অন্ত্রের মধ্যে এই পরাঙ্গপুষ্টজীবটি ক্রিয়াহীন, ওষুধ-প্রতিরোধক এবং মলাদির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অন্ত্রমধ্যে কিভাবে যে এরা ক্ষতের সৃষ্টি ক'রে তা আজো জানা যায়নি। শরীরের বাইরে গঠিত 'সিস্ট'গুলোই মাছি, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ ক'রে রোগ সংক্রমণের উৎসে পরিণত হয়। আলোচ্য জীবাণুর পূর্বোক্ত স্বতঃশ্চল অবস্থাটি কিন্তু রোগ সৃষ্টি ক'রতে পারে না। কারণ চলমান অবস্থায় ওগুলো পাকস্থলীর ক্ষারীয় রসে মারা যায়।

পক্ষান্তরে, হোমিওপ্যাথি অনুযায়ী 'আমাশয়' কোন রোগ-নাম নয়। এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে 'আমাশয়' ব'লতে যে রোগাবস্থাকে বোঝানো হয়, তার বিশেষ লক্ষণ বা প্রকৃতিই প্রধান বিবেচনার বিষয়। এ-রোগের নাম-বিভাগ থেকে বিশেষ সাহায্য লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-সাংঘাতিক রকম আক্রান্ত অবস্থায় তিনজন আমাশয় রোগগ্রস্ত মানুষ তিন রকম লক্ষণ প্রকাশ ক'রতে পারে এবং ক'রে থাকে। একজনের 'আমরক্তে'-রক্তের রং অত্যন্ত উজ্জ্বল থাকতে পারে, আর একজনের রক্তের মধ্যে ফেনময়তা থাকতে পারে অপর জনের রক্ত মলিন বর্ণের হ'তে পারে। কারো নির্গত পদার্থে ভীষণ দুর্গন্ধ থাকতে পারে, কারো

সামান্য দুর্গন্ধ থাকতে পারে। কারো আদৌ কোন গন্ধ না থাকতে পারে। নির্গত পদার্থ কারো ঠাণ্ডা হ'তে পারে, কারো গরম হ'তে পারে, কারো বা সাধারণ (ঠান্ডা বা গরম কোনটাই নয়) হ'তে পারে। ঐ তিনটি রোগীর কারো প্রবল পিপাসা, ছটফটানি ও অন্তর্দাহ থাকতে পারে, কারো ভীষণ শীতল জলের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, কারো বা সামান্য পিপসা কিংবা আদৌ কোন পিপসা, অস্থিরতা নেই, এমন হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনটি রোগী সাধারণ বিবেচনায় একই রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হলেও হোমিওপ্যাথি মতে তারা তিনজন-ই পৃথক পৃথক রোগের রোগী। অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে হয়তো প্রমাণিত হ'তে পারে যে, এই তিনটি রোগী একই 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি'তে আক্রান্ত হ'য়েছে।

আবার আয়ুর্বেদ অনুযায়ী উক্ত 'আমাশয়' রোগটি 'অতিসার'-এর অন্তর্ভূক্ত এবং তা 'বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শোকজ এবং আমজনিজ"[১৯] এই ছ'ভাগের অন্যতম 'প্রবাহিকা'র দুটি ভাগ-'রক্তাতিসার' ও 'আমাতিসার' নামে পরিচিত বিভাগের কোন একটিতে প'ড়তে পারে। লোক-চিকিৎসা অনুযায়ী আমাশয় কিন্তু এত বিভিন্ন রকমের বিভক্ত নয়। বরং তা সহজ-সরল দুভাগে বিভক্ত। যথা-'শাদা আম' ও 'রক্ত আম'।

এমনিভাবে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা-পদ্ধতি, রোগ-নিরূপণের নানা উপায় ও বিভিন্ন নাম নির্দেশ ক'রেছে। রোগী-নিরপেক্ষ এইসব রোগ-লক্ষণ-নির্দেশিকা ও নাম-পরিচয়াত্মক স্বাতন্ত্র্য, প্রত্যেকটি চিকিৎসা-পদ্ধতির মতই লোক-চিকিৎসাতেও বিদ্যমান। এর অপর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—লোক-চিকিৎসকগণ সমস্ত 'জ্বর'কেই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা উপলব্ধির প্রয়াস পান। তাঁদের মতে, যে জ্বরে রোগিণী নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে থাকে, অজ্ঞান থাকে কিংবা বিড়বিড় ক'রে, অজ্ঞান অবস্থায় তীব্র ভাবে হাত-পা মোড়ায়-শরীরের উপরিভাগে কোন তাপ থাকে না, ভিতরে জ্বলে যায়, বুক ফেঁসে যায়-সেসব জ্বর উপ্‌রি-ঘটিত ব'লে নির্দেশ করা হয়। শুধু ওষুধপত্র দিয়েই তা চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আবার যে জ্বর মৃদু, বাহ্যিক কোন লক্ষণাদি দ্বারা বোঝা যায় না, কিন্তু 'হাত ধরলে' বা নাড়ী পরীক্ষা ক'রলে টের পাওয়া যায়-সেসব জ্বরকে তারা ব'লেন জ্বিনপরীর প্রভাবজাত জ্বর। এই ধরণের জ্বর রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা ক'রে ধরা যায় না। থার্মোমিটারেও ধরা প'ড়ে না। এমনিভাবে 'বাণ' মারা রোগীর গলা দিয়ে 'রক্তওঠা' বা 'রক্ত বমি' আর যক্ষ্মারোগীর 'রক্ত-মমন' ও তাঁরা পৃথক পৃথক লক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি ক'রেন। এরূপে লোক-চিকিৎসকগণ, রোগের লক্ষণগত বিভিন্নতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন ও তদনুযায়ী চিকিৎসা ক'রেন। তাঁরা যে সব বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে এইসব রোগ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ মূল্য নিশ্চিত রূপে নির্ধারণ ক'রেন এবার সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫. রোগ-নিরূপণ

প্রত্যেকটি চিকিৎসা-পদ্ধতি ই রোগী পরীক্ষার ক্ষেত্রে, কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন ক'রে থাকে। কেননা, প্রত্যেক চিকিৎসকের নিকট ই প্রত্যেকটি রোগী এক একটি সমস্যা।[২০] এজন্য চিকিৎসাশাস্ত্র মাত্রেই এক একটি 'বিজ্ঞান' বটে, কিন্তু চিকিৎসাকর্ম একটি 'শিল্প মাত্র'। বিজ্ঞান আয়ত্ব করা যায়, কিন্তু 'শিল্প' উপলব্ধি ক'রতে হয়।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি বা অ্যালোপ্যাথি অনুযায়ীও তাই রোগী পরীক্ষার জন্য শুধু ব্যক্তি বিশেষ-এর রোগ-বিজ্ঞানগত শারীরিক অবস্থা বিপর্যয়ের ধরণ ও তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কিংবা অনুসন্ধান করা হয় না। সেই সঙ্গে..."His heredity, his environment and his bodily and mental characteristics are all of importance."[২১]

এজন্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের রোগী-লিপিকে বলা হ'য়েছে-"এ ব্রীফ বায়োগ্রাফি"।[২২] একাজে রোগীর নিজের, তার পরিবার-পরিজনের, বন্ধুবান্ধবের-সকলের সহায়তা গ্রহণের নির্দেশ ও বিধৃত। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। রোগীর সামগ্রিক অবস্থা জরীপের জন্য এভাবে প্রাপ্ত 'ফাংশনাল' লক্ষণাবলী শুধু নয়, 'অর্গ্যানিক' লক্ষণাবলীও বিশ্লেষণ করা হয়। আর সেজন্যে যেসব ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা অবলম্বিত হয়, তা মোটামুটি আটটি ভাগে বিভাজ্য। এগুলো যথাক্রমে-মূত্র এবং মূত্রগ্রন্থির কার্যকলাপ সংক্রান্ত পরীক্ষা, রক্তের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা, পাকস্থলী সংক্রান্ত পরীক্ষা, মল সংক্রান্ত পরীক্ষা, পূজাদির জীবাণু সংক্রান্ত পরীক্ষা,থুথুর জীবাণু সংক্রান্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্ক কশেরুকাগত তরল পদার্থ সংক্রান্ত পরীক্ষা ও তন্তুর কলাসংস্থানজনিত পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।[২৩] সাধারণতঃ জ্বরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য 'থার্মোমিটার', বুকের শ্লেষ্মার আধিক্য উপলব্ধির জন্য 'স্টেথিস্কোপ' হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াপরিমাপের জন্য 'কার্ডিওমিটার' প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

অনুরূপভাবে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা অনুযায়ীও রোগ নিরূপণের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি র'য়েছে। চরকের মতে তিনটি উপায়ে রোগ-নিরূপণ সম্ভব। যথা,-আপ্তোপদেশ বা বিজ্ঞদের বচন, নিরীক্ষণ বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সুশ্রুত এর সঙ্গে জিজ্ঞাসন ও যুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রোগ নির্ণয়ের জন্য মাধব কর 'নিদানে' 'পঞ্চলক্ষণে'র উল্লেখ ক'রেছেন।[২৪] উক্ত লক্ষণগুলো হ'ল-চয়, প্রকোপ, প্রসার, পূর্বরূপ এবং রূপ। একে নিদানে, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি ও বলা হ'য়েছে। আলোচ্য মতে একটি রোগ এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম ক'রে। অতএব এই অবস্থাদির বিচার, ধাতু-বিচার বা ধাতুগত অবস্থা-বিচার তথা দোষাদির প্রাবল্য বিচার, রোগ-নির্ণয়ের অপরিহার্য শর্ত। মধ্যযুগে-এর সঙ্গে নাড়ী-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা, স্বর-পরীক্ষা ও মূত্র-পরীক্ষা ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয়। মূলতঃ ইউনানী চিকিৎসার প্রভাবেই এগুলো ষোল শতকের মধ্যে আয়ুর্বেদের অন্তর্ভূক্ত হয়। আরও পরে, আধুনিক কবিরাজগণ অনেকে স্টেথেস্কোপ, থার্মোমিটার ইত্যাদির ব্যবহারও নিজেদের চিকিৎসা-পদ্ধতির অন্তর্গত ক'রে নিয়েছেন।

ইউনানী চিকিৎসাগণও আর্য়ুবেদী চিকিৎসকগণের মতই বিজ্ঞাবচন, প্রত্যক্ষ-দর্শন ও অনুমান-,[২৫] জিজ্ঞাসাদির মাধ্যমে রোগ-নির্ণয়ে যত্নবান হন। ভারতীয়দের পূর্বে আরবীয় চিকিৎসকগণ-ই প্রথম রোগী পরীক্ষার নিমিত্ত রোগীর নাড়ী ও মূত্র-পরীক্ষার প্রবর্তন ক'রেন। নেত্র, জিহ্বা ও স্বর-পরীক্ষাও ইউনানী চিকিৎসা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত। কিন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের মল-মূত্র-নেত্র-নাড়ী ইত্যাদি পরীক্ষা আর আয়ুর্বেদী ও ইউনানী চিকিৎসার ঐ সব পরীক্ষা এক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় নাড়ী-পরীক্ষা বা 'পালস পরীক্ষা' নাড়ীর স্পন্দনের গাণিতিক

হিসাব মাত্র। পক্ষান্তরে ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসায় নাড়ী–পরীক্ষা স্পন্দনগত গাণিতিক হিসাব নয়। মিনিটে কতবার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যা হচ্ছে তা আয়ুর্বেদী চিকিৎসকের নিকট অবান্তর। তার পরিবর্তে তাঁরা, তিনটি নাড়ীর মধ্যে, যে নাড়ীত্রয় উভয় হাতের মণি বন্ধের নিকট পরস্পর বাদ্যযন্ত্রের তারের মত পাশাপাশি সাজানো, কোনটি তীব্র বেগে এবং কি ধরণের তীব্রতার সঙ্গে স্পন্দিত হ'চ্ছে তাই লক্ষ্য ক'রেন। ত্রিদোষের বিভিন্নতা অনুযায়ী নাড়ীত্রয়ের গতি বা কম্পনের বিভিন্নতা ঘটে। ফলে নাড়ীর গতি উপলব্ধি ক'রতে পারলে শুধু রোগ–নির্ধারণ নয়–সুস্থতা, মৃত্যু, এমন কি মানুষ ও পশুর ভেদও বোঝা যায়।

যা হোক, হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসা–পদ্ধতি অনুয়াযী ও রোগ–নির্ণয়ে ব্যাপক বিচার–বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। হ্যানিম্যান রোগ–নির্ধারণের জন্য কোন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা–নিরীক্ষার কথা ব'লেননি। তিনি ব'লেছেন–রোগ নিরূপণের জন্য "রোগীর শারীরিক গঠন, তাহার মানসিক ও চরিত্রগত বিশেষত্ব, তাহার জীবিকা, তিনি কিভাবে বাস ও বেশ–ভূষা ক'রেন, তাহার সামাজিক ও গার্হস্থ্য সম্বন্ধে সকল, বয়স, দাম্পত্য ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সমস্তই বিবেচনা করিতে হইবে।"[২৬] পরবর্তী হোমিওপ্যাথগণ এর সঙ্গে কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাদিরও সংযোগ স্থাপন ক'রেছেন এবং বর্তমানকালে আলোচ্য চিকিৎসা–পদ্ধতিতে অ্যালোপ্যাথির শারীর–বিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান, এবং 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা', প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন চিকিৎসক ওষুধ প্রয়োগের পূর্বেকার শারীরিক অবস্থা এবং ওষুধ প্রয়োগের ফলে সংঘটিত রোগীর তন্তু–কোষাণু বা জীবাণুগত পরিবর্তন সমূহও লক্ষ্য ক'রে থাকেন।

বলাবাহুল্য, লোক–চিকিৎসাতেও রোগ–নিরূপণের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তার সঙ্গে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসা–পদ্ধতির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তবে আয়ুর্বেদী–ইউনানী চিকিৎসা–পদ্ধতির মত লোক–চিকিৎসায় ও আপ্তজ্ঞান, নিরীক্ষণ, অনুমান ও জিজ্ঞাসাদি রোগ–নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। লোক–চিকিৎসকগণ রোগীর সার্বিক অবস্থাও পর্যালোচনা ক'রেন। বিবেচনা ক'রেন প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পীড়া–প্রকৃতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–'উন্মাদ', 'আছর', 'মৃগী', ও উপরি'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়? লোক–চিকিৎসকগণ–ই বা কিভাবে একজন জ্বিন–ভূতগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে একজন সাধারণ উন্মাদ রোগীর পার্থক্য নিরূপণ ক'রেন?

উল্লেখযোগ্য যে, লোক–চিকিৎসক, যে–রোগী, জ্বিন–পরী বা ভূত–প্রেত–কবলিত ব'লে নির্দেশ ক'রেন, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারগণ তাদের মানসিক রোগী ব'লে চিহ্নিত ক'রেন। তাঁদের মতে ওরা 'উন্মাদ'। হোমিও মতে সোরার প্রাবল্যজাত মানসিক ভাবে বিশৃংখল ব্যক্তি সে। কিন্তু 'উন্মাদ' হিসেবে ধর্তব্য এইসব রোগী ও অন্যান্য উন্মাদ–রোগীর রোগের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, গুণ এবং প্রকৃতিগতও। সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক' চিকিৎসকগণ প্রায় নীরব। পক্ষান্তরে লোক–চিকিৎসকগণ তাদের নিজস্ব 'টেকনিকে'র সাহায্যে সাধারণ উন্মাদ বা মানসিক রোগীর সঙ্গে তথাকথিত জ্বিন–পরী–ভূতগ্রস্ত রোগীদের পার্থক্য নির্দেশ ক'রেন। এই ধরনের রোগ–নির্দেশক–প্রদ্ধতির মধ্যে তেল প'ড়ে রোগীর চোখে নাকে ও শরীরে দেওয়া, রোগীর পৃষ্ঠদেশে মন্ত্রপূত কাঁসার থালা লাগানো, তুলারাশি লোকের হাত চালান দেওয়া, দড়ি

প'ড়ে মাপ দেওয়া, নতুন কাপড় প'ড়ে তা' রোগীকে পড়িয়ে এক রাত রেখে পরদিন সকালে খুলে নিয়ে কাপড়টি দৈর্ঘ্যে বেড়েছে কিনা তা মেপে দেখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর কোন কোনটি সন্দেহজনক, ও রোগ-নিরুপণে সহায়ক ব'লে মনে হয় না, কিন্তু কোন কোনটি যর্থাথই রোগ নিরুপণ ক'রে থাকে। যেমন 'পিঠে থালা লাগানো, 'হাত চালান দেওয়া' প্রভৃতি। সাধারণভাবে রুগ্ন, উন্মাদ বা মানসিক ব্যধিগ্রস্ত রোগীর পিঠে মূত্রপুত থালা লাগেনা, পক্ষান্তরে 'আছর'-সম্পন্ন রোগীর পিঠে থালা লেগে থাকে।

সর্পবিষ-চিকিৎসার সময়ও, ওঝা, রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তিনি 'ধূলা পড়া' দিয়ে তুলারাশি লোকের 'হাত চালান' দিয়ে দেখেন, যে সাপে কামড়েছে-সেটি বিষধর কিনা, রোগীর দেহে বিষ আছে কিনা এবং থাকলে, সে বিষ কতদূর পর্যন্ত উঠেছে। আবার বিষ নামাবার পরও তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখেন-যথার্থই বিষ নেমেছে কিনা, রোগী বিপদমুক্ত হ'য়েছে কিনা।

জ্বরাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে লোক-চিকিৎসকগণ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে থাকেন। পূর্বেই বলা হ'য়েছে-নাড়ী পরীক্ষার প্রাচীনতম নিদর্শন আরব-চিকিৎসকদের রচনাতেই প্রথম লাভ করা যায়। আদি মধ্যযুগের বাংলাদেশে এই রোগ-নিরুপণ পদ্ধতি আয়ুর্বেদের অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু কিভাবে তা' লোক-চিকিৎসায় চলে আসে, তা' বলা কঠিন। রোগ-নিরুপনের এই পদ্ধতিটি হয়তো এদেশের নিজস্ব পদ্ধতি-অথবা তা' এদেশের লোক-চিকিৎসায় ইরানীয়-আরবীয় অবদান। লোক-চিকিৎসকগণ নাড়ী-পরীক্ষা ক'রে কোনটি কি ধরনের জ্বর তা বুঝতে সমর্থ হন। এমন কি এর সাহায্যে দক্ষ লোক-চিকিৎসক রোগীর জীবনীশক্তির পরিমাণ, মৃত্যুকাল প্রভৃতিও সঠিকভাবে নিরুপণ ক'রতে পারেন। একে 'হাতধরা' ব'লে।

অপদেবতার কারসাজিজনিত পেটব্যথা নির্ধারণ ক'রতে 'গ্লাস বসানো' হ'য়ে থাকে। এজন্য একটি মেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে রোগীর মন্ত্রপূত পেটের বা নাভির উপর বসিয়ে একটি কাঁসার গ্লাস দিয়ে তা' ঢেকে দেওয়া হয়। ব্যথাটি যদি দুষ্টাত্মার প্রভাবজ হয়, তাহ'লে গ্লাসটি টেনে তোলা যায় না, আর তা না হ'লে ওটি উঠে আসে।

সাপ এবং পোকা-মাকড়ের প্রভেদ নিরুপণের জন্য লোক-চিকিৎসকগণ দংশিত স্থানে লোহা চেপে ধরেন। সর্প-দংশন হ'লে উক্ত স্থান তীব্রভাবে যন্ত্রণা ক'রে ওঠে। অন্যথায় কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

এমনিভাবে অনেক রকমে লোক-চিকিৎসকগণ 'রোগ-নিরুপণ' ক'রে থাকেন।

৬. রোগের শ্রেণীগত বিবরণ

বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি রোগমূল সম্পর্কে স্ব স্ব রোগতত্ত্ব ও রোগ-দর্শন ব্যক্ত ক'রলেও বাস্তব চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐসব তত্ত্ব ও দর্শন সর্বদাই সংগতি সম্পন্ন ব'লে প্রমাণিত হয় না। তাই দেখা যায়, আয়ুর্বেদ অনুযায়ী সমস্ত রোগ-মূল ত্রিদোষে প্রোথিত হ'লেও সমস্ত মানুষেই মাত্র তিন প্রকার রোগ হয় ব'লে ভিষকগণ দাবি ক'রেননি। চরক মতে, সব রোগ-ই চিকিৎসাযোগ্য নয়। ফলে রোগ 'সাধ্য' ও 'অসাধ্য' ভেদে দু'রকম। এ ছাড়া 'সামান্য ও

সাংঘাতিক', আমাশয়িক ও পাকাশায়কি' এবং 'চির ও সাময়িক' ভেদেও 'রোগকে তিনি দু'দু'ভাগে ভাগ ক'রেছেন।[২৭] সুশ্রুত মতে, (ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে) রোগ তিন ভাগে বিভাজ্য। যথা,-আধি-দৈবি বা প্রাকৃতিক রোগ-(যেমন-মৌসুমী রোগ, যাদুটোনা-অভিশাপ-জনিত রোগ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বৃদ্ধত্ব ইত্যাদি জনিত রোগ।), আধিভৌতিক রোগ (যেমন-পরিবেশজাত তথা অস্ত্রাঘাত, পশুর আক্রমণ, সর্পদংশন ইত্যাদি জাত রোগ), ও ভৌতিক বা কায়িক রোগ (যেমন-পুরুষাণুক্রমিক কুষ্ঠ, অর্শ প্রভৃতি রজঃবীর্য গত রোগ, সহজাত রোগ-জন্মান্ধ, খঞ্জ, বধির ইত্যাদি) এবং আহার্যের কারণে উৎপন্ন শারীরিক-মানসিক রোগ)।[২৮] পক্ষান্তরে, বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ' মতে রোগ সাত রকম। যথা-সহজাত (পুরুষাণুক্রমিক), গর্ভজাত, জাতজ, পীড়াজ, কালজ, প্রভাবজ ও স্বভাবজ। এগুলোও আবার তিনি দু' দুভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। কিন্তু এসব বিভাগ ঠিক রোগ-বিভাগ নয়-রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটি গুচ্ছ-বিভাগ। একে উপেক্ষা ক'রে মূল তত্ত্বানুযায়ী ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, আলোচ্য মতে, সমস্ত পীড়াই-হয় বায়ু প্রধান, না হয় পিত্ত প্রধান, না হয় শ্লেষ্মা প্রধান। কিন্তু এ ব'লে ও রেহাই পাওয়া যায় না। কারণ সমস্ত রোগ-ই এরকম জলাচলভাবে বিভক্ত নয়। ফলে তত্ত্বকে ঠিক রাখার জন্য মিশ্রদোষজাত রোগ ব'লে বহুরোগের ব্যাখ্যা দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ জ্বরের উল্লেখ করা যায়। মাধব ক'রের 'নিদান' গ্রন্থে বলা হ'য়েছে-জ্বর আট রকম। এগুলো হ'ল 'পৃথকজাত', 'দ্বন্দ্বজাত', 'সান্নিপাতিক', 'আগন্তজ' ইত্যাদি। এর মধ্যে পৃথকজাত জ্বর তিন রকম। যথা,-'বাতপিত্তজ', 'বাতশ্লেষ্মজ' ও পিত্তশ্লেষ্মজ। 'সন্নিপাতজ জ্বর' ব'লতে মিলিত ত্রিদোষ জনিত জ্বর বোঝায়। আর 'আগন্তজ জ্বর' হ'ল অভিঘাতাদি জনিত জ্বর।'[২৯] এছাড়া তিনি চরকের বরাত দিয়ে ব'লেছেন-ত্রিদোষের হীন, মধ্য, উল্বন অবস্থাভেদে এক সন্নিপাত জ্বর-তের রকম,[৩০] মাধব কর তাই রোগ বিবরণ দিতে গিয়ে আশি প্রকার প্রধান প্রধান রোগের উল্লেখ ক'রেছেন। পক্ষান্তরে চরক-সংহিতায় পঞ্চাশ প্রকার এবং সুশ্রুত-সংহিতায় 'সাঁইত্রিশ প্রকার' রোগের বিবরণ বিদ্যমান। এ থেকেই বোঝা যায়, পীড়াতত্ত্বের সঙ্গে পীড়া—প্রকৃতি এবং পীড়ার বিভিন্নতা কত প্রকট। এক ই কথা ইউনানী চিকিৎসা সম্পর্কে ও প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে সর্বাধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের রোগ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,-অস্ত্রোপচারমূলক রোগ বা 'সার্জিক্যাল ডিজিজ', ঔষধ প্রয়োগমূলক রোগ বা মেডিসিনাল ডিজিজি' এবং অন্যান্য 'সিন্ডোস' বা বিশেষ ধরনের রোগ-যা মানব-দেহের 'অর্গ্যানিক' বা 'ফাংসনাল' বিপর্যয় ঘটায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এত বেশি বিভিন্ন রকম রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় যে, তা' অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অতি বিকশিত অবস্থার নানা তত্ত্ব-তথ্য দিয়েও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অ্যালোপ্যাথিক রোগ-তত্ত্বের পাশাপাশি অ্যালোপ্যাথিক রোগ-বিবরণও তাই পূর্বের মতই অসমঞ্জস। আলোচ্য চিকিৎসা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে শারীরবিদ্যাবিদ্‌দের ব্যবচ্ছেদবাদী এবং তন্তু-কোষাণুজীবাণু প্রভৃতি-বাদীদের খণ্ডিত-দৃষ্টির বাণিজ্যিক প্রসারতার জন্যই, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যাবিদ্ 'কোষাণুতত্ত্বে'র আংশিক বিচার-বিবেচনাকেই সারাৎসারে পরিণত ক'রে তুলেছেন। ফলে, তাঁরা মানুষের সার্ব-দৈহিক

সামাগ্রিক 'জৈবতত্ত্ব'কে উপেক্ষা ক'রছেন। অ্যালোপ্যাথিক মতে, রোগ-বিচার তাই, এখন আর দেহের সামগ্রিক অবস্থার বিচার নয়-তা' 'অর্গ্যানিক' কিংবা 'ফাংশনাল' অবস্থা-বিপর্যের বিচার মাত্র। এজন্য আলোচ্য মত রোগভেদ, প্রত্যেক রোগের প্যাথলজিক্যাল অবস্থাভেদ ও তৎসংক্রান্ত নাম-ভেদ মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সার্বভৌম নয় ব'লেই মানসিক রোগ, ফাইলেরিয়া, হার্ট ডিজিজ, পুরুষাণুক্রমিক রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির কারণ এখনও অনির্ণেয় এবং তাদের ব্যাখ্যাও নানা রকম ধারণা প্রসূত।

বস্তুত : রোগের বিপুল সংখ্যা-বৈচিত্র্য ও অবস্থাভেদের জন্য হোমিওপ্যাথিক মতেও ত্রিদোষ সাপেক্ষে রোগ মাত্র তিন রকমের নয়। বরং তা বিপুল। তথাপি হোমিওপ্যাথিক মতানুযায়ী রোগ-'চির'ও 'অচির' ভেদে দু'রকম। এ মতে তিনটি 'রোগ-বিষ'-ই যেহেতু সমস্ত রোগের মূল, সেজন্য মানব দেহ, ঐ তিনটি রোগ-বিষের কারণে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বা চির রোগে আক্রান্ত হয়। সাময়িক বা অচির-রোগ সমূহ এই দীর্ঘস্থায়ী রোগের-ই বিভিন্ন রকম উচ্ছ্বাস মাত্র। সেজন্য হোমিওপ্যাথিতে রোগের অন্য কোন রকম শ্রেণীভেদ কিংবা নাম-বিবরণের সার্থকতা নেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারীতি অনুযায়ী রোগও যেমন অসংখ্য, ওষুধ ও তেমনি অসংখ্য। এমন কি রোগের জীবাণুকে ও 'ইমমিউনিটি'র সাহায্যে নয়, অতি সূক্ষ্মমাত্রায় খণ্ড খণ্ড ক'রে রোগ-আরোগ্যে প্রয়োগ করা হয়। তা সত্ত্বেও সমস্ত রোগ-ই যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধে আরোগ্য হয়-তা' নয়।

কিছু কিছু রোগ আছে, যা' একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রমের পর আর আরোগ্যের আশা করা যায় না। এজন্য হোমিওপ্যাথিতেও রোগসাধ্য, দুঃসাধ্য ও অসাধ্য-এই তিন রকম। অনুরূপ উক্তি বায়ো-কেমিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ও প্রযোজ্য।

অন্যদিকে, লোক-চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলে দেখা যায়-লোক-চিকিৎসায় ও এল্যোপ্যাথিক চিকিৎসার মতই রোগ-নামের বিভিন্নতা দ্বারা রোগ-নির্দেশ করা হয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক যেহেতু বিজ্ঞানী, সেজন্য তিনি কারো গাত্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি পেলে তাকে শুধুমাত্র 'জ্বর' ব'লতে সঙ্কোচবোধ ক'রেন। তিনি রোগীর রক্ত পরীক্ষা ক'রে, মল-মূত্র পরীক্ষা ক'রে, যদি টাইফাস-জীবাণু দেখতে পান তবেই মাত্র-ব'লেন ওটি টাইফয়েড জ্বর, আর যদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখতে পান, তাহ'লে ব'লেন ওটা ম্যালেরিয়া জ্বর। কিন্তু লোক-চিকিৎসক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারে ও সমর্থ নন, জীবাণু ও চেনেন না। ফলে জ্বর হ'লে তার নিজস্ব বিচার, অভিজ্ঞতা, পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্ত এবং সেগুলোর সামাজিক স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব পরীক্ষানুযায়ী ব'লেন-ওটা 'গরম লাগা 'জ্বর' কিংবা 'বাতশ্লেষ্মা জ্বর' অথবা 'ঠাণ্ডার পর গরম' কিংবা 'গরমের পর ঠাণ্ডা' লাগা জ্বর। অথবা কোন ভূত-প্রেত-উপরি ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট 'জ্বর'। সব জ্বর বা সব রোগ-ই যে চিকিৎসাযোগ্য, লোক-চিকিৎসক তা' দাবী ক'রেন না। তাই লোক-চিকিৎসা অনুযায়ী ও রোগ-সাধ্য, দুঃসাধ্য ও অসাধ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত। লোক-চিকিৎসক যে সব রোগ চিকিৎসা ক'রে থাকেন, সেগুলো যেমন বিচিত্র তেমনি বিভিন্ন। এখানে এরূপ শতাধিক রোগ-নামের উল্লেখ করা হ'ল। যথা—,

১. অগ্নিদগ্ধ
২. অর্শ
৩. অজীর্ণ
৪. আসর (আছোর)
৫. আমাশয়
৬. আমবাত
৭. আঞ্জনী
৮. উদরাময়
৯. উকি ওঠা
১০. উকুন
১১. একশিরা
১২. কান পাকা
১৩. কানে জ্বালা
১৪. কান চাটই
১৫. কাশি
১৬. কোমরে ব্যথা
১৭. কোষ্ঠকাঠিন্য
১৮. ক্রিমি
১৯. ক্রিমিশূল
২০. গরম লাগা
২১. গর্ভপাত
২২. গর্ভমোচন
২৩. গলাফোলা
২৪. গলায় ঘা
২৫. গলায় কাঁটা
২৬. ঘা (ক্ষত)
২৭. চুল ওঠা
২৮. চুলকানি
২৯. চর্মরোগ
৩০. ছুলি (শ্বেতী)
৩১. ছুঁৎ লাগা
৩২. চোখ লাগা
৩৩. চোখ উঠা
৩৪. চোখে জ্বালা
৩৫. চোখে বাতাস লাগা
৩৬. কামোল (জণ্ডিস)
৩৭. দাঁতে ব্যথা
৩৮. দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া (দাঁত বসা)
৩৯. দাঁত ফেলা
৪০. দাহ নিবারণ (জ্বরগত)
৪১. ধাতু ভাংগা (বেত স্রালন)
৪২. ধাতু পুষ্টি
৪৩. নালি ঘা
৪৪. নাই পচা (নাভিটলা)
৪৫. নাক দিয়ে রক্ত পড়া
৪৬. পায়ের গোড়ালী ব্যথা
৪৭. পা ভাংগা
৪৮. পা মচ্‌কা
৪৯. পা ফাটা
৫০. প্যায়ের অঙুলির মধ্যে ঘা
৫১. 'পক্ষাঘাত (প'ড়ে যাওয়া)
৫২. ব্যথা
৫৩. বাতাস লাগা
৫৪. পা ফোলা
৫৫. প্রমেহ
৫৬. পেটের শূল ব্যথা
৫৭. প্রস্রাব বন্ধ
৫৮. পিত্তের দোষ
৫৯. পিপাসা
৬০. প্লীহার বৃদ্ধি
৬১. ফিট (মূর্ছা)
৬২. ফিক্ লাগা
৬৩. ফোঁড়া
৬৪. ফাল লাগা
৬৫. বাঁজা (বন্ধ্যা)
৬৬. বাত
৬৭. বাধক ব্যথা
৬৮. বিছানায় প্রস্রাব
৬৯. বিষ লাগা
৭০. বিষ খাওয়া
৭১. পাগল হওয়া
৭২. জ্বিনে ধরা
৭৩. পরীতে ধরা
৭৪. ভূতে ধরা
৭৫. পেত্নীতে ধরা
৭৬. আঁচিল
৭৭. অ্যাড়া বিষ
৭৮. ইঁদুরের কামড়
৭৯. উপরির আসর
৮০. উদরী
৮১. উম্মাদ
৮২. উপদংশ
৮৩. কলেরা
৮৪. কেটে যাওয়া
৮৫. কেনি ডাবা
৮৬. কুক্‌চি ফোলা
৮৭. কুষ্ঠ
৮৮. কুকুরের কামড়
৮৯. কোড়ল
৯০. খাউনি যাওয়া
৯১. গ্যাজ
৯২. গনোরিয়া
৯৩. গরম লাগা
৯৪. গরুর পাড়া
৯৫. ঘামাচি
৯৬. চোখ ফোলা
৯৭. চোখে আঘাত
৯৮. চোখ উদোনো
৯৯. চোখের ছানি
১০০. চোঁয়াল ফোলা
১০১. ছিটে দেয়া
১০২. জোঁক লাগা

১০৩. জিভেয় ঘা
১০৪. জিভেয় জ্বালা
১০৫. টনসিল ফোলা
১০৬. টাক পড়া
১০৭. ঠোট কাঁটা
১০৮. ঠাণ্ডা লাগা
১০৯. ঠুলা পড়া
১১০. দাঁতে পোঁকা
১১১. ধ্বজভংগ
১১২. নজর লাগা বা হুয়ার লাগা
১১৩. নাড় উঠা
১১৪. নাভিতে পোকা লাগা
১১৫. পেট কামড়ানি
১১৬. পেট ব্যাথা
১১৭. পেট পড়া
১১৮. পেট ফেলা
১১৯. পা–ঠাণ্ডা
১২০. পাঁচড়া
১২১. পানিতে ডোবা
১২২. প'ড়ে যাওয়া
১২৩. পোকা–মাকড়ের কামড়
১২৪. প্রদর
১২৫. পাম্‌ড়ি
১২৬. গুঁয়ে খাওয়া
১২৭. ফোলা (শোথ)
১২৮. চোয়াল ফোলা
১২৯. বমি
১৩০. ব'স ফোটা
১৩১. বসন্ত
১৩২. বল্লার কামড়
১৩৩. বাণ মারা
১৩৪. বিছে লাগা
১৩৫. বিষ ফোঁড়া
১৩৬. বিষ চিকিৎসা
১৩৭. বিয়েজ ঘা
১৩৮. বুকে ব্যথা
১৩৯. বুকের কড়া বৃদ্ধি
১৪০. বুকের শ্লেষ্মা
১৪১. ভগন্দর
১৪২. ভয় পাওয়া
১৪৩. ভীমরুলের কামড়
১৪৪. মচকা
১৪৫. মাথা ধরা
১৪৬. মাথা গরম
১৪৭. মাথায় ঘা
১৪৮. মাথায় খুস্কি
১৪৯. মৌমাছির কামড়
১৫০. মুখ ফাটা
১৫১. মুখ ফাটা
১৫২. মৃষুড়ো বৃদ্ধি
১৫৩. মেহ
১৫৪. মূত্রনাশ
১৫৫. মূত্রে জ্বালা
১৫৬. মূত্রনালী ফোলা
১৫৭. মূত্রনালীতে জ্বালা
১৫৮. মূত্রনালীতে ঘা
১৫৯. মূত্রনালীর উপরিভাগে চুলকানি
১৬০. যক্ষ্মা
১৬১. রক্তস্রাব
১৬২. রক্তমূত্র
১৬৩. রক্তশূণ্যতা
১৬৪. লালা পড়া
১৬৫. শ্বাস কষ্ট
১৬৬. শিঙি মাছের কাটা
১৬৭. সাপে কাটা
১৬৮. সান্নিক
১৬৯. সুতিকা
১৭০. সর্দি
১৭১. স্বপ্নদোষ
১৭২. স্তন প্রদাহ
১৭৩. হৃদ রোগ
১৭৪. হাঁফানি
১৭৫. হাড় ভাংগা
১৭৬. হালিশ বেরোনো
১৭৭. খিচুনি (আক্ষেপ)
১৭৮. কপাল বেদনা

অন্যান্য চিকিৎসা–পদ্ধতির মতই লোক–চিকিৎসায়ও এসব রোগের চিকিৎসাগত বৈচিত্র্য আছে। এবার চিকিৎসা–দর্শনের আলোকে লোক–চিকিৎসার মূলরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে।

৭. চিকিৎসা–দর্শন

বিভিন্ন চিকিৎসা–পদ্ধতি সম্যক হৃদয়ংগম ক'রলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসা–পদ্ধতি অনুযায়ী ই, চিকিৎসা পরিচালিত হয়—রোগের মূল কারণ দূর করার উদ্দেশ্যে। এ জন্য প্রত্যেক চিকিৎসা–প্রণালী ই রোগের উৎপত্তি–ভূমিতে অভিযান চালায়। যে যে চিকিৎসা–পদ্ধতি, যে–যে কারণ দ্বারা রোগোৎপন্ন হয় ব'লে মনে ক'রে, সেই সেই চিকিৎসা–পদ্ধতি

অনুযায়ী, সেই সেই রোগমূলকেই নির্মূল ক'রতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আয়ুর্বেদী মতে, যেহেতু বায়ু, পিত্ত ও কফ-এর অসম্যক অবস্থার জন্যই রোগ হয় ব'লে সিদ্ধান্ত ; তাই, এ-মতে, রোগ-চিকিৎসার নিমিত্ত ঐ দোষত্রয়ের সাম্য সৃষ্টির জন্য ঔষধ প্রদত্ত হয়। অতএব, আয়ুর্বেদ অনুযায়ী রোগীর দোষ-বৈষম্য দূর করাই চিকিৎসার লক্ষ্য।

ইউনানী মতেও-যেহেতু 'বল্‌গম', 'খুন', সাফ্‌রা ও 'সৌদা'-র সামঞ্জস্যই স্বাস্থ্য এবং অসামঞ্জস্য অবস্থায় রোগের উদ্ভব, তাই রোগ-চিকিৎসার জন্য, এ মতে, উক্ত চারি পদার্থের সামঞ্জস্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা পরিচালিত হয়। তার জন্য এমন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, যা প্রধান দোষটির প্রাবল্য হ্রাস ক'রে এবং পূর্বোক্ত চারটি পদার্থের মধ্যে সাম্য আনায়নেও তা' সংরক্ষণে সমর্থ হয়।[৩১]

অনুরূপভাবে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসারীতি অনুসারেও প্রাচীনকাল থেকে রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত রোগের মূল কারণ দূর করার প্রতি লক্ষ্য রেখেই চিকিৎসা পরিচালিত হ'য়েছে। এজন্য এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে রোগ-সংক্রান্ত যেসব তত্ত্বাদির উদ্ভব ও বিলয় ঘ'টেছে-সেই সব তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত রোগমূল বিদুরণের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত, চিকিৎসকের তীরও বার বার লক্ষ্য পরিবর্তন ক'রছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রীক আমলে-আগুন, পানি মাটি ও বাতাসকেই রোগের মূল ব'লে স্থির করা হয়। আরবীয়রা এই চারিটি পদার্থকে দেহস্থ রসচতুষ্ঠয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে সেগুলোর সাম্যে স্বাস্থ্য এবং বৈষম্যে রোগের উদ্ভব ব'লে মনে ক'রে। ফলে, উক্ত বৈষম্য দূর করাই হয় তখনকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সারকথা। কালক্রমে এই তত্ত্বও বাতিল ক'রে বলা হয়—শারীরিক রস-বৈষম্যে রোগের উৎপত্তি হয় না ; বরং রোগ হ'ল শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ই বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের ফল। অতএব, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ঐসব অঙ্গের সুস্থতা সম্পাদন, কিংবা কর্তন-বর্জন। এরপর বলা হয়-একটি 'ভৌম' জীবনীশক্তি-ই মানবদেহের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রে। তাই ঐ শক্তির বিপর্যয়েই সৃষ্টি হয় রোগ। এজন্য আদর্শ চিকিৎসানীতি হিসেবে ঐ সময়, ঐ শক্তির সুস্থতা সম্পাদনের মধ্যেই চিকিৎসার সার্থকতা নির্ধারণ করা হয়।

রেনেসাঁর সময় এই ধারণা পুনরায় সংশোধিত হয় এবং বলা হয়-মানব শরীর মূলতঃঃ রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে 'পারদ', 'গন্ধক' এবং লবণ-এর ভূমিকাই প্রধান। এই তিনটি দ্রব্যের রাসায়নিক সাম্যেই মানুষ স্বাস্থ্যবান থাকে। আর তাদের বৈষম্যেই ঘটে রোগ। অতএব, রোগ দূরীকরণের জন্য খনিজ ঔষধের সাহায্যে পারদ-গন্ধক-লবণ এর পরিমাণ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-সাম্য প্রতিষ্ঠাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য ব'লে বিবেচিত হয়। তারপর এ মতবাদ সংশোধন ক'রে বলা হয়-মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ ক'রে, তা থেকে 'ক্ষারীয়' এবং 'অম্লধর্মী' উপাদান ও নানাবিধ গ্রন্থি থেকে ক্ষরণমূলক রসের উদ্ভব হয়। শরীরে যদি ক্ষার ও অম্লধর্মী উপাদানের সঠিক পরিমাণ ও ক্রিয়া-সাম্য বজায় থাকে-তা'হলে শরীর সুস্থ থাকে ; কিন্তু তার ব্যতিক্রম ও বিপর্যয় হ'লেই দেখা দেয় রোগ। অতএব, রোগ চিকিৎসার জন্য ক্ষারের প্রয়োগ যেহেতু অম্লকে এবং অম্লের প্রয়োগ ক্ষারকে সমতা লাভে সহায়তা ক'রে-

সেজন্য ঐ দুই উপাদানে গঠিত ঔষধের ই সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। অতএব, রুগ্ন মানব শরীরের বিপর্যস্ত ক্ষার ও অম্ল সম্পর্কে স্বাভাবিকতা সম্পাদন ই চিকিৎসার লক্ষ।

পরবর্তীকালে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এই 'রাসায়নিক তত্ত্ব' বাতিল ক'রে প্রচারিত হয় 'যান্ত্রিক তত্ত্ব। এ মতে বলা হয়-মানবদেহ একটি যন্ত্র বিশেষ। যান্ত্রিক নিয়মেই শরীরের এক এক প্রকার ক্রিয়াবৈলক্ষণ্যে এক এক রকম রোগের উদ্ভব হয়। যেমন যান্ত্রিক নিয়মে শিরার রস-প্রবাহের গতি বাধাপ্রাপ্ত হলে জ্বর, খিচুনি, বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। প্রদাহের সৃষ্টি হয়-রক্ত-বহা নাড়ীর দেওয়াল-গাত্রে, রক্তস্রোত প্রতিহত হ'য়েই। মানব দেহ যে 'যন্ত্রাদি' দিয়ে তৈরী, তা চালিত হয় শারীরিক 'তন্তু'রাজির ক্রিয়াসাম্যে। ঐ ক্রিয়ার বৈষম্যেই সৃষ্টি হয় নানা রকম রোগ। কাজেই রোগ-চিকিৎসার লক্ষ্য হ'ল-ঐ তন্তুগত ক্রিয়াসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে আরও তত্ত্বের উপস্থিতি ঘ'টতে থাকে। এবার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ব'লেন—"Illness was a struggle between the body of the sick person and the noxious influences that produced the illness, and the symptoms were the expression of this struggle. The body reached against these noxious influences, tried to overcome their eveil effects through its own healing power, and endeavoured to make good the disturbance."[৩২]

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এর পর উদ্ভব হয় 'অঙ্গতত্ত্ব' বা 'অর্গ্যানিক ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট'-এর তত্ত্ব। আলোচ্য তত্ত্ব অনুযায়ী রোগ মানবদেহের বিশেষ বিশেষ অংশেই উৎপন্ন হয় এবং তারপর সেখান থেকে তা' ছড়িয়ে প'ড়ে অন্যত্র। অতএব রোগারোগ্যের জন্য ঐ বিশেষ অংশের বা অঙ্গের সুস্থতা সম্পাদন এবং প্রয়োজনবোধে তার কর্তন-বর্জন ই চিকিৎসা। পরবর্তীকালে, এমত সংশোধন ক'রে আরও গভীরে নেমে বলা হ'ল-অঙ্গ নয়, বরং যে সব তন্তু বা টিস্যু দিয়ে ঐ অঙ্গ গঠিত সেই সব তন্তুর গঠনগত কুপরিবর্তনের ফলেই রোগ হয়। কাজেই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হ'ল তন্তুগত বিকৃতির নিরোধ সংশোধন ও সুস্থতা সম্পাদন।

তারপর শক্তিশালী জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে দেখা গেল, মানব শরীরের তন্তু-রাজি অসংখ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ 'কোষাণু'র সমষ্টিমাত্র। শীঘ্রই জীবনের মৌল একক হিসেবে এই কোষাণুকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বলা হয়-বাইরের প্রভাবে, নানা কারণে এই সব কোষাণুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘ'টতে পারে এবং যদি তা ঘটে, তবেই মানবদেহ রোগাক্রান্ত হয়। 'বাইরের প্রভাব' ব'লতে কোন 'দৈবশক্তিকে' বোঝানো হয় নি ; বলা হ'য়েছে এমন এক অদৃশ্য 'জীবনসত্ত্বা'র কথা, যা পরিবেশের মধ্য থেকে মানব-শরীরে প্রবেশ ক'রতে সমর্থ এবং যা শরীরে প্রবেশ ক'রলে কোষাণুতে প্রতিক্রিয়া ও অশুভ পরিবর্তন ঘ'টাতে পারে। আর তার ফলেই মানুষ হয় রোগাক্রান্ত। অতএব, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ঐ সব জীবাণুসমূহের ধ্বংস সাধন।

পরবর্তীকালে এই সূত্রেই বিভিন্ন রোগের কারণ স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুরাজির আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজীতে এগুলো 'ব্যাকটেরিয়া', জার্ম, 'ব্যাসিলাস', 'ভাইরাস'

ইত্যাদি নামে অভিহিত। নানা রোগের কারণ স্বরূপ অদ্যাবধি কয়েক শ' রকমের ভাইরাসকে চিহ্নিত করা হ'য়েছে। ফলে এখনকার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মূল লক্ষ্য ঐসব জীবসত্ত্বা, জীবাণু, ব্যাসিলাস, ভাইরাস ইত্যাদির বিনাশ-সাধন এবং শারীরিক নানাবিধ কুপরিবর্তনের প্রতিরোধ।

কিন্তু এত বিচিত্র রকমের তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারাও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সমস্ত রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় ক'রতে পারেনি কিংবা সমস্ত রকম রুগ্নতার একটি মাত্র উৎসও খুঁজে পায়নি। ফলে কর্কট রোগ বা 'ক্যান্সার', উন্মাদ বা মনোব্যাধি, 'হার্ট ডিজিজ', পূর্বপুরুষাগত রোগ ইত্যাদির কারণ নির্ধারণের জন্য কোষকেন্দ্রীন প্রাণীবিদ্যার চর্চা এবং বংশগতি উল্লম্ফন ('ক্রোমসম' 'জিন', 'জিনাংশ' প্রভৃতি) সম্পর্কীয় গবেষণা চ'লছে।

উল্লেখযোগ্য যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতেও রোগের কারণ বা মূল অপনোদনের প্রতিই চিকিৎসার সার্থকতা নির্দেশ করা হ'য়েছে। আলোচ্য চিকিৎসা-রীতি অনুযায়ী-যেহেতু মানব দেহের জীবনী-শক্তি তিনটি মূল 'রোগবিষ' দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হয় এবং মানবদেহ বিভিন্ন ধরণের দীর্ঘস্থায়ী[৩৩]রোগ-কবলিত হয় ; সেজন্য উক্ত রোগবিষের সংশোধন বা সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস 'রোগবিষ' বিনষ্টি ই চিকিৎসার লক্ষ্য। আবার ঐ তিনটি রোগ-বিষ মানব-শরীরে নানাভাবে মিশ্রিত হ'য়ে নানা রকম রোগের লক্ষণ প্রকাশ ক'রতে পারে বিধায় হোমিওপ্যাথিক মতে দীর্ঘস্থায়ী রোগ-চিকিৎসা মূলতঃ ঐবিষত্রয়ের বিভিন্ন রকম মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন অবস্থা সংশোধনের চিকিৎসা। এ ক্ষেত্রে 'অ্যালোপ্যাথিক' রীতি অনুযায়ী ঔষধ প্রদানের বিপরীতে এমন রীতির ঔষধ প্রয়োগ করার কথা বলা হ'য়েছে—যাকে বলা হয়-'সদৃশের দ্বারা সদৃশের চিকিৎসা'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'গরম লাগলে' মাথায় ঠাণ্ডা ভারা দিয়ে চিকিৎসাকে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বা বিপরীতের দ্বারা চিকিৎসা বলা যায়। আর 'গরম লাগলে' যদি মাথায় গরম পানি ঢেলে চিকিৎসা করা হয়-তবে তাকেই কতকটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বা সদৃশের দ্বারা চিকিৎসা বলা চলে। এজন্য এ মতে, যে ঔষধ স্থূলমাত্রায় সুস্থ শরীরে প্রয়োগ ক'রলে যেসব কষ্টকর লক্ষণ বা দৈহিক বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রে ; সেইসব লক্ষণ বা সেই রকম বিপর্যয় সম্পন্ন অসুস্থ মানুষকে ঐ ঔষধের ই সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য সাধন সম্ভব। যেমন-কোন ফলের রস খেলে যদি কালো বমি হয়, তা'হলে সেই ধরণের বমিতে ঐ ফলের রসই অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রযোজ্য এবং সেটি ই তার ঔষধ ; তাতেই ঐ রকম বমি আরোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে, বায়োকেমিক মতে-মানবদেহে কোষাণুর পরিপোষণে যে বারোটি খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা র'য়েছে সেই সব অত্যাবশ্যকীয় লবণের এক একটির ঘাটতির ফলেই মানব-শরীরে এক এক প্রকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব, সেই সব রোগ-লক্ষণ দূর করার জন্য ঐ সব লবণের নির্দিষ্টটির ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত, ঐ 'লবণ' অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করাই চিকিৎসার লক্ষ্য।

একই ভাবে লোক-চিকিৎসাতেও রোগ-নিরাময়ের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বর্তমান। তা'হল, যে কারণ থেকে যে রোগের উৎপত্তি, সেই কারণকে দূর করার প্রতি ই চিকিৎসার লক্ষ্য

নির্ধারণ। যেহেতু এক একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী, রোগের এক এক প্রকার কারণ নির্দেশ করা হ'য়েছে ; সেইহেতু লোক-চিকিৎসায়ও যে ঐ রকম স্বতন্ত্র কারণের ই কথা থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ এক চিকিৎসা-পদ্ধতির স্বীকৃত রোগ-কারণ যেহেতু অন্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমর্থক ও প্রচারকগণ হেসে উড়িয়ে দেন, সেইহেতু লোক-চিকিৎসায় স্বীকৃত রোগ-কারণও যে, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক, আয়ুর্বেদী, ইউনানী চিকিৎসার সমর্থক ও প্রচারকগণ হেসে উড়িয়ে দেবেন-তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয়তঃ অ্যালোপ্যাথিক-হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সমূহের যে আধুনিক যন্ত্র বিজ্ঞান-নৈকট্য বিদ্যমান, লোক-চিকিৎসায় যেহেতু তা আদপেই নেই, সেইজন্য আলোচ্য মতে রোগের মূল নির্দেশ যেমন স্থূল ; তেমনি তা দূর করার পদ্ধতিও স্থূল। চতর্থতঃ গ্রাম্য মানুষ যেহেতু প্রাচীন পন্থী, ধর্মপরায়ণ এবং কেবল যুক্তি ও কার্যকারণ ব্যাখ্যার সত্যেই আস্থাশীল নয়, সেজন্য তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যেও তার প্রতিফলন বিদ্যমান। তাই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে লোক-চিকিৎসকের নিজস্ব বক্তব্য বা ধারণার অনুরূপ, রোগ নিরূপণেরও আছে নিজস্ব কলা-কৌশল। তাঁর সঙ্গে লোক-চিকিৎসার নিজস্ব দর্শনেরও আছে পরিপূর্ণ সঙ্গতি। ডক্টর ও. পি. জ্যাগ্‌গি এ-দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে যথার্থই ব'লেছেন :— "Treatment is based upon removal of the causative factor through the propitiation of gods, exorcisms countermagic, use of charms and amulets, and of course, administration of some herbal preparations-a perfecty rational approach in so far as it is intended to remove the basic cause".[৩৪] অতএব অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির মতই লোক-চিকিৎসাও যে, রোগের কারণ অনুযায়ী 'তদ্বির' (ঔষধ, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদি) প্রদান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই চিকিৎসার লক্ষ্য নির্ধারণও অযৌক্তিক কিংবা 'অবৈজ্ঞানিক' নয়।

বস্তুতঃ 'লোক-বিজ্ঞান'ই লোক-চিকিৎসার ভিত্তি এবং এ জন্য লোক-চিকিৎসা শুধুই বিশ্বাস, কুসংস্কার, তুকতাক্, ফুঁ-ফা, নাট্‌কী-ফাট্‌কী নয়। একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে এর প্রশ্নাতীত কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

পরবর্তী আলোচনায় সে-সত্য আরও প্রকট হবে।

খ. ঔষধ-বিজ্ঞান

অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদী প্রভৃতি চিকিৎসা-পদ্ধতির স্বতন্ত্র ঔষধ-বিজ্ঞানের আলোকে লোক-চিকিৎসার ঔষধ-বিজ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই ঔষধের উৎসগত শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির ঔষধের সঙ্গে লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের উৎপত্তিগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কিরূপ তা' লক্ষণীয়।

১. ঔষধের উৎস :

আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের চারটি উৎসের উল্লেখ ক'রেছেন বেটি এস. বার্গারসেন। যথা—

১. বনজ ঔষধ। যেমন–ডিজিটেলিস, আফিম, বেলেডোনা প্রভৃতি।

২. প্রাণীজ ঔষধ। যেমন–ইনসুলিন, এপিনোফ্রিন, সেক্স হর্মোন ইত্যাদি।

৩. খনিজ ঔষধ। যেমন–আয়রণ, আয়োডিন ইত্যাদি এবং

৪. গবেষণাগারে প্রস্তুত রাসায়নিক ঔষধ ও নানা রকম 'কম্পাউণ্ডস্'।[৩৫]

অতএব, অ্যালোপ্যাথি ঔষধের সনাতন উৎস তিনটি যথা–

১. বনরাজ্য (Plant Kingdom)

২. প্রাণীরাজ্য (Animal Kingdom)

৩. মণিকরাজ্য (Mineral Kingdom)

আধুনিক কালেই মাত্র এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে–রসায়নাগারে প্রস্তুত 'সিন্থেটিক' ও 'আধাসিনথেটিক' ঔষধসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ঔষধসমূহকে 'ইন-অর্গ্যানিক', 'অর্গ্যানিক' এবং 'সিন্থেটিক' এই তিন ভাগেও ভাগ করা চলে।

আয়ুর্বেদী ঔষধের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেও প্রায় একই রকম উৎসের সন্ধান লাভ করা যায়। আয়ুর্বেদী ঔষধ জগতে আধুনিক 'সিন্থেটিক' ঔষধের কোন স্থান না থাকায় প্রাচীন বৈদ্যকগণ বন, প্রাণী ও মৃত্তিকা–রাজ্য থেকেই তাঁদের ঔষধ সংগ্রহ ক'রেছেন। এগুলোর মধ্যে "Vagetable products formed the major source of their pharmacopoeia. Animal products used as drugs included flesh, fat, bones, marrow, tendons, horns, hoofs, hair, nails, skin, bile, blood, excreta, urine, semen of the earthly products silajut was the most commonly used others were fold, silver, copper, lead, tin, iron, arsenics, antimony, different types earth and sand"[৩৬] সুশ্রুত এই তিনটি উৎসের সঙ্গে 'নৈসর্গিক অবস্থা'-জাত "প্রবাত, নিবাত আতপ, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়নাদি'কেও 'চিকিৎসাকার্য্যে প্রয়োজনীয়[৩৭] ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন। অতএব, ব্যাপক অর্থে আয়ুর্বেদী ঔষধেরও উৎস চারটি। যথা–বন, প্রাণী, মৃত্তিকা ও নিসর্গ।

অন্যপক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেও প্রায় এক ই রকম তথ্যর সন্ধান লাভ করা যায়। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার ঔষধরাজি সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে ই. এ. ফ্যারিংটন ব'লেছেন—"I have arranged the remedies in three grand divisions, according to the kingdom of nature from which they are derived, viz. :

1. Remedies derived from the animal kingdom ;
2. Remdies derived from the vegetable kingdom ;
3. Remedies derived from the mineral kingdom ;

ফ্যারিংটন অবশ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এই তিনটি প্রধান উৎস ছাড়া চতুর্থ আর একটি উৎসেরও উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁর ভাষায়—"There is also a fourth class of

remedies, the nosodes or disease products"[৩৮] অতএব, হোমিওপ্যাথি ঔষধের উৎসও চার রকম।

অনুরূপভাবে লোকৌষধের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেও তার তিনটি প্রধান উৎসই লক্ষণীয়। যথা–

১. বনজ ঔষধ

২. প্রাণীজ ঔষধ ও

৩. খণিজ বা মৃত্তিকাজাত ঔষধ।

এর সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উৎস থেকে আহরিত ঔষধের মতই লোক-চিকিৎসারও নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উৎসজ ঔষধ র'য়েছে। এই উৎসটিকেই অতিলৌকিক (Supernatural or Spirito-religious–যাকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব'লেছেন magico-religious treatment) উৎস নামে অভিহিত করা যায়। এ উৎস থেকে আহরিত মন্ত্র-ইস্‌ম-দোয়া-কালাম-নক্সা-আভিচারিক ক্রিয়া ইত্যাদি লোক-চিকিৎসার চতুর্থ বর্গীয় (উৎসজ) ঔষধ ব'লে গণ্য করা কর্তব্য।

২. ঔষধের শ্রেণী-বিভাগ

ডীলিং-এর 'ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি'-তে অ্যালোপ্যাথি ঔষধের তিন রকম শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ বিদ্যমান। যথা–

১. ক্রিয়াস্থানিক ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার্য ঔষধ। যেমন–

ক. পৌষ্টিকতন্ত্রের ওপর ক্রিয়াকারী-ম্যাগনেশিয়াম, সালফেট, অ্যাট্রোফিন ইত্যাদি।

খ. হৃদযন্ত্রের উপর ক্রিয়াকারী ঔষধ। যথা-ডিজিটেলিস, কুইনিডিন ইত্যাদি।

গ. কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ক্রিয়াকারী ঔষধ। যথা-অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রভৃতি।

ঘ. কিড্‌নির ওপর ক্রিয়াশীল ঔষধ। যথা-অ্যাসিটাজোলামাইড প্রভৃতি।

২. প্রয়োগিক ফলাফল-এর ভিত্তিতে নির্বাচিত ঔষধ। যেমন–

ক. বিরেচক-'ম্যাগনেশিয়াম সালফেট'।

খ. আক্ষেপ নিবারক-'অ্যাট্রোফিন'।

গ. বেদনা ও জরঘ্ন-'অ্যাসিটাইলস্যালিসাইলিক'।

ঘ. মূত্রকারক-'অ্যাসিটোজোলামাইড'। ইত্যাদি।

৩. কোষক্রিয়ার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ঔষধ। যেমন–

ক. 'অ্যাট্রোপিন' হ'ল একটি 'অ্যান্টিকোলিনার্জিক' উপাদান-এ তৈরী ঔষধ।

খ. 'অ্যাসিটেজোলামাইড' হ'ল একটি 'কার্বনিক অ্যানহাইড্রাস ইনহিরিট'র এবং

গ. 'ম্যাগনেশিয়াম সালফেট' হ'ল একটি 'অসমোটিক পারগেটিভ' ঔষধ। এছাড়া

৪. গবেষণাগারে প্রস্তুত রাসায়নিক মিশ্রণ বা 'কম্পাউণ্ডস'।[৩৯]

এস. এন. পাণ্ডে চারিত্র্যভেদে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধকে বাইশটি ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা-১. 'মিকচার' বা মিশ্রণ, ২. 'পাউডার' বা চূর্ণ, ৩. 'ক্যাপসুল' ৪. 'পিল' বা বড়ি, ৫. 'লোশন' ৬. 'লিনিমেন্ট' বা মালিশ, ৭. 'অয়েন্টমেন্ট' বা মলম ৮. 'ট্যাবলেট' ৯. 'সাপোজিটার' বা জোলাপ ১০. 'এনিমা' ও 'ডুস' ১১. 'টনিক' ১২. 'ইনজেক্শন' ১৩. নাকের 'ডুস' ও নাকের 'ফীডিং' ১৪. নাসিকা ও গলার 'স্প্রে' ১৫. কানের ঔষধ, ১৬. অন্ত্রধারন্ন বা 'কোলন ওয়াশ' ১৭. 'স্টমাক ওয়াশ' ১৮. জরায়ুতে 'ডুশ' ১৯. মূত্রনালীধাবন, ২০. পুষ্টিকর 'এনিমা' ২১. আন্ত্রিক 'স্যালাইন' ২২. 'নর্মাল স্যালাইন' ইত্যাদি।[৪০]

এ ধরনের ঔষধ-বিভাগ আয়ুর্বেদী ও ইউনানী চিকিৎসায়ও বিদ্যমান। চরক-সংহিতা অনুযায়ী আয়ুর্বেদী ঔষধ পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত। সুশ্রুত ঔষধকে ভাগ ক'রেছেন সাঁইত্রিশ ভাগে। আর শাঙ্গধর ক্রিয়াগত দৃষ্টিকোণ থেকে আয়ুর্বেদী ঔষধকে পনেরো ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন।[৪১] আয়ুর্বেদী ঔষধের চারিত্রিক বিভাগ অনুযায়ী তা ভস্ম, রস, গুড়ি, বড়ি, অঞ্জন, নস্য, প্রলেপ, মালিশ প্রভৃতি ভাগেও বিভক্ত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ঔষধের শ্রেণী-বিভাগ স্বতন্ত্র। উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুত-প্রণালীর পার্থক্যভেদে ঔষধ তিন রকম। যথা—

১. দশমিক প্রণালী অনুযায়ী প্রস্তুত ঔষধ

২. শততমিক প্রণালী অনুযায়ী প্রস্তুত ঔষধ।

৩. পঞ্চাশ সহস্রতমিক প্রণালী প্রস্তুত ঔষধ।

এই তিনটি প্রণালীতে প্রস্তুত সমস্ত ঔষধের-ই শক্তিভেদ ও তার ফলে ঔষধভেদ বিদ্যমান। যেমন—দশমিক প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ ১দ, ২দ, ৩দ, ৪দ, ৫দ ইত্যাদি, শততমিক প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ ১,২,৩,৪,৫...ইত্যাদি এবং পঞ্চাশ সহস্রতমিক প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ এম/১, এম/২, এম/৩, এম/৪, এম/৫ কিংবা ০/১, ০/২, ০/৩, ০/৪, ০/৫...[৪২] প্রভৃতি 'ক্রম' অনুযায়ী বিভক্ত, বিভিন্ন শক্তির ঔষধ।

এক-ই রকম স্বাতন্ত্র্য লোকৌষধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। লোক-চিকিৎসায়ও যে সব ঔষধপত্র ব্যবহৃত হয়—সেগুলো নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথা—মন্ত্র, দোয়া-তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, মানত, 'সদকা', নাকশী, মাদুলী, তাগা, বাণ, যাদুটোনা, বারা, বড়ি, পটি, প্রলেপ, জোলাপ, জাব, রস, ক্বাথ, ঘ্রাণ, গুড়া, রণ, বন্দ, দহন, ছেদন ইত্যাদি। এগুলোকে ধারণীয়, গ্রহণীয়, লেপনীয়, পানীয়, লেহনীয়, ঘ্রাণন, সেবনীয়, ভেদনীয়, সন্ধানীয়, দহনীয়, আহারীয়, শস্ত্রীয় ইত্যাদি ভাগেও বিভক্ত করা যায়। এমনকি, ডীলিংএর পূর্বোক্ত বিভাগ অনুযায়ীও এসব ঔষধের শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব। এসব ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ এ-রচনায় ভেষজ-বিজ্ঞান বা 'মেটেরিয়া মেডিকা' অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

বলাবাহুল্য, ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালীতে স্বাতন্ত্র্য সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যেই বর্তমান! সে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রত্যেক চিকিৎসা-রীতির-ই নিজ নিজ বিধিমালা বা 'ফার্মাকোপিয়া'য়

নিহিত। লোক-চিকিৎসায়ও ঔষধ-প্রস্তুতের অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব বিধিবিধান বর্তমান। কিন্তু সেগুলোর কোন লিখিত বিবরণ না থাকায়-এই চিকিৎসার কোন দৃশ্যমান 'ফার্মাকোপিয়া' নেই।

অ্যালোপ্যাথিক 'ফার্মাকোপিয়া' বা 'কোডেক্স'-এর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলে দেখা যায়, সমস্ত আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ-ই জীব-শরীরে সাংঘাতিক রকম ক্রিয়াশীল সক্রিয় উপাদান দ্বারা প্রস্তুত। এইসব উপাদানের সঙ্গে নানাবিধ দ্রব্য মিশিয়ে ঔষধ তৈরী করা হয়। এমতে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত ঔষধের মূল 'ক্রুড'-অংশে, বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপাদান নিহিত থাকে ব'লেই তা' 'জীব'-শরীরে নানাভাবে কার্যকর হয়। এসব 'ক্রুড' ঔষধমূল থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সক্রিয় উপাদান বা 'এ্যাকটিভ এজেন্ট' পৃথক ক'রে নেওয়া হয় এবং তা মানবেতার প্রাণীদের ওপর প্রয়োগ ক'রে, ফলাফল লক্ষ্য করা হয়। অতঃপর ঐ উপাদানের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে কিংবা উপাদানটিকে গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে উৎপাদন ক'রে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট রোগের একটি নির্দিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সুপরিচিত কুইনিন-এর উল্লেখ করা যায়। সিঙ্কোনা গাছের ছালের রসেই প্রথম 'কুইনিন'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, সিঙ্কোনা প্রজাতির যে গাছ আছে-সেগুলোর মধ্যে 'সিংকোনা সাক্সিরব্রা'-তেই প্রচুর পরিমাণ 'সিংকোনিন' ও 'কুইনিন' থাকে। সিংকোনার রসের রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে বিশটিরও অধিক উপকার পাওয়া গেছে। সেগুলো হ'ল-কুইনিন, এপি-কুইনিডিন, কুইনিসিন, কুইনামিন, কন-কুইনামিন; এপিকুইনিন, এপি-কুইনিডিন, হাইড্রোকুইনিন, হাইড্রোকুইনিডিন, সংকোনিন, সিংকোনিসিন, সংকোনিডিন, সংকোটিন, সিংকোমিডিন সিংকোনামিন, কোপ্রাইন, কেইরামিন, কনকেইরামিন, কেইরামিডিন, কন-কেইরামিডিন, কুসকোনিন, কন-কুসকোনিন, এরিসিন, ডাইসিনকোনিন, ডাইকনকুইনিন এবং পরিসিন। এসবের মধ্যে মাত্র চারিটি উপাদান-কুইনিন, কুইনিডিন, সিংকোনিন এবং সিংকোনিডিন ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় ; অন্যগুলো নয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় শতাব্দীর গবেষণার ফলে, কুইনিন-এর জটিল গঠন-এর স্বরূপ উন্মোচিত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই মাত্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী উডওয়ার্ড ও ডোয়েরিং কুইনিন 'সিনথেসাইজ' বা সংশ্লেষণ ক'রতে সমর্থ হন। ফলে আজ আর কুইনিন উপাদানটির জন্য সিংকোনা গাছ খুঁজে বেড়াতে হয় না-গবেষণাগারে বা কারখানাতেই তা' তৈরি হয়। এবং কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত উপাদানের সাহায্যেই ঔষধ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, যে গোপন ও জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালোপ্যাথি 'ক্যাপসুল', 'ট্যাবলেট', 'সিরাপ' ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়-তার যথাযথ বিবরণ সুলভ নয়। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ ফার্মাকো পিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মাকোপিয়া কিংবা ব্রিটিশ কোডেক্স, ফ্রান্স কোডেক্স ইত্যাদি দিগ্‌দর্শক মাত্র।

সিংকোনা থেকে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে যেরূপ ঔষধ প্রস্তুত হয়-তা' সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমেরিকান এবং জার্মান হোমিওপ্যাথিক 'ফার্মাকোপিয়া' অনুযায়ী যায় না বা সিংকোনার মাতৃশক্তি প্রস্তুত করার জন্য ঐ গাছের ছালের গুড়া ১০০ গ্রাম, পরিশ্রুত পানি ২০০ সি সি, ষ্ট্রং অ্যালকোহল ৮২৪ সিসি প্রয়োজন। এর মধ্যে ঔষধ শক্তি $\frac{১}{১০}$ ভাগ বিদ্যমান থাকে।[৪৩]

আয়ুর্বেদী ঔষধ প্রস্তুত–পদ্ধতি এ থেকে ভিন্ন। ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী 'বিষম জীর্ণজ্বর চিকিৎসায়' প্রযোজ্য 'পঞ্চানন রস'–এর প্রস্তুতবিধি উল্লেখ করা যায়। গোপাল ভট্টের 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহে' এর প্রস্তুত–রীতি সম্পর্কে বলা হ'য়েছে–"(৬ তোলা) বিশুদ্ধ তাম্র দ্বারা একটি পাত্র প্রস্তুত করিবে। পরে খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খৈ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকটি এক তোলা পরিমাণ লইয়া করোলা পাতার রসে ২ প্রহর মর্দন ও গোলাকার করিবে, পশ্চাৎ উহা একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তদুপরি পূর্বোক্ত তাম্র পাত্র অধোমুখে চাপা দিবে এবং তাহার উপরিভাগে অপর একটি হাঁড়ি চাপা দিয়ে মৃৎকর্পট দ্বারা সন্ধি স্থল লিপ্ত করিবে। সেই হাঁড়ি চুল্লির উপর রাখিয়া একদিন (টীকাকারের মতে দ্বাদশ প্রহর) জ্বাল দিবে। শীতল হইলে তাম্রভস্ম উদ্ধার করিয়া তুলসীপত্র রসে এক প্রহরকাল মর্দন করিবে।"[৪৪] এই ঔষধ বিভিন্ন রকম অনুপানসহ সেবনে বিভিন্ন রকম জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয়।

একইভাবে লোক–চিকিৎসায়ও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত ক'রতে হয়। কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসা–পদ্ধতিতে ঔষধ–প্রস্তুতের যে জটিল ও কঠিন প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, লোক–চিকিৎসায় তা' হয় না। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বিপুল যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানা আবশ্যক হয়। হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ঔষধ প্রস্তুতের ও ছোট–খাট কারখানা বসানো চলে। আয়ুর্বেদী–ইউনানী ঔষধ প্রস্তুতের জন্য তেমন কোন জটিল যন্ত্রপাতি ও কারখানার আবশ্যক হয় না। তথাপি উক্ত প্রস্তুত প্রণালী যে বহু ক্ষেত্রে অতি জটিল তা' পূর্বোক্ত উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট। আয়ুর্বেদী ঔষধ প্রস্তুতের জন্য হাঁড়ি ও কলসী দ্বারা নির্মিত মাত্র ছ'টি বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক হয়।[৪৫]

পক্ষান্তরে, লোকৌষধ প্রস্তুত করার জন্য কোন উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। বহু লোক–ঔষধ শুধুমাত্র তেল, পানি, চিনি, গুড়, ফল, কড়ি ইত্যাদি 'প'ড়ে' ঔষধ গুণ–সম্পন্ন করা হয়। এমন কি, কোন কোন ধাতু ধুয়ে নিলেই সে পানি আরোগ্যকর হয়। আবার মানত, দোয়া, তাবিজ, কবচ প্রভৃতি ; প্রাণী–বিশেষ, দ্রব্য–বিশেষ, কালি–কাগজ, সুতা, আয়াত, মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা আরোগ্যকর বা ঔষধগুণ সম্পন্ন করা হয়। বাণ, স্নান, সিন্নি, রণ ইত্যাদিতেও কোন প্রকার ঔষধ প্রস্তুতমূলক যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। কিন্তু রস, ক্বাথ, কস, পাঁচন, বড়ি, গুঁড়া, অভিচার, অস্ত্রোপচার প্রভৃতিতে কিছু কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। এজন্য লোক–ঔষধসমূহকে 'বিনা যন্ত্রপাতিতে প্রস্তুত ঔষধ' ও 'সাধারণ যন্ত্রপাতির দ্বারা তৈরি ঔষধ এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে এই দুইরকম ঔষধের প্রস্তুত–বিধি উল্লেখ করা হ'ল।

ক) বিনা যন্ত্রপাতির দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ

যেসব লোক–ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য কোন রকম যন্ত্রপাতি আবশ্যক হয় না–সেগুলোর পরিচয় নিম্নরূপ। যথা—

১. **তেল পড়া :** পানি পড়া, ঘি–পড়া, চিনি (আঁখের চিনি) পড়া, গুড় পড়া, ফুল পড়া, ফল পড়া, পান পড়া, কড়ি পড়া, ধুলো পড়া, সর্ষে পড়া, লবণ পড়া, কালো জিরা পড়া

প্রভৃতি। এগুলো ঔষধ-গুণ-সম্পন্ন করার জন্য শুধু নির্দিষ্ট দ্রব্যটিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বা কোরাণের আয়াত-তিন, পাঁচ, সাত অথবা একুশ বার পড়ে ফুঁ দেওয়া হয়। তাতেই এগুলো চিকিৎসা-গুণ-সম্পন্ন হয়।

২. **বিশেষ বিশেষ দ্রব্য :** ধোয়া পানি, 'ছুঁৎ লাগা'-আরোগ্যের উদ্দেশ্যে 'সোনা-রূপা ধোয়া পানি', দোয়া-তাবিজ নষ্ট হ'য়ে গেলে-তা' ধোয়ার জন্য কাঁচা দুধ, শিশুদের মাথার 'একজিমা' আরোগ্যের জন্য-ঐ শিশুটির 'মামার গামছা ভিজা পানি' কিংবা 'ক্ষৌরকারের ক্ষুর ধোয়া পানি' প্রভৃতি বিনা মন্ত্র ও কালামেই ঔষধ-গুণ-সম্পন্ন। তরকারী রান্না করা লোহার কড়াইয়ে জ্বালানো পানি দ্বারাও সাধারণ রোগ-বিশেষ আরোগ্য হয়।

৩. **মানত :** 'মানত'কে 'মানসিক করা'ও ব'লে। মনন থেকেই 'মানতে'র উদ্ভব। কোন দুরারোগ্য রোগ নিরাময় কিংবা আশানুরূপ ফল লাভের উদ্দেশ্যে 'মানত' করা হয়। এ জন্যে মনে মনে কোন পীর-ফকীর-আউলিয়া-দরবেশ-এর মাজারের প্রতি ধ্যান ক'রে, তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা নিবেদন ক'রে ব'লতে হয়-'আমার বা আমার পরিবারের অমুকের এই রোগ আরোগ্য হ'লে আমি আপনার দরগায় অমুক জিনিস দান করব।' একেই ব'লে মানত।

মানত অবশ্য দু'রকম-'সিন্নিদান' এবং 'সদকা দান'। মসজিদ, দরগা, মন্দির, তীর্থস্থান কিংবা কোন দেবস্থানে পাঁচ পাই, পাঁচ আনা (আগে ছিল সোয়া পাঁচ আনা), পাঁচ সিকা কিংবা সোয়া ষোল আনার 'সিন্নি' (বাতাসা), কিংবা গোস্তভাত, ক্ষীর অথবা মোরগ-মুরগী, খাসি ইত্যাদি দান বা কোরবানী করাকে বলা হয় 'সদকা দান'। ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের জন্যই এসব দেওয়া হয়। এছাড়া আর এক রকমের 'মানত' আছে যাকে 'সদকা' বা 'জানের বদলে জান' দেওয়া ব'লে।

৪. **দোয়া :** 'Spirito-religious' চিকিৎসা-উপকরণ হিসেবে ইসলামী-পীরালী চিকিৎসা-রীতি থেকে আগত 'দোয়া' দ্বারাও অনেক রোগ চিকিৎসা করা হয়। 'দোয়া' ব'লতে আরবী অক্ষর ও সংখ্যার দ্বারা নানা রকম নক্সাকারে লিখিত বোধ্য-অবোধ্য ও দুর্বোধ্য আরবী অক্ষর, সংখ্যা, কোরানের আয়াত কিংবা সুরার সংকেত-লিপি বোঝায়। কখনো পাতলা কাগজে, কখনো চীনামাটির পাত্রে, কখনো নূতন মেটে সরায় কিংবা নতুন শাদা কাপড়ের উপরে কালো কালি, লাল কালি বা জাফরাণ কালি দিয়ে দোয়ার ছক আঁকা ও সাংকেতিক বর্ণ, সংখ্যা, শব্দ ইত্যাদি লেখা হয়। ঐসব দোয়া কখনো মাদুলিতে ধারণ করা হয়। উবঁধা হয় গলায় অথবা পুরুষের ডান হাতে, মেয়েদের বাম হাতে কিংবা কোমরে। আবার কখনো চীনাবাসনে লিখিত দোয়া একুশ বা একচল্লিশ দিন ধুইয়ে পানি খেতে হয়। আর কখনও বা ঐ দোয়া লিখে 'গৃহ বন্দ', 'ভিটা বন্দ', বা 'গ্রাম বন্দ' দেবার জন্য ঘরের দরজায়, বাড়ীর চার কোণায় কিংবা গ্রামের চতুঃসীমায় বিশেষ রীতিতে পুঁতে দেওয়া হয় কিংবা খুঁটার মাথায় অথবা চৌকাঠে লটকিয়ে দেয়া হয়।

৫. **তাবিজ :** 'দোয়া' ও 'তাবিজ' প্রায় একই। তবে 'দোয়া' মাদুলীতে ভ'রে এবং না ভ'রে-দু রকমেই ব্যবহার করা চ'লে। কিন্তু তাবিজ একমাত্র মাদুলিতেই ব্যবহার্য। এই মাদুলী সোনা, রূপা, তামা কিংবা লোহার-এক ধাতু, ত্রি ধাতু, সপ্তধাতু কিংবা অষ্ট ধাতু-নির্মিত

হ'তে পারে। মাদুলীর মধ্যে আরবী আয়াত, বর্ণ, সংখ্যা কিংবা সেসবের 'সংকেত লেখা' কাগজ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। দোয়ার বদলে তার মধ্যে থাকতে পারে গাছ-গাছড়ার শিকড়, কিংবা অন্য কিছু। দোয়ার সঙ্গে তাবিজের প্রধান পার্থক্য এখানেই।

৬. **কবচ :** উল্লেখযোগ্য যে, 'কবচ' শব্দটি তন্ত্রধর্মের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণতঃ হিন্দু লোক-চিকিৎসকদের সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা তার সংকেত লিখিত নক্সাকেই 'কবচ' বলা হয়। এর মধ্যে ঐ রকম নক্সা ছাড়া শ্মাশানের ছাই কিংবা অন্যবিধ দ্রব্য ও গাছ-গাছড়ার শিকড়ও থাকে। এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত নানা প্রকার ধাতুর তৈরি মাদলী আবশ্যক হয়।

৭. **তাগা :** 'তাগা' ব'লতে 'সুতা' বুঝায়। আর 'সুতা' বাঁধাকে বলা হয়-'তাগা বাঁধা'। আবার 'সুতা বাধাঁর' নকলকেও 'তাগা বাঁধা' ব'লে। সাধারণতঃ জ্বর উপরি, ভূত-প্রেত, জ্বিন-পরীর আক্রমণ প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য 'তাগা' বা 'ডোর' বাঁধা হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসার সময় ওঝা মন্ত্রুপুত ধুলো দিয়ে নানা রকম 'তাগা বাঁধেন'। পাটের আঁশ, সুতা, দড়ি ইত্যাদি মন্ত্রপুত ক'রেও 'তাগা বাঁধা' হ'য়ে থাকে।

৮. **নাক্‌শী :** লোক-চিকিৎসকগণ নানা রোগ-চিকিৎসার জন্য নানা রকম 'নাকশী পড়া' দিয়ে থাকন। এটাও পীরালী-ফকিরী চিকিৎসার অন্তর্গত। 'নাকশী' ব'লতে বুঝায় আপাকানো মন্ত্রুপুত গিঁঠ দেওয়া সুতা-যা গলায় হাতে বা কোমরে ধারণ করা বিধি। তবে কখনও কখনও তা চুলেও বেঁধে দেয়া হয়। এটি প্রস্তুতের জন্য লাল, নীল ও কালো সুতার প্রয়োজন হয়। তবে নীল সুতাই বেশী ব্যবহৃত হয়। সাদা সুতা আদৌ নয়। রোগ বিশেষে, নির্দিষ্ট রংএর সুতা, মন্ত্র বা দোয়া-কালাম পাঠ ক'রে, প্রতিবারে এক ফুঁ দিয়ে, এক গিঁঠ লাগানো হয় এবং এমনিভাবে সাত, এগারো বা একুশ ফুঁ, ও সেই সংখ্যক গিঁঠ দিয়ে রোগী/রোগিনীকে হাতে, গলায়, কোমরে বা চুলে তা' ধারণ ক'রতে দেওয়া হয়।

৯. **বাণ :** 'বাণ' বহু রকম। 'বাণ মারা' ব'লতে সাধারণতঃ শত্রুর মৃত্যুসাধনের নিমিত্ত, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-সম্পাদন বোঝায়। এজন্য 'বাণ' এর সঙ্গে যাদুক্রিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আলোচ্য যাদুবিদ্যা 'ম্যাজিক' বা কৌশলমাত্র নয়—এমন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া ও আচার, যার মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা চরিতার্থের নকল সৃষ্টির চেষ্টা আছে-কিন্তু কোন কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনের উপায় নেই। তা' সত্ত্বেও যে-কার্য করা হয়, তার ফলাফলে থাকে। 'বাণ'-ক্রিয়া শনি, মঙ্গল কিংবা অমাবশ্যা রাতে নির্জন গৃহে, বহিঃপ্রাংগনে, ত্রিপথসন্ধিতে কিংবা শ্মশানে করণীয়। 'বাণ' মেরে বৃক্ষ, প্রাণী ও মানুষকে অত্যল্পকালের মধ্যে চিকিৎসার অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করানো যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুরও ব্যবস্থা করা যায় ব'লে ওঝা-ফকীর-গুণীনরা দাবী ক'রেন। 'বাণ মারা' মানুষ, অল্পসময়ের মধ্যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে কিংবা ভেদ-বমি হ'য়ে মারা যেতে পারে, অথবা দীর্ঘদিন কঠিন রোগ ভোগ ক'রেও মৃত্যুবরণ ক'রতে পারে। এরকম রোগীকে 'উল্টো বাণ' বা কাটানো বাণের সাহায্য ব্যতীত, ঔষধ-পত্র দিয়ে (ডাক্তারী চিকিৎসায়) আরোগ্য করা যায় না ব'লে জনবিশ্বাস।

'বাণ' নানাভাবে মারা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 'বাণ' মারার জন্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির, মাটি দিয়ে মূর্তি নির্মাণ ক'রে, সেই মূর্তিকে মন্ত্রুপূত ক'রে, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সমাধা ক'রলেই

'বাণ' প্রতিসরণ লাভ ক'রে এবং কার্যতঃ বহু দূরবর্তী ব্যক্তিও তার অপ–শক্তি দিয়ে আক্রান্ত ও অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। এ রকম ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য 'বাণে'র প্রকৃতি নির্ধারণ ক'রে প্রতিরোধী 'বাণ'–এর ব্যবস্থা ক'রলেই মাত্র সে আরোগ্য হয়।

এছাড়া, যাদুক্রিয়া–নিরপেক্ষ কল্যাণকর সাধারণ রোগ–চিকিৎসামূলক বাণও আছে। শিশুদের প্লীহার বিবৃদ্ধি দূর করার জন্য প্রদত্ত 'মোচা বাণ'–এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। একটি কলার মোচায় ১০১টি খেজুরের কাঁটা, নির্দিষ্ট নিয়মে মন্ত্রপূত ক'রে ফুটিয়ে দিয়ে, ঐটি শিশু যে ঘরে থাকে সে ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মোচাটি যত শুকোতে থাকে প্লীহাও তত ছোট হ'তে থাকে এবং রোগী ক্রমশ : নিরাময় লাভ ক'রে।

১০. 'স্নান' : সর্বাংগীন ধৌত করণের জন্য কোন কোন রোগে গোসল ক'রানো হ'য়ে থাকে। গোসলের জন্য মন্ত্র, কোরাণের আয়াত বা দোয়া–কালাম পড়া পানি ব্যবহৃত হয়। ওঝা, ফকীর, বা পীর–দরবেশগণ বিশেষ বিশেষ রোগ–চিকিৎসার জন্য একটি নতুন হাঁড়ি, কলস বা গ্লাসে পানি পড়ে দেন। উক্ত পানি পান করানো, চোখ–মুখ ও মাথায় ছিটানো এবং একুশ বা একচল্লিশ দিন স্নানের জন্য ব্যবহার ক'রতে হয়। স্নান ও পানের জন্য পড়া পানির সঙ্গে নতুন অন্য পানি মিশিয়ে নেয়া হয়।

১১. 'রণ' দেওয়া : 'রণ দেওয়া' অর্থ গ্রাম–পর্যটন। সাধারণত ফাল্গুন–চৈত্র মাসে কোন গ্রামে বা তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে কলেরা বা বসন্ত, মহামারী আকারে দেখা দিলে, প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রামবাসীরা নিকটস্থ দক্ষ ফকীর বা পীর–দরবেশকে 'গ্রাম বন্দ' দেবার আবেদন জানায়। পীর বা ফকীর তাদের আমন্ত্রণে গ্রামে আসেন এবং অধিবাসীদের সবাইকে ধারণ করার জন্য একটি তাবিজ দান ক'রেন। তারপর 'সিন্নি' ক'রে গভীর রাত্রে গ্রামবাসীদের নিয়ে জিকির ক'রতে ক'রতে গ্রামের চারি সীমা ঘুরে আসেন। এই পর্যটনকালে রোগ–দেবতার গমনাগমন রোধ করার জন্য চার খণ্ড পাতলা কাগজে বসন্ত বা কলেরা নিরোধক দোয়া এবং তার নক্সা লিখে চারিখানি নূতন মেটে সরার মধ্যে কিংবা তালের ডগায় গোড়ার দিকের অংশ থেকে পাত কেটে, তাতে সেঁটে, সেগুলো লম্বা বাঁশের খুঁটায় বেঁধে গ্রামের চার কোণায় পুঁতে দেওয়া হয়। এগুলোকে 'পরোয়ানা' ব'লে। এরূপ, গ্রাম–প্রদক্ষিণ, জিকির ও 'পরোয়ানা' দেওয়াকেই সামগ্রিকভাবে 'রণ দেওয়া' ব'লে।

১২. 'সিন্নি' : পূর্বোক্ত মানত–সিন্নি ব্যতীত আর এক প্রকার 'সিন্নিকরা' আছে–যার সঙ্গে মানত ও সদকার কোন সম্পর্ক নেই। তা' হ'ল–কোন গ্রামে বা অঞ্চলে যখন কলেরা বা বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দেয়–তখন 'গ্রাম বন্ধ' দেওয়ার জন্য 'সিন্নি করা' হয়। ফকীর বা পীর–এর নির্দেশে সারা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাল ও পয়সা 'মাগুন' করা হয়। পয়সা দিয়ে গুড় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনে এনে প্রাপ্ত চালের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রামের কোন এক স্থানে উনুন তৈরি ক'রে–ক্ষীর রান্না করা হয়। এই ক্ষীরকেই সিন্নি ব'লে। সাধারণত গাঁয়ের এক প্রান্তে বা তেপয়ের মিলনস্থানে উনুন তৈরি ক'রে বড় ডেকচিতে ক্ষীর রান্না করা হয়। রান্নার সময় উপস্থিত সকলে 'জেকের গান' ক'রতে থাকে। অবশেষে ক্ষীর রান্না শেষ হ'লে––তার কিছু অংশ নিকটবর্তী জলাশয়ের কূলে, কিছু অংশ মাঠের ধারে কলার পাতায় রেখে এসে, বাকী অংশ উপস্থিত সবাইকে ভাগ ক'রে যেতে দেওয়া হয়।

খ) সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ

১. রস : 'বন–রাজ্য' থেকে সংগৃহীত বিপুল সংখ্যক ভেষজের 'রস' নিষ্কাশন ক'রে লোক–চিকিৎসায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব 'রস'–কখনও গাছটির মূল অংশে বিনা পানিতে পিষে বা ড'লে বের করা হয়, কখনও বা ঠাণ্ডা পানি কিংবা চুনের পানি মিশিয়ে পিষে বের করা হয়। কখনও কখনও একটি মাত্র বনৌষধির রস নিষ্কাশন করা হয়, কখনও করা হয় একাধিক গাছ–গাছড়ার রস একত্রে নিষ্কাশন। আর এভাবেই তৈরি হয় লোকৌষধের মিশ্রণ বা 'কম্পাউণ্ডস'।

প্রস্তুতিবিধি ও যন্ত্রাদি : 'রস নিষ্কাশনে'র জন্য শিল–পাটা, নোড়া কিংবা কাঠের পিড়া, নোড়া অথবা দা–এর হাতল আবশ্যক হয়। তার সঙ্গে কখনও প্রয়োজন হয় পানি, চুনের পানি এবং রস গ্রহণের জন্য ঝিনুক চামচ, গ্লাস বা অন্য কোন পাত্র। প্রথমত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে, গৃহীত বনৌষধি ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। তারপর পেষণ–যন্ত্রগুলোও পরিচ্ছন্ন ক'রে, 'রস–নিষ্কাশনকারী/কারিনী স্বয়ং পরিচ্ছন্ন হাতে পেষণ কার্য সম্পন্ন ক'রেন। তারপর পিষ্ট দ্রব্য হাত দিয়ে চিপে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে, ঝিনুকে বা চামচে রস ধারণ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ধৌত লতা–গুল্ম, ঘাস বা গাছ–গাছালির পাতা, কচি ডগা কিংবা ফুল শুধু দু'হাতে ডলেও রস বের ক'রে নেওয়া হয় এবং তা রোগীকে প্রলেপের জন্য দেওয়া হয়। কেটে গেলে, রক্ত নিবারণের জন্য দূর্বার কচি আগা ধুয়ে চিবিয়ে লালা–মিশ্রিত ক'রে রক্তাপ্লুত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। পেষণ ও রস নিষ্কাশনের কাজ এখানে দণ্ড দ্বারা সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

২. কস : বন–রাজ্য থেকে আহরিত কোন দ্রব্যের 'কস' বের ক'রে চিকিৎসার নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়। মূলতঃ শিকড়, ছাল, ফল, ফুল, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতির কস নিষ্কাশন করা হয়। রস–নিষ্কাশন ও কস–নিষ্কাশনের পার্থক্য এই যে, 'রস'–সরাসরি তাজা গাছ থেকে বের ক'রে নেয়া হয়, কিন্তু কস বের করা হয় পানিতে ভিজিয়ে রেখে কিংবা আগুনে জ্বালিয়ে।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রপাতি : 'কস'–নিঃস্রবণের জন্য একটি ভাঁড়, হাঁড়ি ও তার ঢাকনা, গ্লাস কিংবা বটি, দা, ছুরি বা চাকু আবশ্যক হয়। 'কস'–যদি বিনা তাপে ভিজিয়ে বার ক'রতে হয়–তা'হলে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় বনৌষধির নির্দিষ্ট উপাদান কুচিয়ে সন্ধ্যায় যে কোন ভাঁড়ে, গ্লাসে বা বাটিতে এক থেকে দেড় পোয়া পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। সকালে দেখা যায়, ঐ পানি, দ্রব্যটির কসে মিশ্রিত হ'য়ে গাঢ় তরল পদার্থে পরিণত হ'য়েছে। রঙ হ'য়েছে লাল। কিন্তু তাপ দ্বারা কস নিষ্কাশন ক'রতে হ'লে মেটে হাঁড়ির, আধা হাঁড়ি, ভাল পানির মধ্যে, মূল উপাদান কুচিয়ে কয়েক ঘণ্টা উনুনে জ্বাল দিতে হয়। জ্বালানোর ফলে, মূল পদার্থ থেকে 'কস' নিষ্কাশিত হ'য়ে পানির সঙ্গে মিশে যায় এবং ক্রমাগত তাপের জন্য গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ ক'রে। এই পানীয় কখনও কুলুকুচুর জন্য সদ্য ব্যবহৃত হয়। কখনও বা বোতলে তুলে রেখে সেবন করা হয়।

৩. পাঁচন : পাঁচন ও বনজ দ্রব্যাদি থেকে নিষ্কাশিত তরল পদার্থ। 'কস' নিষ্কাশনের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। তা'হল–কস সাধারণত একটি মাত্র দ্রব্য থেকে বের করা হয় ; কিন্তু পাঁচন তৈরি হয় পঞ্চ প্রকার বা ততোধিক বনৌষধি পানিতে জ্বালিয়ে। বিনা তাপে পানিতে

ভিজিয়ে পাঁচন তৈরি হয় না। এই জন্য পাঁচন অনেকগুলো গাছ-গাছড়ার মূল, কাণ্ড, ত্বক, ডগা, ফল প্রভৃতি একত্রে জ্বালিয়ে প্রস্তুত করা 'মিশ্রণ' বিশেষ।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : তা দ্বারা প নিষ্কাশিত কস প্রস্তুতের জন্য যে সব যন্ত্র আবশ্যক হয়, সে সব দিয়ে পাঁচনও প্রস্তুত করা হয়। পাঁচন, সাধারণত ৫/৭ সের পানি ধরে, এমন হাঁড়ি বা কড়াইতে দীর্ঘক্ষণ জ্বালানো হয়। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে, কয়েকদিন ব্যাপী তাপ দেওয়া হয়। প্রদত্ত এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পাত্রটি নামিয়ে নেয়া হয়। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে উক্ত পানি সেঁকে বোতলে ছিপি এঁটে সেবোনোপযোগী ক'রে রাখা হয়।

৪. **ক্বাথ :** 'ক্বাথ' ব'লতে পাঁচন অপেক্ষা ঘন, তরল পদার্থকে বুঝায়। পাঁচনের মত 'ক্বাথ'ও বনজ দ্রব্য কিংবা তার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে পানি দিয়ে পাক করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে, প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ একসের, দুইসের বা তিন সের পানিতে জ্বালিয়ে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ থাকতে উনুন থেকে নামিয়ে যে অতি ঘন তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকেই ব'লে 'ক্বাথ'। সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন কিংবা পুষ্টির জন্য নানা ধরণের 'ক্বাথ' ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : পাঁচন প্রস্তুতের যন্ত্রাদি 'ক্বাথ' তৈরির জন্যও ব্যবহৃত হয়। মূল দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা ক্বাথ-এর পরিমাণ এক চতুর্থাংশের অধিক হয় না। প্রস্তুত 'ক্বাথ' শিশি বা বোতলে ভরে রেখে নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, কোন কোন ককাথ বিনা জ্বালেও তৈরি করা যায়, এবং তা রোগীর পঞ্চরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

৫. **হালুয়া :** লোক-চিকিৎসায় হালুয়ার ব্যবহার সম্ভবত ইউনানী চিকিৎসা থেকে এসেছে। সাধারণত শারীরিক শক্তি ও ক্লান্তি বর্ধন, আলস্য বিদুরণ এবং মেহ-প্রমেহ নাশ ক'রতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : 'ক্বাথ' প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি-ই হালুয়া তৈরির জন্যও প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণত মুখ চওড়া এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি কিংবা কড়াই-ই এ কাজে বেশি ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। 'হালুয়া' প্রস্তুতের জন্য উপাদান হিসেবে সুজি, কিসমিস, চিনি বা মিশ্রী ইত্যাদি দ্রব্য ও লতা-গুল্মর ফল-মূল দরকার। ঐ সব দ্রব্য পানি বা দুধের সঙ্গে জ্বালিয়ে ঘন লেহবৎ পদার্থে পরিণত করা হয় এবং প্রস্তুত পদার্থ ঠাণ্ডা হ'লে থালায় বা বাটিতে রেখে নির্দিষ্ট নিয়মে খেতে দেওয়া হয়।

৬. **তৈল পাক :** বাত-বেদনা, বাত-জ্বর, পিত্ত-প্রকোপ প্রভৃতি দূর ক'রতে ওঝা-ফকীররা 'তৈল পাক' ক'রে দিয়ে থাকেন। এতে সাধারণত তিলের তেল ও বনজ লতা-গুল্মের রস ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : পাঁচনাদি প্রস্তুতের যন্ত্রাদিই, তৈল পাকেও ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। সাধারণত এক সের তিল বা সরিষার তৈল ও নির্দিষ্ট পরিমাণ বনজ গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্মের শিকড়, ছাল বা পাতার রস একত্রে মিশিয়ে উত্তম রূপে তাপ দিয়ে ফুটিয়ে তেল ও রসের মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়। কখনও কখনও এক্ষেত্রে বনজ দ্রব্যের বদলে প্রাণীজ দ্রব্যও ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুত দ্রব্য শিশি বা বোতলে ভ'রে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মে শরীরে মাথা হয়। গ্রামের লোকে একে 'তেল জ্বালানো' ব'লেন। এই তৈল 'মালিশ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৭. **'মলম'** : ক্ষত, আহত কিংবা রক্তপাত নিবারণ ও ঘা' আরোগ্যের নিমিত্ত নানা রকম মলম প্রস্তুত ক'রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত চুন ও নারিকেল তেল, কখনও বা গাছ-গাছড়ার পাতা ও চুন কিংবা ধূপ, ডাবের পানি, কাঁজির পানি, তিলের তেল প্রভৃতি একত্রে ঘুটে মলম প্রস্তুত করার পর তা নির্দেশিত নিয়মে ব্যবহার করাই বিধি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি : মলম প্রস্তুতের জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয় না। চুন-তেল বা পাতা-চুন সাধারণত হাতের তালুতে মেড়ে মলম প্রস্তুত করা হয়। কোন কোন মলম প্রস্তুতের জন্য কাঁসার বাটি ব্যবহৃত হয়।

৮. **'জাব'** : অনেক রোগ, চিকিৎসার জন্য, 'জাব' প্রদান করা হয়। বিশেষত বিষ-চিকিৎসায় লোক-চিকিৎসকগণ 'জাব' প্রয়োগ ক'রে থাকেন। গাছ-গাছালি বা লতা-গুল্মের পাতা, পালশি কিংবা শিকড়-বাকড় ও ফল-মূল পানি দিয়ে বেঁটে কিংবা চুন, হুঁকার পানি, চুনের পানি, পেঁয়াজ, লবণ ইত্যাদি এক সঙ্গে পিষে 'জাব' তৈরি করা হয়। 'জাবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, রস-নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পিষে রস বের ক'রে নেওয়া হয়-'জাব' প্রস্তুতের সময় সেরূপ করা হয় না। বরং রস-যুক্ত 'ছাবা' বা পিষ্ট দ্রব্যাদি একসঙ্গে রেখে কোন ক্ষতে, ফোঁড়ায়, বিষাক্ততাজনিত প্রদাহে, ফোলায়, পায়ের তলায় কিংবা 'গরম লাগা'র কারণে, মাথার যন্ত্রণা নিবারণে, মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। সর্পবিষ আরোগ্যের ক্ষেত্রে শিরা চিরে কিংবা মাথার উপরিভাগ ব্লেড দিয়ে ফেড়ে 'জাব' লাগাতে দেখা যায়।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : 'জাব' তৈরির জন্য সাধারণতঃ একটি শিল-পাটা ও নোড়া কিংবা কাঠের পিঁড়ি বা দা-কাঁচির হাতল এবং পানির প্রয়োজন হয়। 'জাব'-এর জন্য নির্দিষ্ট উপাদান নিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার ক'রে ঐ পিঁড়ায় বা মিহিন ক'রে বাঁটা হয়। তারপর রসসহ ঐ পিষ্ট দ্রব্য একটি কাঁঠাল পাতা লাউ পাতা বা সিম পাতায় বিছিয়ে নিয়ে কিংবা পাতা ছাড়াই প্রয়োজনীয় স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। 'জাবটি কখনও বেঁধে দেওয়া হয়, কখনও আলগা অবস্থায়-ই লাগানো থাকে। একটি মাত্র দ্রব্যের দ্বারাও জাব-প্রস্তুত হয়।

৯. **'ভারা'** : সাধারণতঃ ভার বা 'চাপান' দেওয়া বুঝতেই ভারা শব্দের ব্যবহার। গরম লাগলে তা দূর করার জন্য মাথায় যে 'জাব' প্রয়োগ করা হয়, তাকে 'জাব' না ব'লে-ব'লে 'ভারা'। আর প্রস্রাব বন্ধ হ'লে পেটে পচা কাদা ও অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে যে ভারি প্রলেপ দেয়া হয়—তাকেও ব'লে 'ভারা' 'ভারা' অবশ্য একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারাও প্রস্তুত হয়, আবার একাধিক দ্রব্য দ্বারাও প্রস্তুত হয়। ভারাকে কেউ কেউ 'পটি'ও ব'লেন।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রাদি : 'জাব' প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এক্ষেত্রেও আবশ্যক হয় এবং তৈরির নিয়মও অভিন্ন।

১০. **বড়ি** : অনেক রোগ চিকিৎসার জন্য লোক-চিকিৎসায় 'বাড়ি'র প্রয়োগ লক্ষণীয়। নানাবিধ গাছ-গাছালি, ফল-মূল, ছাল-মূল ইত্যাদি বিবিধ পন্থায় গুড়া ক'রে পানিতে গুলিয়ে বড়ি তৈরি করা হয়। ঐসব বড়ি কখনো রৌদ্রে, কখনও ছায়ায় শুকিয়ে শক্ত করা হ'য়ে থাকে এবং শিশিতে ভ'রে রেখে ব্যবহার ক'রতে দেখা যায়।

প্রস্তুতবিধি ও যন্ত্রপাতি : বড়ি প্রস্তুতের কোন কোন উপাদান খলে বা ঢেঁকিতে চূর্ণ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূর্ণ করা হয়-শিল-পাটায় কিংবা কাঠের পিঁড়ায় পিষে। চূর্ণ দ্রব্য পরে প্রয়োজনমত বনৌষধির রসে কিংবা পানিতে ভিজিয়ে হাতের তালুতে ড'লে. বড়ি বানিয়ে শুকানো হ'য়ে থাকে।

১১. অভিচার : 'অভিচার'-এর মূল উদ্দেশ্য চিকিৎসা করা হয় বরং তার বিপরীত ; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অলৌকিক উপায়ে হত্যা করা। কিন্তু অভিচারের ফলে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করার উপায় থাকার জন্যেই লোক-চিকিৎসা প্রসঙ্গে এর আলোচনা অপরিহার্য।

অভিচারিক ক্রিয়া সমাধার জন্য শনিবার, মঙ্গলবার কিংবা অমাবস্যায় বিশেষ পশু-পক্ষী হত্যা ক'রে তার হাড় বা মাংস অভিমন্ত্রিত ক'রে শত্রুর উদ্দেশ্যে গভীর নদী বা জলাশয়ে কিংবা গৃহ, দরজা উঠান, রন্ধন শালা, উনুনের পাশ বা উনুনের মধ্য প্রভৃতি মাটির নিম্নে, নির্দিষ্ট নিয়মে পুঁতে রাখা হয়। দ্রব্যটি প্রোথিত করার সময় থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অসুস্থতার সূচনা হয় এবং জিনিসটি যত দ্রুত পঁচতে বা শুকুয়ে যেতে থাকে-তত দ্রুত লোকটিও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ব'লে জনবিশ্বাস। অবশেষে ঐ বস্তুর পচন বা শুষ্কতা সমাপ্ত হ্বার সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

এ ধরনের রোগ নির্ণয় করার বিশেষ পদ্ধতি আছে এবং রোগী চরম অবস্থায় উপনীত হ্বার পূর্বেই যদি প্রতিকার স্বরূপ ঐসব প্রোথিত দ্রব্য তুলে ফেলা হয়, তবেই রোগী বাঁচে- অন্যথায় বাঁচে না। এরূপ চিকিৎসার সূচনা থেকে রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ ক'রতে থাকে।

ব্যক্তিবিশেষকে নানা মন্ত্রপুত অপদ্রব্য খাইয়ে কিংবা মন্ত্রাদির সাহায্যেও অভিচারিক ক্রিয়া, সম্পন্ন করা হয়। সেক্ষেত্রেও চিকিৎসার নিমিত্ত নানাবিধ উপায়ে পাকস্থলী থেকে ঐসব দ্রব্য বের ক'রে ফেলে রোগীকে নানা অদ্ভুত উপায়ে চিকিৎসা করা হয়।

অভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা শুধু শুত্রু-নিধন নয়, বন্ধুত্ব সৃজনও সম্ভব ব'লে ওঝা-ফকীরগণ প্রচার ক'রেন।

১২. অস্ত্রোপচার : লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও করা হয়। অস্ত্রোপচারমূলক চিকিৎসার মধ্যে হাজামদের 'ত্বকচ্ছেদ', দাইদের প্রসব কর্মে নাড়ীচ্ছেদ, নাপিতাদি বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা ফোঁড়া কাটা, বেদিয়ানীদের দ্বারা 'বাত কাটা', শিশুদের দাঁত পড়ে, দাঁত উঠতে বিলম্ব হ'লে-পরাঙিধান দিয়ে মুষড়ো কেটে দেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রাদি : এইসব অস্ত্রোপচারে, ত্বকচ্ছেদের জন্য অতি ধারালো ছুরি বা চাকু, প্রসূতীর নাড়ী কাটার জন্য ভালকো বাঁশের চোঁচ, ব্লেড ইত্যাদি, ফোঁড়া কাটার জন্য বোরোই বা বেলের কাঁটা কিংবা ধারালো ছুরি-চাকু প্রভৃতি, বাত কাটার জন্য ব্লেড, শিঙা ; দাঁত ওঠাবার জন্য পূর্বোক্ত ধান্য বিশেষ এবং দাঁত ফেলবার জন্য পাকানো সূতার দড়ি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

রক্তবন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরণের ছাই, জাব বা গাছ-গাছলির রস ইত্যাদি।

গ. চিকিৎসা-বিজ্ঞান

(Therapeutics or the Scicnce of Treatment)

প্রত্যেক চিকিৎসা–পদ্ধতির মতই লোক–চিকিৎসা-প্রণালীতেও ঔষধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট বিধি–বিধান বর্তমান। এসব নিয়ম দ্বারাই চিকিৎসা পরিচালিত হয় এবং রোগারোগ্য সম্পাদিত হয়। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগবিধির তাৎপর্য অসাধারণ। কোনো, বিধি–বিধান লংঘন করা হ'লে যে কোন চিকিৎসা–পদ্ধতিতেই ঔষধ-প্রয়োগ ব্যর্থ, ক্ষতিকর ও প্রাণান্তকর হ'য়ে থাকে। প্রত্যেকটি চিকিৎসা–পদ্ধতিতে অনুসৃত ঔষধ প্রয়োগবিধি সমূহ নিম্নোক্ত ছ'টি ভাগে বিভাজ্য। যথা–

১. ঔষধ প্রয়োগ–নীতি

২. ঔষধের মাত্রা

৩. ঔষধ প্রয়োগের কাল–ব্যবধান

৪. ঔষধের প্রয়োগ–বৈচিত্র্য

৫. বিষ–চিকিৎসা ও

৬. ঔষধের প্রয়োগ ফল।

এই ছ'টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই ঔষধ প্রয়োগ–নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক।

১. ঔষধ প্রয়োগ–নীতি

বস্তুত প্রত্যেক চিকিৎসক–ই নিজস্ব চিকিৎসা–পদ্ধতি অনুযায়ী স্বতন্ত্র ভাবে রোগী পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন। এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি ক'রেইতাঁকে ঔষধ–নির্বাচন ও ঔষধ প্রদান ক'রতে হয়। রোগী–অধ্যয়ন শেষে তাই চিকিৎসককে প্রথম এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, রোগটি 'আরোগ্যযোগ্য কি না। কোন চিকিৎসা–পদ্ধতি দ্বারাই যেহেতু সমস্ত রোগ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়, সেজন্য রোগী ভেদে রোগকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

১. সুসাধ্য রোগ

২. দুঃসাধ্য রোগ, ও

৩. অসাধ্য রোগ।

সুসাধ্য রোগ—চিকিৎসাযোগ্য, দুঃসাধ্য রোগ–'যাপ্য' বা চিকিৎসা দ্বারা সাময়িকভাবে উপশমদায়ক এবং অসাধ্য রোগ চিকিৎসা–বহির্ভূত, অতএব, পরিত্যাজ্য।

এ সম্পর্কে আয়ুর্বেদ অনুসন্ধান করলে জানা যায়, চরক সংহিতায় সমস্ত রোগকে 'সাধ্য' ও 'অসাধ্য' এই দু'ভাবে বিভক্ত করা হ'য়েছে। সুশ্রুত একে বিভক্ত ক'রেছেন–তিন ভাগে– 'সাধ্য', 'অসাধ্য' ও 'যাপ্য'। তিনি চিকিৎসককে উপদেশ দিতে গিয়ে ব'লেছেন–"সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসক সাধ্য–ব্যাধিসমূহের সাধন করিবেন, যাপ্য–ব্যাধিসমূহকে

যাপিত রাখিবেন, অসাধ্যযাপ্যব্যাধি সকল যাহাতে অসাধ্যাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা করিবেন, অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিবেন না। যে সকল ব্যাধি এক বৎসরের অধিককাল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা প্রায়ই বর্জনীয়।"[৪৬] অনুরূপ বক্তব্য 'মাধব–নিদান', 'ভাব প্রকাশ' ও অন্যান্য আয়ুর্বেদী চিকিৎসা গ্রন্থেও বিদ্যমান।

একই কথা ইউনানী, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি চিকিৎসা–গ্রন্থেও লক্ষণীয়। অ্যালোপ্যাথিক গ্রন্থে 'অসাধ্যরোগ' হিসেবে বিবিধ প্রকার ঔষধজরোগ, ক্যান্সার, লিউকেমিয়া এবং দুঃসাধ্য বা যাপ্য ব্যাধি হিসেবে 'বহুমূত্র', 'উন্মাদ' ইত্যাদি রোগের উল্লেখ দেখা যায়। হোমিওপ্যাথি যেহেতু লাক্ষণিক চিকিৎসা, সেইজন্য যেসব ব্যাধির, ঔষধ–নির্বাচনযোগ্য লক্ষণ, রোগীদেহে থাকে না, তাদের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাই হ্যানিম্যানও রোগীদের পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রেছেন।[৪৭] ভারতের কেন্ট, ডাঃ নীলমণি ঘটক লিখেছেন– "রোগের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পাইলে কোনও ফল নাই, রোগীর এবং প্রত্যেক রোগ–লক্ষণের বিশেষত্ব না পাইলে আমাদের পক্ষে ঔষধ–নির্বাচন করা একেবারে অসম্ভব...।"[৪৮] ফলে, লক্ষণের বিদ্যমানতা, অবিদ্যামানতা ও স্বল্পতাভেদে হোমিওপ্যাথি মতে রোগ সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একই কথা লোক–চিকিৎসা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। লোক–চিকিৎসকরাও সমস্ত ব্যাধিই চিকিৎসাযোগ্য ব'লে বিবেচনা ক'রেন না। তাঁরা ব'লেন– 'দুনিয়ায় ব্যাধি আছে তিন হাজার, তার এক হাজার আল্লা'র হাতে ও বাকী দু'হাজার মানুষের হাতে সাধ্য।' অর্থাৎ 'আল্লা'র হাতে যেগুলো–সে সব ব্যাধি অসাধ্য ও যাপ্য, শুধুমাত্র 'মানুষের হাতে' ন্যাস্ত ব্যাধিসমূহই সুসাধ্য।

অতএব রোগ–নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি চিকিৎসা–পদ্ধতি–ই সীমা আছে। সমস্ত চিকিৎসা–পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত রোগ যেমন চিকিৎসা করা যায় না, তেমনি যে কোন একটি চিকিৎসা–পদ্ধতিই সমস্ত রোগ নিরাময়ে সমর্থ নয়। এজন্য কোন একটি চিকিৎসা–পদ্ধতিকেই সর্বোত্তম বলার উপায় নেই। তার অপর কারণ এই যে, এক চিকিৎসা–পদ্ধতি অনুযায়ী যে–রোগ অসাধ্য ও দুঃসাধ্য–ক্ষেত্র বিশেষে অন্য চিকিৎসা–পদ্ধতি দ্বারা তা' আরোগ্য কিংবা যাপ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–যে বহুমূত্র রোগ অ্যালোপ্যাথি মতে 'ইনসুলিনে'র সাহায্যে দমিয়ে রাখা বা "যাপিত করা" ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তা' লক্ষণ সম্পন্ন থাকলে, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। শিশুদের মাড়ির মাংস বৃদ্ধি (–যা দাঁতের ওপর লম্বা হ'য়ে এগিয়ে আসে) অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় অস্ত্রোপচার ব্যতীত আরোগ্য হয় না। কিন্তু বায়োকেমিক ঔষধে তা বিনা অস্ত্রোপচারে তা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও মায়োকেমিক–চিকিৎসার অসাধ্য, ক্যান্সার রোগ, লোক–চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করার নিদর্শন চীনা চিকিৎসকরা যথেষ্ট উপস্থাপন ক'রছেন।"[৪৯] আমাদের দেশেও এরকম দুশ্চিকিৎসা কিংবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অসাধ্য বহুরোগ বিস্ময়করভাবে লোক–চিকিৎসায় আরোগ্য হ'য়ে থাকে। রোগী পর্যবেক্ষণের সময় তাই প্রত্যেক মতের চিকিৎসক–ই রোগ ও রোগীর প্রকৃতি নির্ধারণে যত্নবান হন। তিনি উপলব্ধি করার চেষ্টা ক'রেন–রোগটি সাধ্য, অসাধ্য না দুঃসাধ্য। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকৃত প্রজ্ঞাবান লোক–চিকিৎসক ও ঐ রোগীকে অবস্থানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। রোগটি অসাধ্য বিবেচিত হ'লে রোগীকে ত্যাগ ক'রেন এবং মানত, প্রার্থনা, কোরবানী বা সদকা দান ইত্যাদির

মাধ্যমে আল্লাহর করুণায় রোগ–মুক্তির উপদেশ দেন। রোগটি দুঃসাধ্য হ'লে–মন্ত্র, কালাম, দোয়া–তাবিজ কিংবা ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য করার কিংবা যাপিত রাখার প্রয়াস পান। আর তা' সুসাধ্য হ'লে সাধারণ ঔষধপত্র, ঝাড়–ফুঁক, পানি পড়া, তেল পড়া ইত্যাদির ব্যকবস্থা ক'রেন। কিংবা গাছ–গাছড়ার রস, বড়ি, জাব প্রভৃতি সেবন করিয়ে রোগ–নিরাময়ে যত্নবান হন।

২. ঔষধের মাত্রা

বলাবাহুল্য, যে কোন রকমে ঔষধ খাওয়ালেই রোগ–চিকিৎসা হয় না। ব্যাধি–নিরাময়ের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত ঔষধ রোগানুযায়ী ও রোগী অনুযায়ী প্রদান করা আবশ্যক। সমস্ত রকম চিকিৎসা–পদ্ধতিতেই ঔষধের পরিমিতি নির্ধারণ একান্ত অপরিহার্য। একে সাধারণ ভাষায় 'ঔ'ষধের মাত্রা নামে অভিমিত করা হয়।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অ্যালোপ্যাথিক সমস্ত ঔষধের–ই 'সঠিক মাত্রা' সম্পর্কে সচেতন না থাকলে শারীরিক ক্ষতি, প্রাণহানি পর্যন্ত পৌছতে পারে। এরকম ঔষধ নির্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা কম প্রযুক্ত হ'লে যেমন আশানুরূপ আরোগ্যকর ফললাভ করা যায় না, তেমনি মাত্রাধিক প্রয়োগ ক'রলে, তা' থেকে কাম্যফল প্রাপ্তির আশা বৃথা। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের ক্ষেত্রে এও লক্ষ্য করা যায় যে, 'ইনজেকশন' বা 'ক্যাপসুল' মাধ্যমে সঠিক মাত্রায় সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যথাযথ ফল লাভ সম্ভব হয় না, যেমন–'এনিমিয়া প্লুবাল ক্যাভিটি'তে, 'সেনিন–জাইলিস'–এ। এরকম ক্ষেত্রে 'পিনিসিলিন', স্টেপ্টোমাইসিন বা 'এন্টিমেনিগোকক্কাল সিরাম'–'স্যালাইনের মাধ্যমে অথবা 'ইনজেকশনে'র দ্বারায় আক্রান্ত স্থানে কখনো কখনো সরাসরি প্রয়োগ করা হয়। (যেমন–মেনিনজা ইটিসের ইনজেকশন দ্বারা সরাসরি মেরুদণ্ডের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ)।

এরকম ক্ষেত্র ব্যতীত রোগ–বিশেষও অধিক পরিমাণের বৃহৎ বৃহৎ মাত্রায় কিংবা অল্প পরিমাণের ক্ষুদ্র মাত্রায়ও ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

অ্যালোপ্যাথি মতে, সাধারণতঃ চব্বিশ বছর বয়সের মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রা এবং তার নিম্নস্থ বয়সের ও বৃদ্ধদের কম মাত্রায় প্রযোজ্য। মোটামুটি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকেই পূর্ণ মাত্রার ঔষধ প্রদান করা হয়। তারপর মাত্রা ক্রমশ কম দিতে হয়। যে নিয়মে শিশুদের জন্য অ্যালোপ্যাথি ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নরূপ :—

শিশুর বয়স	শিশুর মাত্রাংশ	পূর্ণ বয়স্কের মাত্রার কত ভাগ
১ + ১২ =	১৩ ÷ ১ =১৩ অর্থাৎ	$\frac{১}{১৩}$ ভাগ
২ + ১২ =	১৪ ÷ ২ =৭ অর্থাৎ	$\frac{১}{৭}$ ভাগ
৩ + ১২ =	১৫ ÷ ৩ =৫ অর্থাৎ	$\frac{১}{৫}$ ভাগ ইত্যাদি।

এ'ছাড়া শিশু ও বৃদ্ধদের শরীরের ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা, রোগের পর্যায় প্রভৃতি বিবেচনা ক'রেও মাত্রা নির্দেশ করা হয়।

উক্ত মাত্রা–নির্দেশের ক্ষেত্রে ঔষধের চূর্ণ, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও তরল অবস্থা ভেদে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার নিকট পরিমিতির মূলভিত্তি 'গ্রেন' যার মূল অর্থ 'গমের একটি দানা' আমাদের দেশে আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ঔষধের পরিমাপের ক্ষেত্রে যেমন 'রতি' বা 'কুঁজের একটি দানা। এ ছাড়া আছে 'স্ক্রুপল', ড্রাম, 'আউন্স', 'পাউণ্ড' প্রভৃতি।

তরল অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সাধারণত 'মিনিম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তার অর্থ এক গ্রেন ওজনের পরিমাণ মত পানি। অনেকেই মনে ক'রেন এক মিনিম অর্থ এক ফোঁটা। কিন্তু তরল পদার্থভেদে এক মিনিম ও এক ফোঁটার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন 'এক মিনিম' পানি দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ এক ফোঁটা হ'লেও 'এক মিনিম অ্যালকোহল দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ দুই ফোঁটার সমান। যেমন 'ডিজিটেলিস টিংচার'। আবার এক মিনিম ইয়ার কিংবা 'ক্লোরোফর্ম'–যথাক্রমে তিন ও চার ফোঁটা পানির সমান। সাধারণত ৬০ মিনিমে ১ (তরল) ড্রাম, ৪ ড্রাম (বা ৪৮০ মিনিম–এ) ১ আউন্স, ১৬ আউন্সে ১ পাইন্ট, ২ পাইন্টে ১ কোয়ার্ট এবং ৪ কোয়ার্টস–এ ১ গ্যালন হ'য়ে থাকে।"[৫১] অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের মাপভেদে পরিমাপভেদও বর্তমান।

এক–ই ভাবে আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ঔষধের 'মাত্রা' ও 'পরিমাণ' নির্দেশ করা হ'য়েছে। 'সুশ্রুত–সংহিতা'য় বলা হ'য়েছে—'যিনি অল্পতম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিরাপদে ও সহজভাবে রোগ নিরাময় ক'রতে পারেন—তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। কিন্তু অল্পতম ব'লতে কি বোঝানো হ'য়েছে–তা' সুস্পষ্ট নয়। আয়ুর্বেদী বা কবিরাজী ঔষধের বটিকাসমূহের পরিমাণ নানাবিধ ফলের আকারের। চূর্ণ ঔষধ ও তরল ঔষধের ও মাত্রা–পরিমাণ নির্দিষ্ট। উদয় চাঁদ দত্ত এ সম্পর্কে ব'লেছেন—"ঔষধের পরিমাণ নির্দেশ বা মাপের ক্ষেত্রে মাগধী, কলিংগ, চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি ভেদ আছে। এদের মাপের বিভিন্নতার জন্য এক তোলায় গুঞ্জ ফলের (কুঁজ) সংখ্যা ৪৬ থেকে ৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা হয়। বাংলায় ওজনের জন্য কুঁজই হ'ল নিম্নতম পরিমাণ। একে আবার ভাগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়–গম, বার্লি, ধান্য ও সরিষা দানা'। তাঁর মতে–'১ কুঁজ সমান ২ গ্রেন বা ২টি গম দানা, ৩ গ্রেন বার্লি, ৪ গ্রেন ধান এবং ১৮টি সরিষা দানা। আর ৬ কুঁজ সমান ১ আনা।[৫২] রোগীর ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগের পরিমাণ সম্পর্কে উদয় চাঁদ লিখেছেন—"The doses of medicine are not fixed. They are regulated by the age, strength, and digestive power of the patient, the nature of the illness, the state of the viscera and humours, and lastly by the properties of the drug".[৫৩] একথা সত্য।

এ ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদী কোন ঔষধের পূর্নবয়স্কের জন্য ব্যবহার্য মাত্রা যদি হয় দু'তোলা, তা' হ'লে—

১ মাসের শিশুর জন্য প্রযুক্ত হবে ১ কুঁজ এবং প্রতি অতিরিক্ত

১ মাসের শিশুর জন্য প্রযুক্ত হবে ১ কুঁজ ক'রে। কিন্তু

১ বছরের শিশুর জন্য প্রযুক্ত হবে ১ মাষা বা ১২ কুঁজ (...আনা) এবং প্রতি অতিরিক্ত

১ বছরের জন্য প্রযুক্ত হবে ১ মাষা বা অধিক।

এইভাবে ১৬ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তারপর ১৬ থেকে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত রোগীকে পূর্ণ মাত্রা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রদেয়। তারপর থেকে বিপরীতক্রমে ঔষধের মাত্রাগত পরিমাণ কমতে থাকবে।[৫৪]

একভাবে হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসা–পদ্ধতিতেও ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগের মাত্রা এবং পরিমাণভেদ বিদ্যমান। হোমিওপ্যাথির জন্য ডঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের ২৭৭ সূত্রে ব'লেছেন"...ঔষধের মাত্রা যথেষ্ট রূপে অল্প হইলে, যত অধিক পরিমাণে তাহা সমলক্ষণ মতে সুনির্বাচিত হয়, তত অধিক পরিমাণে উহা উপকারীও প্রায় আলৌকিক ভাবে ফলপ্রদ হয়...।"[৫৫]

কিন্তু 'অল্প মাত্রা'র ঔষধ ব'লতে হোমিওপ্যাথিতে সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ বোঝায় না। কারণ অ্যালোপ্যাথি ঔষধের 'ডোজ' বা মাত্রা ও হোমিওপ্যাথি ঔষধের ডোজ বা মাত্রা আদৌ এক নয়। হোমিওপ্যাথি ঔষধের মূলভিত্তি পরিমাণ–নির্ভর নয়–'শক্তি'–নির্ভর। সেই 'শক্তি'র তিনটি প্রকারভেদ বিদ্যমান। যথা–

১. দশমিক শক্তি

২. শততমিক শক্তি ও

৩. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি।

এইসব শক্তি ক্রমের বহু বৈচিত্র্য বিদ্যমান। 'অর্গ্যাননে' "অল্পদিনের অনুগ্র ব্যাধির পক্ষে যৎপরোনাস্তি অল্পমাত্রা" বা ক্ষুদ্রতম মাত্রা বোঝাতে—তিনশ'টি 'গ্লোবিউলস' সিক্ত ক'রতে সমর্থ এক ফোঁটা ঔষধের $\frac{১}{৩০০}$ অংশ তথা একটি গ্লোবিউল নির্দেশ করা হ'য়েছে। এতেও তিনি সন্তুষ্ট না হ'য়ে সূত্রে আরও ব'লেছেন—"এরূপ একটি অনুবাটিকা কিছু দুগ্ধ শকরার সহিত গুড়া করিয়া অধিক পরিমাণ জলে দ্রব করিয়া, প্রত্যেক বার সেবনের পূর্বে উত্তমরূপে আলোড়িত করিলে"...যথার্থ মাত্রা হ'য়ে থাকে।"[৫৬] এমন কি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ঘ্রাণের দ্বারাও চিকিৎসাকার্য সম্পন্ন করা হয়।

আলোচ্য চিকিৎসা–পদ্ধতি অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রয়োগ–পরিমাণ সাধারণত বয়সভেদে বিভিন্ন হয় না, ঔষধের শক্তি, রোগীর জীবনী–শক্তি, শরীরের অবস্থা বা রোগের পরিণতি প্রভৃতির কথা বিবেচনা ক'রেই ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তথাপি, শিশু, বৃদ্ধ, অতি দুর্বল ও জীবনীশক্তি নিঃশোষিত–প্রায় রোগীর ক্ষেত্রে, কম–শক্তিক্রমের ঔষধ, মাত্রা–ভগ্নাংশে প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে, অল্পবয়স্ক শিশুর মাত্রাভগ্নাংশ ব'লতে এক আউন্স পানিতে এক ফোঁটা ঔষধ কিংবা একটি গ্লোবিউল প্রদত্ত ঔষধের চারভাগের এক ভাগ, শিশুর জন্য উক্ত ঔষধের তিনভাগের একভাগ এবং তরুণের জন্য ঐ ঔষধের অর্ধভাগ মাত্রায় প্রতিবারে প্রয়োগ করার বিধি বিদ্যমান।

এক–ই ভাবে লোক–চিকিৎসাতেও ঔষধের মাত্রা ও পরিমাণ নিরুপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু লোক–চিকিৎসায় একই মাত্রা ও পরিমাণ অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা–পদ্ধতির মাত্রা ও পরিমাণ থেকে স্বতন্ত্র। লোকৌষধ 'শক্তিকৃত' রূপে ব্যবহার করা হয় না—এজন্য তার মাত্রা স্থূল। এই স্থূল মাত্রা ও অ্যালোপ্যাথি ঔষধের স্থূল মাত্রা এক নয়। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের স্থূলতা দ্রব্য–বিশেষ থেকে নিস্কাষিত কিংবা কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন 'মূল উপাদান'টির কার্যকারিতার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়–সহযোগী দ্রব্যদির দ্বারা নয়। পক্ষান্তরে, লোকৌষধে মূল ও সহযোগী ভেষজের পরিমাণভেদ থাকা সত্ত্বেও মিশ্রণের ক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য। তাই দু'তিনটি উপাদান–সহযোগে প্রস্তুত লোকৌষধও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমান একক হিসেবেই গণ্য। আর তা' প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে পরিমাপ নির্দেশ করা হয় তা' হাতের আংগুল, তার গাঁট, বোরোই, কুঁজ ইত্যাদি ফল–বিশেষ কিংবা ঝিনুক, গ্লাস ইত্যাদি পাত্র–বিশেষের দ্বারা নিরুপিত। ফলে লোক–চিকিৎসা–পদ্ধতিতে কোন কোন ঔষধ, হাতের আংগুলের এক 'কর' (পাঁট), কোন ঔষধ (যেমন হলুদ) এক গাঁট (দু'টি গিরার মধ্যবর্তী অংশ), কোন ঔষধ বোরোই কিংবা কুঁজ পরিমাণ, কোন ঔষধ এক ঝিনুক, আধা গ্লাস কিংবা আধা বাটি ইত্যাদি পরিমাণে সেবন করানো হয়। 'জাব' প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কিংবা রস–নিস্কাশনের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখার জন্য লোক–চিকিৎসায় বনজ লতা–গুল্মের তিনটি কিংবা সাততি আগা (ডগা) গ্রহণ করার বিধি বর্তমান। ক্ষেত্র বিশেষে ৪/৫টি ফুল, এক 'বিঘত' (আধ হাত) ডাল, সওয়া হাত সুতা, তিন তারের সুতা প্রভৃতি পরিমাপও ওঝা–ফকীরগণ গ্রহণ ক'রেন।

দোয়া–তাবিজের জন্য বার–কাল–ও সময়ভেদ, কালিভেদ, কাগজভেদ ছাড়াও আছে উপকরণভেদ। ঝাড়–ফুঁক এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়–একবার প'ড়ে এক ফুঁ, দু'বার পড়ে দু'ফুঁ, তিনবার পড়ে তিন ফুঁ কিংবা তিন পাঁচ, সাত অথবা একুশ ফুঁ দেওয়ার রেওয়াজ।

অতএব সমস্ত চিকিৎসা–পদ্ধতির মতই লোক–চিকিৎসাও নিয়ম–শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত আধুনিক 'সিনথেটিক' ঔষধের পরিমাণ বা মাত্রা আর বিনা যন্ত্রাদিতে অতি সাধারণভাবে প্রস্তুত লোকৌষধের পরিমাণ বা মাত্রা এক হ'তে পারে না, এক নয়ও। তথাপি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় প্রযুক্ত ঔষধের মতই তথাকথিক 'অবৈজ্ঞানিক' প্রথায় প্রযুক্ত লোকৌষধের ক্ষেত্রেও যে তার নিজস্ব পরিমাপ, মাত্রা, প্রয়োগ, একক, সময়ান্তর প্রয়োগ, মিশ্রণ প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট রূপ আছে–তা' পূর্বালোচনায় স্পষ্ট। অসুস্থ মানব শরীরকে সুস্থ করার জন্য, প্রাকৃতিক কিংবা যান্ত্রিক—কোন ঔষধ–ই শরীর, বয়স, মাত্রা, সময়ান্তর প্রয়োগ ইত্যাদিকে উপেক্ষা ক'রতে পারে না। লোক–চিকিৎসায়ও তা' পারেনি। এখানেই সকল চিকিৎসা–পদ্ধতির এবং সব রকম ঔষধেরই বৈজ্ঞানিকতার আদিম ও অবিনশ্বর ভিত্তি স্থাপিত। আধুনিককালে অতিমূল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কারখানায় প্রস্তুত ঔষধের ক্ষেত্রে এভিত্তি, দৃঢ়তর, বিস্তৃতর ও সমৃদ্ধতর হ'য়েছে, সত্য, কিন্তু প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না-তা' বলা যায় না। বর্তমানকালের অশিক্ষিত গ্রামবাসী, আদিবাসী কিংবা পেছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যেও যে চিকিৎসা–ক্ষেত্রে ঔষধ প্রস্তুত প্রয়োগে কোন বৈজ্ঞানিকতার স্পর্শ নেই–তা' বলা অসংগত।

বস্তুতঃ লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে লোক-বিজ্ঞান সম্মত ঔষধের প্রয়োগ না ঘটলে-কোন সুফল লাভ করা যায় না বরং তেমন প্রয়োগ ব্যর্থ হয় কিংবা ক্ষতিকর হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ঔষধের মতই এবং উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারদের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের মতই-লোকৌষধ এবং লোক-চিকিৎসকের চিকিৎসা-রীতিও নির্দিষ্ট নিয়মাধীন। সে নিয়ম কোন গ্রন্থে নয়-একমাত্র গুরু বা পূর্বপুরুষের নিকট থেকে জ্ঞাতব্য।

৩. ঔষধ প্রয়োগের কাল-ব্যবধান

ঔষধের মাত্রা নির্ধারণই সব নয়। যে-কোন চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই ঔষধ-প্রয়োগেরও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বিদ্যমান। অ্যালোপ্যাথি ঔষধ সাধারণত তিন, চার, ছয়, আট, বারো, চব্বিশ কিংবা আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পর ব্যবহার্য। রোগীদেশে ঔষধের বিপাক-পরবর্তী সংশ্লেষণ ও বহির্গমন এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুরূপভাবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও তরুণ ও প্রাচীন রোগাবস্থাভেদে পাঁচ, দশ পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, ছ'ঘণ্টা আট ঘণ্টা, বারো ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা, এক মাস, দু' মাস, এমন কি তিন মাস পর পরও ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ তরুণ সাংঘাতিক প্রকার রোগের ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয় এবং চির রোগের ক্ষেত্রে ঔষধের শক্তিভেদে ক্রিয়াকালের স্থায়িত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

অন্যদিকে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী রোগ ও রোগীভেদে সকালে ও বিকালে কিংবা সকালে, বিকালে ও রাতে অথবা প্রাতে, পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাতে রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত একটি জটিল রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদী ঔষধ এরূপে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস ব্যাপী সেবন করা অপরিহার্য।

এক-ই ভাবে লোক-চিকিৎসায়ও ঔষধের নির্দিষ্ট সময়ানুর প্রয়োগ বর্তমান। লোক-চিকিৎসকরাও রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ একবার, দু'বার কিংবা তিনবার মাত্র ঔষধ সেবনের নির্দেশ দেন এবং এই নিয়মে সাধারণত কোন কোন রোগ আরোগ্যের জন্য তিন দিন, সাত দিন, একুশ দিন কিংবা একচল্লিশ দিন ঔষধ সেবনের দরকার হ'য়ে থাকে। ক্ষেত্রেবিশেষে, কোন কোন ঔষধ প্রসূতি কিংবা শিশু সন্তানের জন্য আঠারো মাস পর্যন্ত ব্যবহার্য।

৪. ঔষধের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য

রোগারোগ্যের জন্য ঔষধের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত রকম চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই ঔষধের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যই প্রকার-ভেদের উৎস। সমস্ত ঔষধ যদি একই রকমে প্রয়োগ করা যেত, তা'হলে ঔষধের বিভিন্ন রূপভেদ তৈরি ক'রতে হত না। যেহেতু রোগ, রোগী ও অবস্থা-বিশেষের তাগিদে, বিভিন্নভাবে শরীরে ঔষধ সরবরাহ ক'রতে হয়, সেজন্য ঔষধও নানারকমে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে বেটি এস. বার্গার্সেন লিখেছেন—"A drug may enter the circulatoy system-either by being injected there directly for example, intravenously or by adsorption from depots in which it has been placed. The routs of drug-entry into the body can be classified into three categories ; the enternal (drugs administered via any position of the gastro-intestinal tract) ; the parenteral (drug administered by routs that bypass the gastro-intestinal tract and that are generally given by injection, there by avoiding the necessity for absorption across a mucosal barrier) ; and the percentaneous (drugs absorbed from mucous membranes, either through sublingual administration or by inhabition)".[৫৭] সহজ ভাষায় বলা যায়, অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, চূর্ণ ও তরল আকারে মুখ-গহ্বর, কিংবা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সরলান্ত্র, অপত্যপথ মারফৎ প্রয়োগ করা হয়। শরীরের মাংস-মধ্যে কিংবা শিরায় ইনজেকশন দ্বারাও ঔষধ প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। ঘ্রাণ মারফৎও ঔষধ প্রয়োগের বিধি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বর্তমান। এগুলোর মধ্যে মুখ-গহ্বর মারফৎ ঔষধ প্রদান-ই সব থেকে নিরাপদ।

আয়ুর্বেদী ঔষধের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এ সম্পর্কে ও. পি. জ্যাগ্‌গি লিখেছেন—

"Indian physicians administered liquid medicines into the rectum, the urethra and the vagina, and inhalations and fumigations through the nose. They also applied dry and wet heat to the body by means of different ingenious procedures".[৫৮] অতএব আয়ুর্বেদী ঔষধও মুখগহ্বর, নাসিকা, সরলান্ত্র, অপত্যপথ মারফৎ প্রয়োগ করা হয়। ঘ্রাণ ও স্পর্শ দ্বারা চিকিৎসাও আয়ুর্বেদে বর্তমান।

অন্যদিকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধও মুখগহ্বর মারফৎ প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। ক্ষেত্রে বিশেষে এ ঔষধ অপত্যপথে প্রবেশ করিয়ে, চর্মের উপর ঘর্ষণ ক'রে কিংবা নাসিকায় ঘ্রাণদানের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানকালে কোন কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তথাকথিত 'হোমিওপ্যাথিক ইনজেকশন' ও 'মলমাদি'ও ব্যবহার ক'রে থাকেন। কিন্তু তা' প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-নীতি বহির্ভূত। বায়োকেমিক ঔষধ শুধু মুখগহ্বরের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায়, অন্য কোন রকমে তা' প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু লোকৌষধসমূহ প্রকারভেদে মুখগহ্বর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সরলান্ত্র ও অপত্যপথে মারফৎ প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। লোক-চিকিৎসার বিবিধ প্রকার ঔষধসমূহ ঘ্রাণ, মর্দন, ধারণ, দহন, গ্রহণ, ঘর্ষণ, বিলেপন, প্রক্ষালন, নিক্ষেপন ইত্যাদি বহু রকমে প্রয়োগের নিদর্শন বিদ্যমান। লোকৌষধের প্রয়োগ বৈচিত্র্য এত ব্যাপক ও বিস্ময়কর যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধের কার্যকারিতা কোন রকম যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ প্রয়োগ হয়-বহুফলপ্রদ।

৫. বিষ-চিকিৎসা

সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই বিষ-চিকিৎসার বিশেষ স্থান আছে। মানুষ সাধারণতঃ সর্প, কীট-পতংগ, অন্যান্য প্রাণী ও বিষাক্ত বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হয়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-

পদ্ধতিতে বিষ নানাভাবে বিভক্ত। আলোচ্য মতে সমস্ত বিষ জৈব অজৈব এই দু'ভাগে যেমন বিভক্ত করা যায়, তেমনি তা' বিভক্ত করা যায়—"according to the organ or tissue of the body in which the most damaging effects are produced. Some poisons injure all cells with which rhey have contact...Others have more effect on the kidny (nefrotoixins), the liver (hepatatoxins) or on the blood or blood-forming organs."[৫৯] এ ছাড়া বিষকে এমতে তরুণ (Acute) ও প্রাচীন (Chronic)—এই দু' ভাগেও বিভক্ত করা হয়। রাসায়নিক বিভাগ অনুযায়ী জৈব ও অজৈব বিষ ব'লতে 'অ্যালকালয়েড', 'গ্লাইকোসিড', 'রেসিন', অ্যাসিড', 'ভারী ধাতু, 'অংগারাম্লজানীয় উপাদান' প্রভৃতিকে বুঝায়। 'সাইটোটক্সিন' বা 'প্রোটেপ্লাজমিক টক্সিন' অতি উগ্র বিষ–তা' কোষসমূহকে সমূলে ধ্বংস ক'রে। প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী সমূহের উপর ক্রিয়াকারী বিষকে বলা হয় 'নিউরোটক্সিন' বা 'নিউরোট্রপিক পয়জন'।

এসব বিষ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা–পদ্ধতিতে মোটামুটি তিন রকমে চিকিৎসা করা হয়। যথা–

১. বিষ অপসারণ

২. বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ

৩. বিষক্ষয়ের আয়োজন ও

৪. বিষ–বিরোধী উপাদান সরবরাহ।

বিষাক্ততার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানাভাবে উক্ত চারটি উপায়ে শারীরিক বিষক্রিয়াকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়।

আয়ুর্বেদী চিকিৎসায়ও বিষ–চিকিৎসার বিশেষ স্থান আছে। 'চরক–সংহিতা'য় বিষাক্ত দ্রব্য দু'ভাগে বিভক্ত যথা–

১. প্রাণীজাত বিষ ও

২. শাকশব্জিজাত বিষ।[৬০]

আয়ুর্বেদ অনুযায়ী প্রাণীজ বিষে মানবশরীরের নিম্নাংশ বিশেষতঃ সরলান্ত্র অধিক আক্রান্ত হয় এবং শাকশবজীর বিষে অধিক আক্রান্ত হয় মানব–শরীরের উর্ধাংশ। আলোচ্য মতে বিষ প্রথমে রক্ত, তারপর মাংসে তারপর মেদ, তারপর কোষ্ঠ, তারপর হাড়, তারপর মজ্জা এবং সর্বশেষে বীর্য আক্রমণ ক'রে এবং প্রাণবিনাশ ক'রে। প্রাণীজ বিষের মধ্যে সর্পবিষ–ই প্রধান। সুশ্রুত–সংহিতায় ৮০ প্রকার সাপ, পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা–

১. দর্বিকর, ২ মণ্ডলী, ৩. রাজিমান, ৪. নির্বিষ ও বৈকরঞ্জা[৬১] ইত্যাদি। কিন্তু মাধব কর এগুলোকে ভোগী', মণ্ডলী, রাজিমান ও দ্বন্দ্বরূপী বা মিশ্র এই চার ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন।[৬২] মাধব শাকশবজীজাত 'স্থাবর' বিষকে দশভাগে এবং সর্পাদিজাত 'জংগম' বিষকে ষোল ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। 'নিদানে' এসব বিষেরও আবার নানা বিভাগ বিদ্যমান।[৬৩]

আয়ুর্বেদোক্ত এই বিষ-চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান। চরক সংহিতা'য় বিষ-চিকিৎসার চব্বিশ প্রকার উপায় নির্দেশ করা হ'য়েছে। তার মধ্যে ঔষধ, যাদুমন্ত্র, প্রার্থনা ইত্যাদিও বিদ্যমান।[৬৪] 'সুশ্রুত-সংহিতা'য়ও বিষ-চিকিৎসার বহুবিধ উপায় নির্দেশিত। তার মধ্যে সর্প-বিষ-চিকিৎসায় শল্যতন্ত্রবিদ, সুশ্রুত 'অরিষ্ট বন্ধন' বা 'তাগী বন্ধন', 'রক্ত মোক্ষণ', 'চোষণ-দংশন', 'মন্ত্র প্রয়োগ' ইত্যাদির উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি 'কল্পস্থান'-এর পঞ্চম অধ্যায়ে 'সর্পদিষ্টকল্প চিকিৎসাসিদ্ধ' আলোচনায় লিখেছেন-"মন্ত্রকোবিদ বৈদ্য মন্ত্রের সহিত অরিষ্ট বন্ধন করিবেন। মন্ত্রপুরস্কৃত রজ্জাদি দ্বারা অরিষ্ট বন্ধন বিষ-প্রতিকারী বলিয়া জানিবে। দেবব্রহ্মর্ষিপ্রোক্ত সত্য তপোময় মন্ত্র সকল সুদ্ধস্তর বিষ শীঘ্র বিনষ্ট ক'রে, অন্যথা হয় না। তেজোময় সত্যব্রহ্মতপোময় মন্ত্রসমূহ দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র নির্বারিত হয়, প্রযুক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা সেরূপ হয় না।[৬৫] অর্থাৎ সুশ্রুতের মতে ঔষধ অপেক্ষা পবিত্র মন্ত্রপূত বন্ধ দ্বারা নির্মিত তাগা এবং বিষনাশক মন্ত্রই সর্পবিষ-চিকিৎসায় শ্রেষ্ঠ।

বিষ- চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। কারণ এ চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী মানব শরীর যেকোন রকম বিষ দ্বারা আক্রান্ত হবার পর, যেসব লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সুস্থ শরীরে সেই সব লক্ষণ সৃষ্ট ক'রতে সমর্থ এমন শক্তিকৃত ঔষধই, ওই রোগীর বিষনাশ ক'রে। এজন্য 'ল্যাকেসিস' নিজে সর্পবিষজাত ঔষধ হ'লেও সে ঐ বিশেষ প্রকার সর্পবিষে আক্রান্ত (এবং অন্য বিষেও) রোগীকে নিরাময় ক'রে থাকে। অ্যালোপ্যাথির মত হোমিওপ্যাথিতেও বিষ-চিকিৎসায় মন্ত্রাদির প্রয়োগ নেই। হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসার জন্যও বহু বিষজাত ঔষধের প্রয়োগ র'য়েছে।

'লোক-চিকিৎসাতে'ও 'বিষ-চিকিৎসা'র বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। লোক-চিকিৎসকরাও বিষকে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই প্রধান বিভক্ত ক'রেন। এ ছাড়া নানা প্রকার রাসায়নিক ও ধাতু-(Metal) বিষ সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন। যাদুমন্ত্র দ্বারা বিষক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা তাঁরা স্বীকার ক'রেন। এই সব বিষ-চিকিৎসার জন্য লোক-চিকিৎসকগণ বমন-বিবেচনাদি ছাড়াও, তাপ-স্বেদ প্রদান, ঔষধ প্রয়োগ, মন্ত্র প্রয়োগ, কুমন্ত্র কাটান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন। লোকমতে প্রাণীজ বিষ দু'ভাগে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়। যথা—

১. প্রাণী বিশেষ কর্তৃক দংশনের মাধ্যমে। (যেমন-সাপ, ব্যাঙ, কুকুর, ইঁদুর, শৃগাল, বাঘ, নানা প্রকার কীটপতংগ প্রভৃতি) ; ও

২. কোন কোন প্রাণী কর্তৃক পরিত্যক্ত বিষ-স্পর্শ-সংক্রামণের মাধ্যমে। এমন কি গরুর হাড় পদদলিত ক'রলেও নাকি পায়ের গোঁড়ালিতে বিষ সঞ্চারিত হয়।

প্রাণী বিশেষের মধ্যে কুকুরের বিষ, মন্ত্রপূত থালা লাগিয়ে ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে ; ব্যাঙ, ইঁদুর, বোলতা, মৌমাছি, বিচ্ছু ইত্যাদির বিষ মুখের থু থু, চুনের ঘন প্রলেপ, কচুর ডগার রস, পেঁয়াজের রস প্রভৃতির সাহায্যে ; বাঘের দংশনজাত বিষ-মানুষের বিষ্ঠা প্রলেপনের সাহায্যে এবং সর্পবিষ-মন্ত্র ও বনৌষধির সাহায্যে আরোগ্য করা হয়। সর্প-বিষ-চিকিৎসায় নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়।

পরিত্যক্ত প্রাণীজ বিষকে 'অ্যাড়া বিষ' ব'লে। এরকম বিষ-চিকিৎসার জন্য প্রায়শ : ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া, তেল পড়া কিংবা লতাগুল্মের 'জাব' প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। 'গো-হাড়-জাত' বিষও জাব দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।

'ধাতু-বিষ' বা খনিজ পদার্থ কর্তৃক সংক্রামিত বিষ ঔষধ ও গাছ-গাছড়ার দ্বারা চিকিৎসা করার নিদর্শন বিদ্যমান। অপখাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ভক্ষণ, ঔষধ কিংবা কীট নাশক দ্রব্যাদি ভক্ষণ হ'তে বিষাক্ততা দূর করার জন্য যেমন-বিরেচনের উদ্দেশ্যে 'গোবর খাওয়ানো', 'তেল খাওয়ানো' 'বিষ্ঠা খাওয়ানো 'তেঁতুলের টক খাওয়ানো' প্রভৃতি উপায় গৃহীত হ'য়ে থাকে।

এমনিভাবে লোক-চিকিৎসায় বিষ-চিকিৎসার জন্য বিষনাশক, বিষ অপসারক, বিষ উপশামক কিংবা প্রতিবিষ প্রয়োগমূলক চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। যাদুমন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট বিষাক্ততাকে 'জন্ম সার' দ্বারা দোষাপহত ক'রে বিষঘ্ন মন্ত্র দ্বারা রোগীকে ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে তোলা হয়।

৬. ঔষধের প্রয়োগ ফল

সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির সাফল্য ঔষধের প্রয়োগফলের ওপর নির্ভরশীল। আয়ুর্বেদী, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, লোক-চিকিৎসা প্রভৃতি, প্রত্যেকটি চিকিৎসা-ব্যবস্থা ঔষধ-প্রয়োগের পর তার আরোগ্যকর ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়-সমস্ত রোগই আরোগ্য হয় না। কোন চিকিৎসা-পদ্ধতিই আজ পর্যন্ত সমস্ত রোগ চিকিৎসা ক'রতে সমর্থ নয়। এই অসামর্থ্য এক একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি এক এক রকমে ব্যাখ্যা ক'রে থাকে। অনুরূপ সীমাবদ্ধতা লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বর্তমান। লোক-চিকিৎসকও সব রোগ চিকিৎসা ক'রতে সমর্থ ব'লে দাবী ক'রেন না। তাঁরা ঔষধ প্রয়োগের পর রোগ ও রোগীর গতি পর্যবেক্ষণ ক'রেন এবং রোগটি সুসাধ্য হ'লে, যতদূর সম্ভব অল্প সময়ে চিকিৎসা ক'রতে সমর্থ হন। আর যদি তা অসাধ্য কিংবা যাপ্য হয়-তা' হ'লে তারা সে রোগীকে, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি বা অ্যালোপ্যাথির কিংবা পীর-দরবেশের শরণ নিতে পরামর্শ দেন।

অতএব লোক-চিকিৎসায় নিহিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতই শৃঙ্খলাপূর্ণ। কিন্তু তা' স্বাতন্ত্র্য বর্জিত নয়। লোক-বিজ্ঞান-সম্মত বৈশিষ্ট্যই যেহেতু উক্ত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, সেজন্য তাকে অতি প্রশংসা কিংবা অতি নিন্দা করার মধ্যে কোন বিজ্ঞান-চেতনার পরিচয় নেই। কেননা, পূর্ববর্তী তুলনামূলক আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, লোক-চিকিৎসাও একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি (A system of Medicine) এবং তারও নিজস্ব বিজ্ঞান এবং আরোগ্যকলা আছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে যশোর জেলা থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে আলোচ্য চিকিৎসা-পদ্ধতির 'ভৈষজ্য-বিজ্ঞান' বা 'মেটেরিয়া মেডিকা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় করা হবে।

তথ্য নির্দেশ

১. Janice Reid, Health is harmony, sickness as conflict. Hemisphere, Vol. 23, No. 4. (July-August 1979), P. 149.

২ দ্রষ্টাব্য, সুশ্রুত-সংহিতা (নামপত্র ছিন্ন), সূত্র-স্থান, শ্লোক-২০, পৃ. ৬।

৩. দ্রষ্টব্য, স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, অর্গ্যানন, জি. দীঘাংগী অনুদিত, (৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা-১৩৬২), পৃ. ২০৬।

৪. ঐ, পৃ. ২০৪। সূত্র ১৫ ও ১৭ দ্রষ্টব্য।

৫. সুশ্রুত-সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭। সূত্র-২০।

৬. John Forbs and W. N. Mann, Clinical Examination of Patients, (London-1950), P. 3.

৭. দ্রষ্টব্য, নীলমণি ঘটক, প্রাচীন পীড়া, তাহার কারণ ও চিকিৎসা, (কলকাতা-১৯৭২) পৃ. ৮২।

৮. O.P. Jaggi, Indian System of Medicine, (Delhi-1973) P. 117.

৯. রোগোৎপত্তির কারণ হিসেবে চরক 'দোষ'-বৈষম্যকে নয়, ধাতু, বৈষম্যকেই নির্দেশ করেছেন।

১০. O.P. Jaggi, I S M, Ibid. P. 104.

১১. দ্রষ্টব্য, স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪। সূত্র ১২।

১২ See, Samuel Hahnemann, The Chronic Diseases, (Theoritical Part, New Delhi-1978), pp. 34-35.

১৩. See, J. B. Chapman, Bio-Chemistry, (New Delhi), P. 16.

১৪. O.p. Jaggi, Folk Medicine, (Delhi-1973) P. 177.

১৫. O.P. Jaggi, F. M. Ibid., P. 178.

১৬. এই শ্রেণী-বিভাগের কথা লেখক জনৈক পীর সাহেবের নিকট থেকে জেনেছেন।

১৭. উল্লেখযোগ্য যে, যাঁরা জ্বিন-ভূত তাড়াবার চিকিৎসা ক'রেন, তাঁরা নির্দিষ্ট জীবন-যাপন পদ্ধতির একটু ব্যতিক্রম ঘটালে কিংবা সঠিক 'পদক্ষেপে' ভূল-ত্রুটি করলে শারীরিকভাবে বিপদাপন্ন হন। এমন কি, পারিবারিক ক্ষেত্রেও দূর্বিপাক ঘটে। ফলে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে আকস্মিক মৃত্যু বরন ক'রতে দেখা যায়। এমন ঘটনা শুধু এদেশে নয়, ভারতীয় বাংলো এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঘটার নজীর আছে। এরকম ঘটনার বিবরণ শোভারাণী চক্রবর্তীর গ্রন্থে বর্তমান। দ্রষ্টব্য, শোভা রাণী চক্রবর্তী, বর্তমান বংগসমাজে যাদু বিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা, (মেদিনীপুর, ১৯৭৬), পৃ. ২০২।

১৮. B.S. Bergergen, Pharmacology in Nursing, (13th Ed. U.S.A.-1976) P. 505.

১৯. দ্রষ্টব্য, মাধব কর, নিদান, (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ৫৭।

২০. Forbst Mann, Ibid., P. 4. এঁরা ব'লেন-"Every sick person is an individual problem".

২১. ঐ পৃষ্ঠা-১।

২২ ঐ, পৃষ্ঠা : ৫।

২৩. দ্রষ্টব্য, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত Clinical Side-Room Methods, (7th Ed.-1958), Contents.

২৪. দ্রষ্টব্য, মাধব কর, নিদান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-১১।

২৫. 'অনুমান' দ্বারা 'রোগ' নির্ণয়ের একটি বিস্ময়কর বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় 'বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ইবনে সিনা–র জীবন–কথা থেকে জানা যায়। দ্রষ্টব্য, এম. আকবর আলী, ইবনে সিনা, (২য় সংস্করণ, ঢাকা–১৯৫২) পৃ. ৫২–৫৮।

২৬. দ্রষ্টব্য, স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, অর্গ্যানন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯। সূত্র–৫।

২৭. O.P. Jaggi, I.S.M., Ibid., P. 121.

২৮. Op. cit, PP. 121-122.

২৯. মাধব কর, নিদান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০–২১।

৩০. ঐ পৃ. ২৯।

৩১. O.P. Jaggi, AHUN, Ibid., P. 107.

৩২ ঐ, পৃ. ২৫।

৩৩. এ মতে সাময়িক রোগসমূহ যে, দীর্ঘস্থায়ী রোগের–ই বিভিন্ন রকম উচ্ছ্বাস মাত্র, সেকথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে।

৩৪. O.P. Jaggi, F.M. Ibid., P. 1.

৩৫. B.S. Bergersen, Ibid., P. 34.

৩৬. O.P. Jaggi, I. S. M. Ibid., P. 140.

৩৭. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত–সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

৩৮. See, E. A. Farrington, Homoeopathic Clinical Materia Medica (New Dlhi-1975), P. 24.

৩৯. Dillings Clinical Pharmacology, Revised by Stanly Alstead, (London 20th Ed). P. 10.

৪০. এস.এন. পাণ্ডে, ফার্মাকোলজি ও মেটেরিয়া মেডিকা, (কলি–১৩৮৭) পৃ. ১০–১৪।

৪১. Uday Chand Dutt, The Materia Medica of the Hindus, (Revised Edition, Cal. 1922), PP. 2-7.

৪২ See, i) The Pharmaceutists 'manual or Pharmacopeia, (Cal. 10th Ed.-1944), PP. 70-72 ii) ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী, ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির ঔষধের প্রয়োগ বিজ্ঞান, (৪র্থ সংস্করণ, কলি–১৩৮৪) পৃ. ১০–১২।

৪৩. The Phamaceutist's manual, Op. Cit., P. 301-302.

৪৪. গোপাল ভট্ট, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, (ঢাকা–১৯৭৯), পৃ. ৫৭–৫৮। (গ্রন্থটি মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ক'রেছেন–'কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন)।

৪৫. গোপাল ভট্ট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭–৭৯। পরিশিষ্ট।

৪৬. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত–সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৪৭. দ্রষ্টব্য, স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, অর্গ্যানন, পূর্বোক্ত।

৪৮. ডাঃ নীলমণি ঘটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫–১১৬।

৪৯. See, Ho Peng-Yoke, Traditional Chinese Medicine, Hemisphere, Ibid., P. 255.

৫০. দ্রষ্টব্য, এস.এন. পাণ্ডে, ফার্মাকোলজি ও মেটেরিয়া মেডিকা, (কলিকাতা–১৩৮৭), পৃ. ৭০।

৫১. See, B.S. Bergersen, Ibid., P. 48-49.
৫২. See, Uday Chand Dutt, Ibid., PP.7-8.
৫৩. Op. Cit. P. 8.
৫৪. Op. Cit. P. 9.
৫৫. হ্যানিম্যান, অর্গ্যানন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৩।
৫৬. ঐ, পৃ. ৬৫২। সূত্র-২৭২।
৫৭. B. S. Bergersen, Ibid. P. 91.
৫৮. O. P. Jaggi, I.S.M. Ibid., P. 149.
৫৯. B. S. Bergersen Ibid., P. 695.
৬০. দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত-সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩০।
৬১. See, O. P. Jaggi, ISM, Ibid., PP. 188-89.
৬২. দ্রষ্টব্য, মাধব কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫।
৬৩. ঐ, পৃ. ৩৯২-৯৩।
৬৪. see, P. P. Jaggi, ISM. Ibid., 188.
৬৫. সুশ্রুত-সংহিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৬।

তৃতীয় ভাগ

ঔষধ-কোষ

(The Materia Medica)

পঞ্চম অধ্যায়

লোক-চিকিৎসার ঔষধ-কোষ

(Materia Medica of Folk-Medicine)

ভূমিকা

সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতিরই নিজস্ব ঔষধ-কোষ বিদ্যমান। লোক-চিকিৎসাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু লোক-চিকিৎসার কোন লিখিত ঔষধ কোষ নেই। তাই যশোর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মৌখিক সূত্রে প্রাপ্ত লোক-চিকিৎসার একটি সংক্ষিপ্ত ঔষধ-কোষ উপস্থাপন করা হল।

আলোচ্য ঔষধ-কোষ রোগের নামানুযায়ী সহজ সরল পদ্ধতিতে লিখিত হ'য়েছে। তবে এ বিবরণ অ্যালোপ্যাথিক রীতি অনুযায়ী শারীরবৃত্তিক ভাগেও বিন্যাস করা চলে।

১. **অগ্নিদগ্ধ :** আগুনে সামান্য পুড়লে এবং ফোস্কা ওঠার সম্ভাবনা থাকলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দগ্ধ স্থান 'ঝাড়লে' (ফুঁক দিলে) শীঘ্র যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ফোস্কা ওঠে না।

মন্ত্র

আগুন খাই আগুন বারি
ফুঁদে আগুন পানি করি॥

নিয়ম : এই মন্ত্র একবার পড়ে এক ফুঁ হিসেবে মোট সাতবার পড়ে সাত ফুঁ দিতে হবে। সেই সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে ধীরে ধীরে হস্ত সংবাহনও ক'রতে হবে। (পরীক্ষিত এবং ফলপ্রদ)।

কেরোসিন তেল

মন্ত্রাদি জানা না থাকলে, দগ্ধ স্থানে কেরোসিন তেল মাখিয়ে দিলেও ধীরে ধীরে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা পড়ে না। (ঐ)

ঘৃত কুমারীর শাঁস

দগ্ধ স্থানে ঘৃত কুমারীর ডগার মধ্যস্থ শাঁস লাগালে ফোস্কা পড়ে না ও যন্ত্রণা দূর হয়।

ডিমের কুসুম ও লালা

সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ শরীরে মুরগীর ডিম ভেঙে তার মধ্যস্থ কুসুম ও লালা একত্রে প্রলেপিত ক'রলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা পড়ে না। (ঐ)

ভিজা বালির প্রলেপ

এরূপ ক্ষেত্রে, যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কাঁচা বালি ভিজিয়ে দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

লবণ পানি

অল্প পানির মধ্যে কিছুটা লবণ দিয়ে সেই লবণ গোলা পানি দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ ক'রলেও যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ফোস্কা পড়ে না।

দগ্ধক্ষত সাংঘাতিক হ'লে পারিবারিক চিকিৎসার আওতায় থাকে না। তখন ওঝা–ফকীরকে ডাকা হয়। তিনি তাঁর শিক্ষানুযায়ী নানাবিধ লোক–ঔষধ, মলম প্রভৃতি প্রয়োগ ক'রে চিকিৎসা ক'রেন।

২. অজীর্ণ : একে 'গরহজম', 'পেট ফাঁপা', 'পেটের পীড়া', 'পেট নামা' ইত্যাদিও ব'লে। উক্ত রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

পানি পড়া

'সুরা এখলাস' একবার পড়ে এক ফূঁ, এমনিভাবে তিনবার পড়ে তিন ফুঁ দিয়ে সেই পড়া পানি দৈনিক তিন–চার বার ক'রে দু'তিন দিন খাওয়ালে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

আদা ও লবণ

কাঁচা আদা ও লবণ এক সঙ্গে প্রত্যহ দু'তিনবার ক'রে দু'তিন দিন চিবিয়ে অজীর্ণ, গরহজম, পেট ফাঁপা প্রভৃতি দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

আমলকী

কাঁচা আমলকী প্রত্যহ দুতিনবার কয়েকদিন চিবিয়ে খেলে অজীর্ণ রোগ দূর হয় ও হজম শক্তি বৃদ্ধি লাভ ক'রে।

পাথর চুনির (কুচির) পাতা

পাথর চুনি, পাথর কুচি বা হিম সাগর গাছের পাতা লবণসহ কাঁচা, দৈনিক দু'তিনবার ক'রে দু'তিন দিন চিবিয়ে খেলে অজীর্ণ রোগ, পেট ফাঁপা, গরহজম প্রভৃতি দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

শরবৎ

দীর্ঘদিনের অজীর্ণ রোগ দূর করার জন্য কাগজি লেবুর রস এক ছটাক, ফুল সোডা বা 'সোডি বাই কার্ব', এক তোলা তাল মিশ্রী ভেজানো গাঢ় পানি আধ সের, একত্রে মিশিয়ে শরবৎ

তৈরী ক'রে প্রত্যহ দু'তিনবার খেলে অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, উদরাময় প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

কাঠ কয়লার গুঁড়ো

কাঠ কয়লা গুঁড়া ক'রে সামান্য পরিমাণে প্রত্যহ তিন-চার বার খেলে অজীর্ণ রোগ, পেট ফাঁপা, গরমজম ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

কাঁচা পেয়ারা

৩. **অরুচি :** জ্বরগত অরুচি দূর করার জন্য কাঁচা পেয়ারা চিবোতে হয়। এতে সাময়িক অরুচি দূর হয়।

গন্ধ ভাদলার ঝোল

ভাতের সঙ্গে গন্ধ ভাদলার পাতার ঝোল খেলে মুখের অরুচি দূর হয়। এতে অজীর্ণ রোগও নিরাময় হ'য়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় ঘটে।

আমরুলি শাকের ঝোল

আমরুলি শাকের ঝোল দৈনিক দু'তিনবার খেলে মুখে রুচি ফিরে আসে।

৪. **অর্শ :** এর অপর নাম 'বাউসি'। এ রোগ চিকিৎসার জন্য লোক-চিকিৎসকগণ নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন।

কুকুর শোঁকা গাছের রস+আঁখের চিনি

কুকুর শোঁকা গাছের রস এক ঝিনুক পরিমাণ, আঁখের চিনিসহ দীর্ঘদিন সেবন করলে অর্শ রোগ নিরাময় হয়।

গজাল মাছ

অর্শ রোগ চিকিৎসার জন্য কোন কোন লোক-চিকিৎসক গজাল মাছ খেতে দিয়ে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে একটি গজাল মাছ, কাটা কুমরে লতার পূর্ব দিকের শিকড় ও আবশ্যকমত গোল মরিচ একত্রে রান্না ক'রে, দৈনিক দু'তিনবার ক'রে, পাঁচ দিন খাওয়াতে হয়। তাহলে অর্শ রোগ নিরাময় হয়। এ রকম চিকিৎসায় আরোগ্য, রোগীর পক্ষে, ঐ মাছ পরবর্তীকালে, জীবনেও আর কোনদিন খাওয়া চলবে না। এটি তার জন্য চির নিষিদ্ধ।

বাউস মাছ

'বাউস মাছ' আকান্দির পাতা (একুশটা) ও গোল মরিচ (একুশটা) সংগ্রহ ক'রে, প্রথমত মাছ স্বাভাবিকভাবে ভেজে নিতে হবে, তারপর তা পানি দিয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে, ঐ পাতার সাহায্যে তরকারী রান্না ক'রতে হবে। গোলমরিচ দিতে হবে-পানি দেবার সময়, এরূপে তরকারী প্রস্তুত ক'রে ঐ তরকারীর মাছ দৈনিক দু'তিন বার, চার-পাঁচ দিন খেতে হবে। একদিন অন্যকোন তরকারী কিংবা দুধ, দই খাওয়া চলবে না। তাহলে এতেই অর্শ বা বাউসি আরোগ্য হবে।

এ চিকিৎসা অবলম্বনের পর উক্ত রোগী পরবর্তী জীবনে আর কখনও ঐ মাছ খেতে পারবে না। খেলে ঐ রোগ আবার হবে এবং তা আর সারবে না।

বোয়ালের পেটের বাউস

অর্শ রোগ চিকিৎসার জন্য কোন কোন লোক-চিকিৎসক আর এক প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। তা হ'ল-বোয়াল মাছের পেটে বাউস মাছ পাওয়া গেলে, উক্ত মাছ শুকিয়ে নিয়ে ঘষে রোগীকে দু'তিন দিন খাইয়ে রোগ আরোগ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রেও বাউস মাছ ভক্ষণ পরবর্তী জীবনে রোগীর জন্য নিষিদ্ধ।

কাঁটানটে গাছের পাতা

কাঁটা নটে গাছের পাতা বেঁটে রস বের ক'রে, ঐ রস অর্শের বলিতে, প্রত্যেহ দু'তিনবার ক'রে, এক সপ্তাহ লাগালে, অর্শের রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং শুকিয়ে যায়।

লবঙ্গ

সাত-আটটি লবঙ্গ গুঁড়ো ক'রে, পানি দিয়ে দৈনিক দুতিনবার ক'রে, কয়েকদিন খেলে অর্শ বা 'বাউসি রোগ' নিরাময় হয়।

লাল আকন্দ ফুলের ক্বাথ

দৈনিক সকালে লাল আকন্দ ফুলের ক্বাথ আধা ঝিনুক থেকে এক ঝিনুক খেলে অর্শ রোগ নিরাময় হয়। এক থেকে তিন সপ্তাহ সেব্য।

ইন্দ্র যবের গুঁড়া + মধু

দৈনিক সকালে ও রাতে ইন্দ্র যবের গুঁড়া মধুসহ অর্ধ ঝিনুক মাত্রায় সেবন ক'রলে-অর্শ রোগ আরোগ্য হয়। এক থেকে তিন সপ্তাহ সেব্য।

আপাংয়ের বীজ + চাউলের পানি

সিকি তোলা আপাংয়ের বীজ বেঁটে চাউল ধোয়া পানির সাথে প্রত্যহ সকালে ও বিকালে দু'বার ক'রে কয়েকদিন খেলে অর্শ রোগ নিরাময় হয়।

করবী মূলের প্রলেপ

করবী গাছের মূল বেঁটে অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে অর্শের যন্ত্রণা হ্রাস পায়।

৫. **আমাশয় :** আমাশয় মূলত দুভাগে বিভক্ত করা হয়-'সাদা আম' ও 'রক্ত আম'। আমাশয় চিকিৎসার উপায় নিম্নরূপ।

রসগোল্লার রস

রসগোল্লার গরম রস এক কাপ পরিমাণ দু'তিন দিন 'খেলে' আমাশয় বিশেষত 'সাদা আম' আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গন্ধ ভাদুলের পাতার রস

গন্ধ ভাদুলের পাতার রস অর্ধ থেকে এক ঝিনুক পরিমাণ সামান্য মধুর সঙ্গে মেড়ে প্রত্যহ সকালে সেবন ক'রলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

মুথা ও ক্ষেত পাঁপড়ার গুঁড়া

এক তোলা মুথার গুঁড়ার সাথে এক আনা পরিমাণ ক্ষেত পাপড়ার গুঁড়া মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে বাসি পেটে সেবন করলে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

ক্কাথ

পানের–ষোলটি মুথার মূল ছেঁচে আধ সের পানি ও আধ পোয়া ছাগলের দুধ সহ জ্বাল দিয়ে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে দৈনিক দু'তিনবার সেবন ক'রলে আমাশয়, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমাতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

শামুক

শামুকের মুখের চাড়া পাটায় ঘষে সেই 'ময়লা' দু'তিন দিন খাওয়ালে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

টাইম ফুল

টাইম ফুলের গাছের দু'তিনটি আগা সামান্য লবণসহ পিষে রস তৈরী ক'রে দু'তিন দিন সকালে বাসি পেটে খাওয়ালে, শিশুদের আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

গাব গাছের ছালের রস

গাব গাছের ছাল ছেঁচে রস বের ক'রে, সেই রসের সাথে সামান্য মধু মিশিয়ে, আধ থেকে এক ঝিনুক পরিমাণ প্রত্যহ দু'তিনবার সেবন ক'রলে, আমাশয় ও পেটের পীড়া দূর হয়।

বিলেতী কচা গাছের আঁঠা

টাকি ভেন্না, বিলাতী কচা, নোনা কচা বা বিলাতী ভেন্না গাছের সাদা কস তিন ফোঁটা মাত্র, বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে বাসি পেটে প্রতিদিন সকালে একবার ক'রে তিনদিন খেলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

কাঁটানটের শিকড়

কাঁটানটের শিকড় সিকি তোলা পরিমাণ তিনটি গোলমরিচসহ পিষে নিয়মিত কিছুদিন সেবন করলে রক্তামশায় রোগ আরোগ্য হয়।

অথবা ;

ঐ শিকড় পিষে এক ঝিনুক পরিমাণ রস বের ক'রে আঁখের চিনিসহ দৈনিক সকালে ও বিকালে দুবার ক'রে খেলে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

কুকশিমা গাছের রস

কুকশিমা গাছের পাতার রস আঁখের চিনিসহ এক ঝিনুক পরিমাণ কিছুদিন সকালে ও বৈকালে সেবন ক'রলে আমাশয় রোগ দূর হয়।

ডালিম গাছের ছাল ও পাতার রস + কুটরাজের ছাল

ডালিম গাছের ছাল, জালি পাতা ও কুটরাজের ছাল একত্রে পিষে রস ক'রে এক ঝিনুক পরিমাণ রস প্রত্যহ দুবার খেলে রক্তামশায় রোগ নিরাময় হয়।

ডালিমের রস

কচি ডালিমের রস ঐ পরিমাণ কয়েকদিন খেলেও আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

বাবলার পাতা + থানকুনি শাক

বাবলা গাছের কচি পাতা ও থানকুনি শাক বেঁটে রস ক'রে প্রতিদিন এক তোলা পারিমাণে দু'তিন বার খাওয়ালে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

বাবলার পাতা + থানকুনি শাক + তেলাকুচার পাতা

বাবলা গাছের কচি পাতা, থানকুনি শাক ও তেলাকুচার জালি পাতা এবং ডগা এক সঙ্গে শাক ভাজার মত ভেজে, ভাতের সঙ্গে খেলে, কঠিন প্রকৃতির রক্তামশায়ও আরোগ্য হয়।

বাবলার পাতা, থানকুনি, তেলাকুচার পাতা ও লৌহ গরম

বাবলা গাছের কচি পাতা, থানকুনি শাক এবং তেলাকুচার জালি পাতা ও ডগায় একত্রে বেঁটে রস ক'রে, সেই রসের মধ্যে টকটকে লাল গরম লোহা দু'তিনবার ডুবিয়ে তা আধা থেকে এক ঝিনুক পরিমাণে প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে দুবার,কয়েকদিন খাওয়ালে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

থানকুনি + কাঁচা হলুদ

থানকুনি লতার পাতা, গাছ ও শিকড় এবং কাঁচা হলুদ এক কর, ঠান্ডা পানি সহ বেঁটে রস তৈরী ক'রে-সেই রস তৈরী ক'রে-সেই রস প্রতিদিন এক ঝিনুক পরিমাণে সকালে ও বৈকালে দুবার বাসি পেটে খাওয়ালে আমাশয় নিবারণ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

থানকুনি-ভর্তা

থানকুনির লতা-পাতা, কাঁচা পেয়াজ, রসুন ও জিরা এক সঙ্গে বেঁটে কাদার মত বানিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খেলে আমাশয়ে উপকার হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

থানকুনি + বুড়ি পান + লৌহ গরম

থানকুনির পাতা, লতা ও শিকড়ের রস এবং বুড়ি পানের রস একত্রে প্রস্তুত ক'রে, তার মধ্যে দু'তিনবার গরম লোহা ডুবিয়ে 'মেড়ে', উক্ত রস প্রত্যহ দুবার খাওয়ালে আমশায় ও ক্রিমিযুক্ত আমাশয় রোগ নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

তেলাকুচার রস + আঁখের গুড়

তেলাকুচা পাতার রস আঁখের গুড় বা চিনি সহ প্রত্যহ সকালে বাসি পেটে এক তোলা পরিমাণ সেবন ক'রলে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

জামের পাতা+আলো চা'লের পানি

রাতে ভিজিয়ে রাখা আলো চাউলের পানিতে জামের কচি পাতা চ'টকে একদিন তিন-চারবার খাওয়ালে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

অনন্ত মূল + মধু

তিন ঝিনুক মধুর সঙ্গে তিন তোলা পরিমাণ অনন্ত মূল বেঁটে সেই রস দু'ঝিনুক মাত্রায় দৈনিক তিনবার কয়েকদিনের মধ্যে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

৬. আমবাত : একে 'পিত্ত চ্যাগাল' বা পিত্ত-প্রকোপও ব'লে। এর ঔষধ নিম্নোক্ত প্রকার।

ছাগলের দড়ি

হঠাৎ শরীর চাকা চাকা আকারে ফুলে উঠলে, ছাগলের দড়ি দিয়ে ঐ সব স্থান ভালভাবে ঘর্ষণ ক'রলে চুলকানি ও ফোলা সেরে যায়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

তেল + হলুদ + লবণ

এরকম অবস্থায় সরিষার তেল, গুঁড়া হলুদ ও লবণ একেত্র মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে মাখলেও আমবাত আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

৭. **আঞ্জনি :** চোখের পাতার উপর শক্ত ও মোটা উদ্ভেদ দেখা দিলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন ক'রা হয়।

ভাতের কাঠি

ভাত রান্না ক'রা কাঁঠি সাত বার স্পর্শ ক'রালে আঞ্জলি আরোগ্য হয়।

৮. **আঁচিল :** শরীরের যে কোন স্থানে আঁচিল বা উপমাংস উদ্গত হ'লে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রা হয়।

কেশ-বন্ধন

বাঁধনযোগ্য আঁচিল হ'লে, মাথার চুল তুলে উক্ত আঁচিলের গোঁড়া জোরে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখলে কয়েকদিন মধ্যে আঁচিল কেটে পড়ে যায় এবং আর বৃদ্ধি পায় না।

৯. **অ্যাড়া বিষ :** জীবিত প্রাণী কর্তৃক পরিত্যক্ত বা অন্য কোন রূপে সৃষ্ট অজ্ঞাত বিষ দ্বারা শরীর বিশেষত পদতল আক্রান্ত হ'লে, প্রদাহ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফোলাও দেখা দেয়। উক্ত রোগারোগ্যের উপায় নিম্নরূপ।

সেঁক

স্বল্প যন্ত্রণা ও চুলকানিযুক্ত আক্রান্ততায় পায়ের নির্দিষ্ট স্থানটি উনুনের গরম ঝিকের উপর চেপে ধরে তাপ দিলে সেরে যায়। এরূপ তাপ একদিনে তিন-চার বার দিতে হয়।

জাব

ক. **সোনা তেলা** গাছের পাতা ও সাদা একত্রে বেঁটে 'জাব' লাগালে 'অ্যাড়া বিষ' উঠে যায় ও রোগ নিরাময় হয়।

খ. **নির্বিষ** গাছের মূল, হুঁকোর পানি, আদা ও লবণ একত্রে বেঁটে 'জাব' দিলে 'অ্যাড়া বিষ' উঠে যায়। ফোলা এবং বেদনাও নিবারণ হয়।

(নির্বিষ গাছ ভাঁদলা ঘাসের মত দেখতে। টোপা টোপা শাদা ফুল হয়। মাঠে ধানী জমিতে জন্মায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্রচুর পাওয়া যায়।)

গ. **বিষ কাঁটালি বা বিষ হরি** লতার পাতা, কুড় ও আদা এক সঙ্গে হুঁকোর পানি দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরী ক'রে লাগলে 'অ্যাড়া বিষ' আরোগ্য হয়।

ঘ. **বিষরাজ**'-এর পাতা, লবণ ও আদা, হুঁকোর পানি সহযোগে বেঁটে 'জাব' তৈরী ক'রে লাগালে 'অ্যাড়া বিষ' নষ্ট হয়ে এবং রোগ নিরাময় হয়।

ঙ. শীষ (শ্বেত?) আকন্দের গাছ, আদা ও লবণ, হুঁকোর পানি দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরী ক'রে ব্যবহার ক'রলে অ্যাড়া বিষ উঠে যায়। ফোলা এবং ব্যথাও থাকে না।

চ. ঝাঁপি টেপারি গাছের পাতা, আদা, লবণ ও হুঁকোর পানি-একসঙ্গে পিষে 'জাব' তৈরী ক'রে লাগালে পায়ের গোঁড়ালীতে লাগা 'অ্যাড়া বিষ' দূর হয়। ফোলা এবং অতি দুঃসহ যন্ত্রণাও অতি দ্রুত নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

(এসব 'জাব' রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ ব্যবহার ক'রতে হয় এবং সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে রোগারোগ্য হয়। প্রতিদিনই নতুন জাব দিতে হয়।)

১০. **একশিরা :** 'এক শিরা' রোগ নিরাময়ের নানারকম পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে 'মাদুলি ভরা' ঔষধ, প্রলেপ প্রভৃতি বিদ্যমান। নিম্নে দুটি ঔষধের বিবরণ দেয়া হল :

কার্পাস বীজ + আদা

কার্পাসের বীচি ও আদা সমপরিমাণ পানি দিয়ে বেঁটে প্রলেপ দিলে 'একশিরা' রোগ আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার রস + চিনি

'একশিরা' বা অণ্ডকোষ প্রদাহ ও শোথে বাবুই তুলসীর পাতার রস চিনিসহ প্রত্যহ দুবার ক'রে কিছুদিন সেবন করালে রোগ নিরাময় হয়।

১১. **উঁকুন :** মাথায় অধিক উঁকুন হ'লে-আতার বীচির শাঁস ও ন্যাপথলিইন গুঁড়া ক'রে আধ পোয়া নারকেল তেলের মধ্যে মিশিয়ে মাথায় লাগিয়ে কাপড় দিয়ে সারা মাথা পেঁচিয়ে বেঁধে রেখে একদিন বা দুদিন পর সাবান মেখে স্নান ক'রতে হয়। তা হ'লে উঁকুন ম'রে যায়।

১২. **উদরাময় :** উদরাময় হ'লে নিম্নোক্ত চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বিত হয়।

কার্পাস পাতা + মুথা

আধ তোলা কার্পাসের পাতার রস ও আধ তোলা মুথা ঘাসের রস একসঙ্গে মিশিয়ে পান ক'রলে উদরাময় নিরাময় হয়। ঐ রস দৈনিক সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে দু'তিন দিন সেব্য :

কুমোরে পোকার মাটি

পেটে বিড়ালের লোম প্রবেশ ক'রে উদরাময় হ'লে, ঘরে কুমোরে পোকা মাটি দিয়ে যে বাসা তৈরী ক'রে, সেই বাসা ভেঙে নিয়ে, পরিষ্কার পাত্রে গুঁড়ো ক'রে, পরিচ্ছন্নও পাতলা কাপড়ে চেঁকে (ছেঁকে) সরিষার তেলে ভিজিয়ে দু'তিনটি বড়ি বানাতে হয়। তারপর ঐ বড়ি এক এক ক'রে নাভির উপর ঘষলে, বড়ির মধ্যে লোম উঠে আসে, উদরাময়ও নিবারণ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গন্ধ ভাদুলে

শিশুদের পেট ফাঁপা, কৃমি ও উদরাময়ে গন্ধ-ভাদুলের ছোঁটা (লতা) শিশুর গলায় ও কোমরে বেঁধে দিলে উদরাময়, কৃমি প্রভৃতি দমন হয়। (সম্ভবত ঐ লতার তীব্র দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশের ফলে কৃমি দমনের জন্যই উদরাময়ের প্রকোপ হ্রাস পায়)।

১৩. **কান পাকা :** কান পাকা রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।

কালো কুকুরের প্রস্রাব

'দুষ্ট' কান পাকা রোগ নিরাময়ের জন্য কালো কুকুরের সদ্যকৃত প্রস্রাব ধরে কানে দু'তিন দিন দিলে রোগ আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ।

শাঁখের গুঁড়া

শাঁখার গুঁড়া কানে কয়েকদিন দিলে কান পাকা রোগ নিরাময় হয়।

লাউ পাতার রস

লাউ-এর কচি পাতা হাতে ডলে রস তৈরী ক'রে সেই রস প্রত্যেক দিন দু'তিন বার কানে দিলে শীঘ্রই কান পাকা রোগ নিরাময় হয়। এরূপে কয়েকদিন লাউ পাতার রস কানে দেওয়া আবশ্যক। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গাঁদা ফুলের রস

গাঁদা ফুলের রস কানে প্রত্যহ দু'তিনবার ক'রে তিন-চারদিন প্রয়োগ ক'রলে কান পাকা রোগ আরোগ্য হয়।

আদার রস+মধু+তেল

আদার রস, মধু ও তিলের তেল সমপরিমাণে মিলিয়ে সামান্য গরম ক'রে, দুএক ফোঁটা মাত্রায় দু'তিন বার ক'রে দু'তিন দিন দিলে কানের ব্যথা আরোগ্য হয়।

ভেন্নার পাতা + আদার রস

ভেন্নার পাতার রস এক ঝিনুক ও আদার রস সিকি ঝিনুক এক সঙ্গে মিশিয়ে অল্প গরম ক'রে দু'এক ফোঁটা মাত্রায় দৈনিক দু'তিন-চার বার কানে দিলে, দু'তিন দিনে কানে ব্যথার উপশম হয়।

১৪. **'কান চাটাই' বা কানের লতিতে একজিমা :** শিশুদের ও বালকের কানের লতির পশ্চাৎভাগে এক রকম দাদ জাতীয় চর্মরোগ বা একজিমা দেখা দেয়। ঐ রোগ নিম্নবর্ণিত উপায়ে চিকিৎসা করা হয় :

• **মলম**

পুরানো আষ্টলির, আকছটির বা 'মেছাগ' (মিছওয়াক) গাছের কাণ্ডের গোঁড়ায় তামাটে রঙের এক রকম পুরু ছত্রাক জন্মে-তাকে 'কান চাটোই' ব'লে। ঐ 'কান চাটোই' আগুন জ্বালানো উনুনের পাশে রেখে গরম ক'রে শুকিয়ে নিয়ে আগুন দিয়ে পোড়াতে হয়। ভাল ক'রে পোড়াবার পর প্রাপ্ত সাদা ছাই নারকেলের তেলের সঙ্গে মেড়ে মলম তৈরী ক'রে আক্রান্ত স্থানে প্রত্যহ দু'তিনবার ক'রে কয়েক দিন লাগালে ঐ রোগ নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

১৫. **কান-ব্যথা :** কানের মধ্যে যে কোন কারণে বেদনা হ'লে নিম্নোক্ত ঔষধে নিরাময় হয়।

তুলসী পাতার রস

কানের ব্যথা নিরাময়ের জন্য দু'এক ফোঁটা তুলসী পাতার রস সামান্য গরম ক'রে কানে দৈনিক সকালে-বিকালে দু'বার ক'রে কয়েক দিন দিলে কানের বেদনা নিরাময় হয়।

রসুন + সর্ষের তেল

সরিষার তেলের মধ্যে 'এক কোয়া' রসুন ছেঁচে দিয়ে আগুনের উত্তাপে সামান্য গরম ক'রে সেই গরম তেল কানে দিলে-'সান্নিক' বা কানের বেদনা নিবারণ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)
(ঠাণ্ডা লেগে কানে বেদনা হ'লে তাকে সান্নিক-এর বেদনা ব'লে)

১৬. **(কানের মধ্যে শব্দ) কানে কম শোনা :** কানের মধ্যে কোন কারণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়ে কানে কম শুনলে, নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।

আপাং-এর ছাই + তিলের তেল

আপাং গাছ পোড়ানো ছাই তিলের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে, ঐ তেল এক সপ্তাহ যাবৎ মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা ক'রে কানে দিলে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া ও কানে কম শোনা রোগ নিরাময় হয়।

১৭. **কাঁটা সরানো :** মাছ খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা ফুটলে, পথ চলার সময় পায়ে কাঁটা বিধলে কিংবা কোন কাজ করার সময় হাতে বা শরীরের কোন স্থানে কাঁটা, চোঁচ, তার, সুঁই ইত্যাদি ঢুকে ভেঙে থাকলে- ঐ সব বের ক'রে আনার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়।

ক) **তেল পড়া**

আল্লাকে ছাতি
মোহাম্মদকে গতি

ওমুকের পার কাঁটা
গলার কাঁটা
চোকির কাঁটা
ভগ্ন হও—
দোহাই তোর মাঁদার।
কার আজ্ঞে?
কামরূপ কামিক্যের আজ্ঞে
শীগ্‌গীর ভস্ম হগে
শীগ্‌গীর সার গে।।

এই মন্ত্র এক দমে তিনবার পড়ে এক ফুঁ, এরূপে তিন কিস্তিতে ন'বার পড়ে তিন ফুঁ দিয়ে পড়ে–সেই মন্ত্রপূত তেল আক্রান্ত স্থানে দৈনিক দু'তিনবার করে কয়েকদিন ব্যবহার ক'রলে কাঁটাদি বেরিয়ে যায়।

খ) যে কোন রকমে যদি কোন কাঁটা, গোঁজ, আলপিন বা অনুরূপ কোন দ্রব্য শরীরের কোন স্থানে বিদ্ধ হয় এবং তা অপারেশন ভিন্ন অন্য উপায়ে বের করার কোন সম্ভাবনা না থেকে তাহলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সরিষার তেল পড়ে সেই তেল দৈনিক তিন–চার বার ক'রে তিন–চার দিন মাখালেই উক্ত কাঁটা ইত্যাদি বেরিয়ে আসে, অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্র

রক্তবিন্দু কালা বিন্দু
চন্দ্র কয় ধক সার
ধর ধর ওরে কাঁটা
অমৃত খাও
অমৃত খেয়ে তুমি
ভস্ম হ'য়ে যাও।
অঙ্গ সার অঙ্গ বার
অমুকের অমুক জায়গায়
কাঁটা, বেদনা, ফুলো, বিষ নাই আর
কার আজ্ঞা?
মা কালীর আজ্ঞা।।

নিয়ম : এই মন্ত্র প্রথম বার প'ড়ে তেলে এক ফুঁ,
দ্বিতীয়বার প'ড়ে তেলে দুই ফুঁ, ও
তৃতীয়বার প'ড়ে তেলে তিন ফুঁ
দিতে হবে। তাহলেই তেল সঠিকভাবে মন্ত্রপূত হবে।

বিড়ালের পা ধরা

কোন বালকের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে তা বের করার জন্য ঐ শিশুকে বিড়ালের পা ধরতে বলা হয়। বালকটি বিড়ালের পা ধরে যদি ব'লে–'বিড়াল ভাই, বিড়াল ভাই–আমার গলায় কাঁটা বিঁধেচে, তুমি আমার কাঁটা নামিয়ে দ্যাও।' তাহলে নাকি কাঁটা গলা থেকে নেমে যায়।

১৮. **কাশি :** কাশি চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করা হয়।

ঘৃত কুমারী

ঘৃত কুমারীর ডাঁটার মধ্যস্থ শাঁস বা তরল পদার্থ আঁখের চিনি সহ প্রতিদিন সকালে এক সপ্তাহ সেবল ক'রলে কাশি নিরাময় হয়।

অর্জুনের ছাল + বাসক পাতা + মধু

অর্জুনের ছালের গুঁড়া, বাসক পাতার রস ও মধু একত্রে দৈনিক দু'তিনবার ক'রে সপ্তাহ খানেক সেবল ক'রলে কাশি এমনকি যক্ষ্মা নিরাময় হয়।

বাওসের (বাসকের) গাছ

বাসকের কচি পাতা লবণ দিয়ে পিষে রস ক'রে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে দুবার ক'রে আধ থেকে এক চামচ পরিমাণ কয়েক দিন খাওয়ালে কাশি আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

বাওসের গাছ + মিশ্রী

বাওসের কচি পাতা ও মিশ্রী পানিতে জ্বালিয়ে ক্বাথ তৈরী ক'রে, সেই ক্বাথ প্রতিদিন দুবার ক'রে কয়েক দিন খেলে কাশি নিরাময় হয়।

বাওসের পাতার রস + লোহা গরম

বাওসের কচি পাতার রসের মধ্যে অতি উত্তপ্ত লোহা ভিজিয়ে–'নোয়াড়' ক'রে, আধ থেকে এক ঝিনুক পরিমাণ প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে কয়েকদিন সেবন ক'রলে কাশি নিরাময় হয়। এ ঔষধ শিশুদেরও দেওয়া চলে।

পেঁপুলের ছোটা

পেঁপুলের ছোটা' (লতা) শিকড়–বাকড়সহ ছোট ছোট ক'রে কেটে লবণ, রসুন, তেল, হলুদ ও পানি দিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেই পানি ও ছোটা একটু লবণ দিয়ে মেখে কয়েকদিন নিয়মিত দু'তিন বার খেলে কাশিতে উপশম হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

(এই ক্বাথ দু'তিন দিন থেকে দু'তিন সপ্তাহও খাওয়া যায়। কোন অপকার হয় না।)

লবং গ + বচ + 'জৈষ্ঠ্য' মধু + তাল মিশ্রী

লবঙ্গ, বচ, 'জৈষ্ঠ্য, মধু ও তাল মিশ্রী একত্রে পানির সঙ্গে জ্বালিয়ে 'ক্বাথ' তৈরী ক'রে প্রতি রাতে শোবার সময় এক সপ্তাহ সেবন ক'রলে 'কাশি' আরোগ্য হয়।

(ক্বাথ তৈরী ক'রতে হলে পাঁচ ছটাক পানিতে তিন-চারটা লবঙ্গ, যষ্টি মধু, বচ-এর পরিমাণ যষ্টি মধু অপেক্ষা একটু বেশী এবং ঐ সবের সমপরিমাণ তাল মিশ্রী দিয়ে একত্রে জ্বালিয়ে আধ পোয়া পরিমাণ থাকতে নামালেই ক্বাথ প্রস্তুত হয়। উক্ত ক্বাথ প্রতিবারে দু'ঝিনুক পরিমাণ সেব্য।)

কাগজি লেবু

কাগজি লেবু বা পাঁতি লেবুর গায়ে কাদা মাখিয়ে ঐ লেবুটি আগুনে ঢুকিয়ে সিদ্ধ ক'রে, কাদা ফেলে দিয়ে ধুয়ে ভাল ক'রে বেটে খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে মেড়ে বুকে মালিশ ক'রলে শ্লেষ্মার প্রকোপ হ্রাস পায় এবং কাশি দমন হয়।

সর্ষের তেল

খাঁটি সর্ষের তেল দুহাতে ঘষে গরম ক'রে বুকে ও কণ্ঠায় মালিশ ক'রলে কাশি হ্রাস পায় বা সাময়িক উপশম ঘটে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

তুলসী পাতার রস + লবণ

কাঁচা তুলসী পাতার রস লবণ মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে বিকালে দু'বার ক'রে খেলে শ্লেষ্মা দমন হয় এবং কাশির উপশম ঘটে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

চিরতার পানি

প্রত্যেক সকালে বাসি পেটে চিরতা ভেজানো পানি দু'তিন সপ্তাহ যাবৎ পান ক'রলে ক্রিমি জনিত কাশি আরোগ্য হয়। এতে পিত্ত প্রকুপিত কাশিও নিরাময় হয়।

আদার রস + মিশ্রী

মিশ্রীর গুঁড়া আদার রসে ভিজিয়ে খেলে কাশি আরোগ্য হয়। দৈনিক দু'তিনবার ক'রে কয়েকদিন সেব্য।

কুঁজের গাছ

কুঁজের গাছ, পাতা ও শিকড় এক সঙ্গে পিষে রস তৈরী ক'রে, দৈনিক দু'তিনবার এক সপ্তাহ যাবৎ আধ বা এক চামচ পরিমাণ খাওয়ালে কাশি নিরাময় হয়।

তুলসী পাতার রস + মধু

প্রতিদিন সকালে তুলসী পাতার রস মধুসহ এক ঝিনুক পরিমাণ এক সপ্তাহ যাবৎ সেবন ক'রলে কাশি নিরাময় হয়।

তুলসী পাতার রস + মধু

প্রতিদিন সকালে তুলসী পাতার রস মধুসহ এক ঝিনুক পরিমাণ এক সপ্তাহ যাবৎ সেবন ক'রলে কাশি নিরাময় হয়।

অশ্বগন্ধার গুঁড়া

দৈনিক অশ্বগন্ধার গুঁড়া সিকি ঝিনুক পরিমাণ গরম পানি সহ খেলে কাশি নিরাময় হয়। এ ঔষধ এক থেকে তিন সপ্তাহ খেতে হয়।

মালিশ

আমরুলি শাকের রস সর্ষের তেলের সাথে মিশিয়ে সামান্য গরম ক'রে বুকে মালিশ ক'রলে শ্লেষ্মা তরল হয় এবং কাশি সহজে উঠে গিয়ে শীঘ্র নিরাময় হয়।

১৯. **কোমরে বেদনা :** নানা কারণে কোমরে বেদনা হ'তে পারে। আঘাত ব্যতীত অন্যকোন কারণে কোমরে ব্যথা হ'লে নিম্নোক্ত ঔষধে আরোগ্য হয়।

কুমোরে লতার আংটি

কুমোরে লতা গাছের পূর্বদিকের শিকড় শনি বা মঙ্গলবারের আমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায় 'নিঃশ্বাস ধরে' তুলে আংটি বানিয়ে কোমরে ধারণ ক'রলে কোমরের বেদনা নিরাময় হয়। (অতঃপর রোগীকে সদকা দিতে হয় এক টাকা। এক টাকার 'সিন্নি' কিনে জুমার ঘরে দিলেও চলে।

শেষোক্ত বিধি না মানলে যার নিকট থেকে আংটি নেওয়া হয়-তার কোমরে ব্যথা হয়।

মন্ত্র

আকস্মিক কোন কারণে কোমরে ব্যথা হ'লে সেই ব্যথা দূর করবার জন্য মন্ত্র পড়ে ঝাড়বার রীতি আছে। সাধারণতঃ বাতজনিত কারণে, পড়ে যাবার পর, আমাবস্যা-পূর্ণিমায় কিংবা অন্যকোন সময়ে এরূপ ব্যথা হতে পারে। ঐ ধরনের বেদনা হরণকারী মন্ত্রের নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হল :

রাম লক্ষণ অর্জুনের হাতের বাণ
আমার কাল কোমুরকে ব্যথা

শীগ্‌গীর ক'রে হান।
দূর হ দূর হ দূর হ॥

নির্দেশ : 'এ মন্ত্র ১৬ বার পড়ে মাটিতে একবার 'বাড়ি' (আঘাত) দিতে হবে। এরূপে সর্বমোট ষোলটি 'বাড়ি' (আঘাত) দিতে হবে।' এরূপ পরপর কয়েকদিন ঝাড়লেই কোমরের ব্যথা দূর হয়।

আকান্দির লতা

আকান্দি গাছের পূর্ব দিকের লতা, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ছিঁড়ে এনে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে, পর পর সাতটা গিঁঠ দিয়ে শিশুর গলায় শ্বাস ধরে বেঁধে দিলে, শিশুদের দাস্ত-বমি বা 'এশিয়াটিক কলেরা' নিবারণ হয়।

২০. **কোষ্ঠবদ্ধতা :** কোষ্ঠবদ্ধতা দূর ক'রার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহের যে কোনটি অবলম্বন করা যেতে পারে।

সোমরালের পাতা ভাজা

সোমরাল গাছের পাতা ভেজে অল্প পরিমাণে দু'তিনবার গরম ভাতের সাথে খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়—বাহ্য হ'য়ে থাকে।

ভেন্নার পাতার বড়ি

ঐ রোগে ভেন্না গাছের কচি পাতা পিষে বড়ি তৈরী ক'রে সেই বড়ি পথ্যাদি গ্রহণের পর একটা খেলে স্বাভাবিকভাবে বাহ্য হয়।

হাগড়ার শিকড়ের রস

কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য অফুলা হাগড়া গাছের শিকড় ছেঁচে রস বানিয়ে সেই রস দুই ঝিনুক পরিমাণ খেলে দুতিনবার স্বাহ্য হ'য়ে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

কাঁটা শেজির কস

কঠিন অন্ত্রারোধ, কাঁটা শেজির ডাঁটা ভাঙলে যে সাদা কস নির্গত হয়, ঐ কস 'কেঠো খোলায়' ভাজা খৈয়ের তিন-চারটায় মাখিয়ে খাইয়ে দিলে বাহ্য শুরু হয়। ভালভাবে বাহ্য হবার পর মিছরীর পানি খাওয়ানো আবশ্যক। নইলে বাহ্যে হ'তে থাকে এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

কল্পনাথের পাতার রস + মধু

শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য কল্পনাথ বা কালোমেঘের গাছের আট-দশটি পাতার রস সামান্য পরিমাণ মধুর সঙ্গে মেড়ে শিশুকে খাওয়ালে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। ঐ ঔষধ সকালে-বিকালে দু'তিন দিন খাওয়াতে হয়।

কেশুখের রস

প্রতিদিন সকালে এক তোলা পরিমাণ কেশুখের রস আঁখের চিনি সহ পান ক'রলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এরূপ এক সপ্তাহ সেবন করা আবশ্যক।

জোলাপ

কোষ্ঠবদ্ধতায় জোলাপ দেবার প্রয়োজন হ'লে, সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে পানের বোঁটায়, খাঁটি সরিষার তেল মাখিয়ে মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিতে হয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যে হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

দণ্ডি গাচের মূলের রস

কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য দণ্ডি গাছের মূল উত্তোলন ক'রে ঐ মূল যে ক'বার খাওয়ানো হয়, সেই ক'বার বাহ্য হ'য়ে থাকে।

রেড়ীর তেল

দু'তোলা পরিমাণ ভেন্না বা রেড়ীর তেল খেলে তৎক্ষণাৎ বাহ্য হ'য়ে কোষ্ঠ পরিস্কার হয়। এতে মৃদু পাতলা পায়খানা হয়।

জোলাপ

শিশু ও বালকদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিলে, শ্রীঘ্র বাহ্য ক'রানোর জন্য নারলি গাছের পাতা ছেঁচে রস ক'রে সেই রস বা পিষ্টদ্রব্য মলদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দিলে বাতকর্মসহ বাহ্যে হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

হরিতকী

দৈনিক সকালে এক তোলা পরিমাণ হরিতকীর গুঁড়া গরম পানির সাথে খেলে কোষ্ঠ্যবদ্ধতা দূর হয়ে বাহ্যে পরিষ্কার হয়। এক থেকে তিন সপ্তাহ সেব্য।

হরিতকী + লবণ

চারটা হরিতকী গরম পানি দিয়ে বেঁটে লবণ দিয়ে রাতে খেলে সকালে বাহ্য হয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে মাজার বেদনা থাকলে তাও দূর হয়। (এ ক্ষেত্রে হরিতকীর বীচি ফেলে দিয়ে বাঁটতে হয়।)

২১. **কলেরা :** কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিলে, সেই গ্রাম বা অঞ্চল, দোয়া-তাবিজ ও মন্ত্র দ্বারা 'বন্ধ' দেওয়া হয়। একে 'গ্রামবন্ধ দেওয়া' ব'লে। সাধারণত বসন্ত অপেক্ষা কলেরা নিরোধের জন্যই এরকম ব্যবস্থা বিশেষভাবে গৃহীত হয়।

গ্রাম–বন্ধ দিতে হ'লে, ফকীরকে কোন এক শনি বা মঙ্গলবারে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।তিনি আসবার আগেই ঐ গ্রাম বা অঞ্চল বা মহল্লার প্রত্যেকের বাড়ী থেকে সিন্নি'র জন্য চাল এবং গুড় কিনতে পয়সা আদায় করা হয়। তারপর চাল–গুড় যোগাড় ক'রে সন্ধ্যে বেলায় ফকীরকে নিয়ে উদ্যোগীরা একত্রিত হয়ে 'সিন্নি' রান্না ক'রেন। এই সময় জিকির করা হয় এবং গান গাওয়া হয়। তারপর রান্না শেষে ঐ 'সিন্নি'র একাংশ গ্রাম প্রান্তের ত্রি–পথ মধ্যবর্তী স্থানে বা গ্রামের চারি সীমানায় কলার পাতায় ক'রে রেখে আসা হয়। আর অপর অংশ উপস্থিত জনসাধারণকে খেতে দেওয়া হয়। গ্রামের চারি প্রান্তে সিন্নি দেবার সময় লম্বা খুঁটার মাথায় তাবিজ লিখে ছোট্ট সাইনবোর্ডের মত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর গ্রামস্থ নারী–পুরুষ বালক–বালিকাকে একটি ক'রে তাবিজ, লোহার মাদুলিতে ভরে ধারণ ক'রতে দেওয়া হয়।

এই ধরনের কর্মে ফকীরগণ গ্রামস্থ কলেরা বা বসন্তকে অপদেবতা বিশেষ কল্পনা ক'রে তাকে 'চালান' (অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া) দেবার মন্ত্র পাঠ ক'রেন। ফকীরীমতে এই রকম মন্ত্র প্রয়োগে কলেরা বা 'বসন্ত' আর ঐ গ্রামে থাকতে পারে না ; অন্যত্র চ'লে যেতে বাধ্য হয়। নিম্নে কলেরা–চালান দেবার এরকম একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হল।

দোসে হাওয়া তাও হুয়া
লক্ষায় আলী হায়দার
মারো গোররা কর ওয়ার
এই গ্রামের হাওয়া।
উঠাও হে আচে
উঠাও হে আচে
উঠাও হে আচে
দোহাই আল্লা
দোহাই আল্লা
দোহাই আল্লা
দোহাই আলী
দোহাই কালী।
দোহাই মা বরকত জননী
দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতার
ধর্মের দোহাই॥

নির্দেশ : এই মন্ত্র "এক দমে তিনবার পড়ে 'ইয়া মালেক' ব'লে এক হাঁক। এভাবে তিন হাঁক দিতে হ'বে এবং পশ্চিম–উত্তর কোণা থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রাম ডান–হাতি ঘুরতে হ'বে তিনবার।"

একে 'রণ' দেওয়া ব'লে।

আপাং গাছের মূল

আপাং গাছের শিকড় বেঁটে সিকি ঝিনুক পরিমাণ সেবন ক'রলে কলেরা রোগের দাস্ত–বমি বন্ধ হয়।

হরিতকী বন্ধন

হরিতকী কেটে খণ্ড ক'রে, তার এক খণ্ড সুতো দিয়ে হাতে বেঁধে রাখলে কলেরা হয় না।

২২. **কেটে যাওয়া :** কেটে গেলে নিম্নোক্ত উপায়ে চিকিৎসা করা হয়।

বাঁশের নীল + চূণ

কাঁচা বাঁশের নীল ও চূণ এক সঙ্গে পিষে 'জাব' তৈরী ক'রে সদ্য কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয় এবং ক্ষতস্থান জুড়ে গিয়ে ঘা নিরাময় হয়।

গাঁদা পাতার 'জাব'

শরীরের কোন স্থান বিশেষত হাত–পা কেটে গেলে সদ্য কর্তিত স্থানে গাঁদা ফুল গাছের পাতা বেঁটে 'জাব' দিলে কাটা স্থান জুড়ে গিয়ে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়।

দূর্বার রস + লালা

স্বল্প কেটে গেলে তৎক্ষণাৎ কচি দুর্বার আগা ৫/৭টি নিজের মুখের মধ্যে চিবিয়ে পিষ্ট ক'রে কর্তিত স্থানে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

এলাচির পাতার রস + চূণ

স্বল্প কেটে গেলে ঐ স্থানে এলাচির ৫/৭টি পাতা (শামুকের) অল্প চুনের সঙ্গে পিষে মলম তৈরী ক'রে লাগিয়ে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয় এবং দ্রুত ক্ষত নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

২৩. **কৃমি :** কৃমি রোগের প্রাদূর্ভাব এদেশে খুব বেশী। এজন্য এ রোগ নিরাময়েরও নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। সে সবের মধ্যে নিম্নোক্ত উপায়সমূহ উল্লেখ্য।

গিমা শাক

প্রতিদিন গিমা শাক ভাজা দু'তিনবার ক'রে সপ্তাহ খানেক খেলে কৃমি রোগ নিরাময় হয়।

গুলঞ্চের রস

গুলঞ্চ ভিজিয়ে রেখে সেই পানি কয়েকদিন নিয়মিত সকালে এক থেকে দু' ঝিনুক পরিমাণে সেবন ক'রলে কৃমি রোগ বিনষ্ট হয়।

ইন্দ্রযবের গুঁড়া

দৈনিক সকালে দুআনা পরিমাণ ইন্দ্রযবের গুঁড়া ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে কয়েকদিন সেবন ক'রলে কৃমির উপকার হয়।

উচ্ছেপাতার রস + আঁখের চিনি

প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঝিনুক পরিমাণ উচ্ছেপাতার রস আঁখের চিনির সাথে সেবন ক'রলে ক্রিমি রোগ নিবারণ হয়। ঐ রস এক সপ্তাহ সেবন করা আবশ্যক।

রেড়ির তেল

স্বল্প পরিমাণে রেড়ির তেল সেবন ক'রলে, ক্রিমি মরে পড়ে যায়। এটি অনেকটা 'জোলাপ' জাতীয় ঔষধ।

ভাঁটির পাতার রস + আঁখের চিনি

এক ঝিনুক ভাঁটির পাতার রস আঁখের চিনির সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে এক মাস সেবন ক'রলে ক্রিমি রোগ সমূলে দূর হয়। নতুন অতিরিক্ত ক্রিমিও জন্মানো বন্ধ হয়।

ধুতরা পাতার রস + ঘোল

দু'এক ফোঁটা ধুতরা পাতার রস ঘোলের সাথে মিশিয়ে দৈনিক সকালে একবার ক'রে কয়েকদিন পান ক'রলে কৃমি নষ্ট হয়।

পটি

ধুঞ্চে গাছের পাতা, চুনের পানি দিয়ে বেঁটে, কোটে পটি দিলে, ক্রিমি দমন হয় ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগও হ্রাস পায়।

নিমের পাতা ভাজি

নিমের পাতা ভেজে প্রতিদিন দু'বার ক'রে ভাতের সাথে এক সপ্তাহ খেলে কৃমি রোগ বিনষ্ট হয়।

নিমের ছালের গুঁড়া

প্রতিদিন সকালে দুআনা পরিমাণ নিমের ছালের গুঁড়া সামান্য লবণের সঙ্গে দু'তিনদিন সেবন ক'রলে কৃমি ম'রে বেরিয়ে যায়।

নিমের ছাল ভেজানো পানি

নিমের ছাল কুচিয়ে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি সকালে আঁখের চিনি সহ দৈনিক দু'বার ক'রে কয়েকদিন সেবন ক'রলে ক্রিমি নিরাময় হয়।

বাওসের পাতার রস + লবণ

বাওসের কচি পাতা পিষে রস বের ক'রে তার মধ্যে স্বল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে মেড়ে প্রতিদিন সকালে আধ থেকে এক ঝিনুক পরিমাণে এক সপ্তাহ খাওয়ালে ক্রিমিরোগ নিরাময় হয়।

বুঁজ-এর পাতা

বুঁজ গাচের জালি লাল পাতা আট-দশটি চিবিয়ে খেলে তৎক্ষণাৎ কৃমি দমন হয় ও কৃমিজনিত পেট বেদনা নিবারণ হয়।

কাঁচা হলুদ

প্রতিদিন সকালে বাসি পেটে কাঁচা হলুদ 'এক কর' পরিমাণ চিবিয়ে খেলে কৃমি বিনষ্ট হয়, লাবণ্য উজ্জ্বল হয় এবং স্বাস্থ্য সুন্দর হয়।

খেজুরের মুথা

খেজুর গাছের কচি চারার মুথা বা সাদা অংশ কেটে পিষে রস ক'রে শিশুকে কয়েকদিন সকালে বিকালে দু'বার স্বল্প পরিমাণে খাওয়ালে কৃমি নিরাময় হয়।

গুঁড়া হলুদের বড়ি

গুঁড়া হলুদ পানিতে গুলে বড়ি তৈরি ক'রে-দু'টি বড়ি এক সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গিলে খেলে সঙ্গে সঙ্গে কৃমি দমন হয় এবং বয়স্ক ব্যক্তিরও কৃমিজনিত মলদ্বারে চুলকানির উপশম হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

চিরতার পানি

দৈনিক সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ চিরতা ভেজানো পানি পান ক'রলে এক সপ্তাহের মধ্যে কৃমি রোগ দূর হয়।

চিরতার পানি + আঁখের রস

চিরতার পাতা ও শিকড় ভিজিয়ে সেই পানি আঁখের চিনি দিয়ে মেড়ে প্রতিদিন সকালে এক সপ্তাহ যাবৎ খেলে কৃমি নিরাময় হয়।

ডালিমের শিকড় + সুপুরির শিকড় + পাল্টে (পালিধা) মাঁদারের ছাল

ডালিম গাছের শিকড়, সুপুরি গাছের কচি শিকড় ও পাল্টে মাঁদার গাছের ছাল পানি দিয়ে বেঁটে রস ক'রে এক থেকে দু'তোলা পরিমাণ এক সপ্তাহ যাবৎ খাওয়ালে কৃমি রোগ আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

পাল্টে মাঁদার + কাঁচা হলুদ + খেজুরের মুথা + চুনের পানি

পাল্টে মাঁদার গাছের কাঁচা ছাল, খেজুরের চারার কচি মুথা ও কাঁচা হলুদ-চুনের পানি দিয়ে পিষে রস ক'রে সেই রস প্রতিদিন সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ কয়েকদিন বাসি পেটে খেলে ক্রিমির উপদ্রব দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

যুগী খ্যাতার ভারা

যুগী খ্যাতা নামক লতাজাতীয় ঘাসের শিকড়–বাকড় ও পাতাসহ গাছ বাসি পানি দিয়ে পিষে পেটে 'ভারা' দিলে কৃমি রোগের উপশম হয়।

শঠির মূল

শঠি গাছের মূল তুলে চাকা চাকা ক'রে কেটে তিন–চার খানা চাকা একত্রে ফুটো ক'রে সুতা ঢুকিয়ে মালা বানিয়ে সেই মালা কৃমি বিকারগ্রস্থ রোগীর গলায় বেঁধে দিলে কিংবা শুঁকালে কৃমিবিকার দূর হয়।

কেরোসিন

কেরোসিন তেল অল্প খেলে কৃমি দমন হয়।

চুনের ভারা

নাভির চার পাশে 'নেওয়া চুনে'র (শামুকের ঘন চুন) প্রলেপ দিয়ে নাভির মধ্যে দু'তিন ফোঁটা কেরোসিন তেল দিলে কৃমি সঙ্গে সঙ্গে দমন হয় এবং কৃমিজনিত পেটে ব্যথা নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

২৪. গরম লাগা : 'গরম লাগলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।

দূর্বার ভারা

সন্ধ্যাকালে দূর্বার উপর পরিষ্কার ন্যাকড়া ফেলে রেখে, ভোর বেলা সেই ন্যাকড়া তুলে নিয়ে চিপে, পানি সংগ্রহ ক'রতে হবে। পরপর ঐ পানি দিয়ে আধ মুঠো দূর্বার আগা পিষে ছোট ভারা তৈরি ক'রে মাথায় দিলে–গরম লেগে থাকলে তা উঠে যায় এবং মাথা ঠাণ্ডা হয়। সকাল

থেকে দুপুর পর্যন্ত ভারা রাখতে হয় এবং মাঝে মাঝে শিশিরের সংগৃহীত পানি দিয়ে ভারা ভিজিয়ে দিতে হয়। এরকম তিনচার দিন ভারা ব্যবহার ক'রলে পুরানো 'মাথার গরম' উঠে যায়।

আকান্দির ভারা

আকান্দি লতার পাতা জলপূর্ণ বাটিতে চটকালে স্পঞ্জের মত ঘন গাঢ় সবুজ 'দলা' তৈরি হয়। ঐ বস্তু মাথায় পটি রূপে ব্যবহার ক'রলে গরম লেগে থাকলে তা উঠে যায় এবং মাথা ঠাণ্ডা হয়। গরম লাগা জ্বরেও এতে উপকার হ'য়ে থাকে।

খেজুরের ওলা রস

খেজুরের পুরানো পচা ওলা রস দিয়ে মাথা ধুইয়ে ফেললে, মাথায় 'গরম লেগে' থাকলে তা উঠে যায় এবং গরম লাগা জ্বর আরোগ্য হয়। এতে মাথার অত্যন্ত যন্ত্রণাও নিবারণ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

খেজুরের তাড়ি পান

দু'এক দিনের পুরানো খেজুরের টক তাড়ি–রস খেলেও 'গরম লাগা' কেটে যায় এবং শরীর সুস্থ হয়।

গরম পানি

'গরম লাগা' রোগীর মাথায়, গরম পানি ঢাললেও 'গরম লাগা' উঠে যায় এবং মাথা ঠাণ্ডা হয়। জ্বরও কমে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

সরিষার তেল + পানি

সরিষার তেল ও পানি কাঁসার বাটিতে ফেঁটে সেই তেল মাথায় ও হাতে পায়ের তালুতে লাগাতে হয়। তারপর ঐ কাঁসার বাটি দিয়ে হাতের তালু ও পায়ের তালু ভালভাবে জোরে জোরে ঘষলে ময়লা উঠতে থাকে। যদি ময়লা উঠে, তাহলে গরম লেগেছে ব'লে নিশ্চিত হওয়া চলে। তারপর যতক্ষণ ময়লা উঠতে থাকে ততক্ষণ ঐ বাটি দিয়ে দুই হাতের ও দুই পায়ের তালু ডলতে হয়। এরকম দু'তিন বার ডললে 'গরম লাগা' উঠে যায় এবং শরীরও সুস্থ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

জামপাতার ক্বাথ

জাম গাছের কচি পাতা রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে আলো চা'লের পানিতে চ'টকে সেই পানি খাওয়ালে 'গরম' উঠে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়।

নিম পাতার ভারা

নিম গাছের কাঁচা পাতা, কাঁচা পেঁয়াজ ও হুঁকার পানি একত্রে বেঁটে মাথায় পটি বা ভারা লাগালে 'গরম লাগা জ্বর' বা ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয়। ঐ ভারা পর পর দু'তিন দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাথায় রাখা আবশ্যক। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

পেঁপলশীর পাতা

'গরম লাগলে' পেঁপলশীর বা পিপুলের একমুঠো কাঁচা পাতা এক বদনা ঠাণ্ডা পানিতে কিছুক্ষণ সজোরে চটকালে লালচে রঙের লালার মত যে পানি তৈরি হয়, সেই পানি দিয়ে ঘষে ঘষে মাথা ধুয়ে ফেললে 'গরম' উঠে যায় ও জ্বর নিরাময় হয়। এরূপ দু'তিন দিন ধোয়া আবশ্যক (শরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

বন স'লতের পটি

বন স'লতে লতার পাতা ও কাঁচা পেঁয়াজ পানি দিয়ে বেঁটে মাথায় পটি দিলে 'গরম লাগা' রোগীর গরম উঠে যায় এবং উপকার হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

বন্যে পাতার পটি

বন্যে গাছের পাতা পানি দিয়ে বেঁটে মাথায় পটি দিলে 'গরম লাগা' রোগীর গরম যায় এবং জ্বর দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

(এই পটি অতিশয় তীব্র ক্রিয়াত্মক। এজন্য মাথা থেকে পটি ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নারকেলের ঠাণ্ডা তেল, মাথার তালুতে ঐ পটি লাগানো স্থানে না মাখলে, তালু প্রদাহিত হ'য়ে ফোস্কা পড়ে এবং খুব ব্যথা হয়।)

বাইডলনের পাতার রস

বাইডলন নামক গাছের পাতা পানিতে চটকিয়ে দধির মত যে ফেনা হয় সেই ফেনা মাথার তালুতে মাখলে–গরম লাগা জ্বর নিরাময় হয় এবং গরম উঠে যায়। এতে মাথা ঘোরাও সারে।

বোরোই-কুসির পটি

বোরোই গাছের কুসি (ছোট কচি বোরোই) পানি দিয়ে বেঁটে 'পটি' তৈরি ক'রে মাথায় লাগালে মাথার গরম হ্রাস পায় ও মাথা ঠাণ্ডা হয়। রোগীরও উপকার হয়।

মোল্লার দাঁড়ি

'মোল্লার দাঁড়ি' লতার পাতা হাতে পিষে রস বের ক'রে, সেই রস মাথার তালুতে দু'তিন ফোঁটা দিলে–গরম লেগে থাকলে তা উঠে যায় এবং রোগী নিরোগ হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

(এই রস দু'এক বারের বেশী ব্যবহার্য নয়। বেশী বার ব্যবহার ক'রলে মাথার তালু প্রদাহিত হয় ও ফোস্কা পড়ে মন্ত্রণা হয়।)

তিল গাছের পাতা

তিল গাছের কাঁচা পাতা পানিতে চটকে, সেই লালাময় পানি দিয়ে মাথা ধুলে-'গরম' উঠে যায়। মাথার জ্বালা-যন্ত্রণাও নিবারণ হয়।

শিম গাছের পাতার ভারা

গোবর ন্যাদা শিম গাছের পাতা বেঁটে মাথায় ভারা দিলে 'গরম' উঠে যায় এবং মাথার জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না।

হাতিশুঁড়োর পাতার পটি

হাতিশুঁড়োর পাতা, পেঁয়াজ ও পানি একত্রে বেঁটে মাথায় পটি দিলে গরম লাগা রোগীর 'গরম' উঠে যায় এবং জ্বর আরোগ্য হয়।

২৫. **গরল লাগা :** এক প্রকার কলা পাতা রঙের তরল জীবিত (?) দ্রব্য শরীরের কোথাও লাগলে স্পর্শ-সংক্রমণের দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন হয়। উক্ত ক্ষতকে 'গরল লাগা' (ক্ষত) ব'লে। এরূপ স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে গাঢ় চুন লাগালে বিষ দোষ নষ্ট হয়। শামুকের চুন এ ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

২৬. **গর্ভপাতরোধ :** গর্ভপাতের উপক্রম হ'লে তা রোধ করার নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। নিম্নে এরূপ একটি উপায়ের উল্লেখ করা হ'ল।

আপাং-এর শিকড়

কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাতের আশংকো দেখা দিলে, শনি বা মঙ্গলবারে আপাং গাছের শিকড় তুলে শ্বাস বন্ধ ক'রে ঐ শিকড় ঐ স্ত্রীলোকের কোমরে বেঁধে দিলে আর গর্ভপাত হয় না।

২৭. **গর্ভমোচন :** গর্ভমোচন কোন রোগ নয়। কিন্তু কখনও কখনও কোন কোন রমণী প্রসবকালে নানাকারণে দীর্ঘ সময় ধরে যন্ত্রণাভোগ ক'রেন এবং অত্যন্ত কষ্ট পান। প্রসব কর্ম বিলম্বিত হওয়ায় তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফলে তাঁরা অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। এরূপ আকস্মিক অসুস্থতাকে সত্বর কাটিয়ে ওঠার জন্য দ্রুত প্রসবের নানাবিধ লৌকিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সে সবের মধ্যে 'ঝাড়-ফুঁক দেওয়া', 'পানি পড়া', 'নাক্শী দেওয়া' 'তাবিজ-কবচ' ও 'মাদুলী ধারণ' ইত্যাদিও রয়েছে। এরকম অবস্থায় ব্যবহার্য কয়েকটি মন্ত্র নিম্নরূপ ।

ফুঁক মন্ত্র-১

উদয় গিরি অস্ত গিরি সব্বহান
জলিল জালাল অক্ষয় নিরঞ্জন
অববিনেষ কালা
অমুকের সন্তান আদি
শিগ্‌গির খালাস হও।
কার আজ্ঞে, মা কালীর আজ্ঞে
শীগ্‌গীর সারগে
শীগ্‌গীর সারগে
শীগ্‌গীর সারগে॥

মন্ত্রটি প্রতিবার পড়ে প্রসূতীর শরীরে এক ফুঁ ক'রে মোট তিন ফুঁ দিতে হবে।

ফুঁক মন্ত্র-২

শক্তি আল্লা নিরঞ্জন
অবিনেষ কালা
গুরু সত্য
অমুকের গর্ভ-বেদনা মিথ্যে
কার আজ্ঞে
মান্দার শা' মুর্শিদের আজ্ঞে।

—এ মন্ত্রটির ব্যবহারও পূর্ববৎ।

জলপড়া মন্ত্র-১

ফকীর বোলায় ও আমেনা
ব্যথার দুঃখ পাও
বিসমিল্লা বিসমিল্লা ব'লে
পানি পড়া খাও।
পানি পড়া খাইয়ে শীগ্‌গীর
খালাস হইয়ে যাও।
আল্লা-নবীর আজ্ঞে দিলাম
আমার কথা নাও॥

এই মন্ত্রে সাতবার পানি অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগিনীকে সেই পানি খেতে ও উদরে মালিশ ক'রতে দেওয়া হয়।

জলপড়া মন্ত্র -২

দৈবকীর গর্ভে কৃষ্ণ শুয়ে ঘুম যায়।
এদিকে দৈবকিনী ব্যথায় কষ্ট পায়॥
কংসের ভয়ে কৃষ্ণ বাহির নাহি হয়।
দেখিয়া সে দৈবকিনীর প্রাণে বড় ভয়॥
হেনকালে দৈব মানুষ হইল উদয়।
মন্ত্র পড়িয়া মায়ের ধোনিতে ফুঁক দেয়॥
সেই তো মন্ত্রের গুণে শ্রীকৃষ্ণ গোঁসাই।
বৃন্দাবনে কেলি ক'রে শুনিবারে পাই॥
সেই সে মন্ত্রের গুণে প্রসব খালাস।
মাতা শ্মশানচণ্ডীর দেখি বড়ই উল্লাস॥
আজ্ঞা কার?
মাথা যার নড়ে—
মন্ত্র পড়িলে মহাদেবের
জটা খসে পড়ে॥

এই মন্ত্রে সাতবার জল অভিমন্ত্রত ক'রে সেই জল প্রসূতিকে খেতে ও উদরে মালিশ ক'রতে দেওয়া হয়।

মুখে চুল গুঁজে দেওয়া

প্রসবকালে পেটে চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও প্রসূতির মুখের মধ্যে চুল গুঁজে দিয়ে বমির চেষ্টা করানো হয়। এতে বমন বেগের ধাক্কায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়ে থাকে।

কৃত্রিম ঝর্ণা স্নান

গর্ভমোচন অতিশয় বিলম্বিত হলে, প্রসূতীকে বারান্দার নিম্নে ছাঁচেয় বসিয়ে, তার মাথার ওপর চালুনি ধ'রে বারান্দার চালের ওপর এমনভাবে পানি ঢালা হয়, যাতে সেই পানি চালুনির মধ্যদিয়ে প্রসূতীর মাথায় পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় নাকি দ্রুত প্রসব সম্ভব হয়।

মক্কার ফুল

কখনও কখনও প্রসবকষ্ট দূর করার জন্য হাজীদের আনীত এক প্রকার শুক্‌নো ফুল (একে মক্কার ফুল ব'লে) গ্লাসের পানিতে ভিজানো হয়। কিছুক্ষণ পর ঐ ফুলটি দল মেলতে থাকে। ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফূটিত হ'লে সেই পানি, প্রসূতীকে পান করানো হয় এবং উদরে মালিশ করানো হয়।

২৮. **গলা ফোলা :** নানা কারণে 'গলা ফুলা' রোগ হতে পারে। যে কোন কারণেই গলা ফুলুক না কেন, তা নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনীয়।

ধুতুরার পাতা + আফিম

ধুতুরার পাতার সঙ্গে এক আনা পরিমাণ আফিম বেঁটে ফোলা জায়গায় কয়েকদিন নিয়মিত লাগালে গলা ফোলা রোগ সারে।

২৯. **গর্মী বা গরসাই :** গর্মী বা উপদংশ রোগ হ'লে, উক্ত ব্যাধি নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।.

অনন্তমূল-সিদ্ধ পানি

অনন্তমূল পানিতে ভালভাবে সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি দিয়ে প্রত্যহ নিয়মিত গর্মীর ক্ষত ধৌত করলে, ক্ষত সহজে ও শীঘ্র নিরাময় হয়।

'আকন্দের পাতা -সিদ্ধ পানি

আকন্দের পাতা পানিতে সিদ্ধ ক'রে সেই পানি দিয়ে প্রতিদিন গর্মীর ক্ষত ধুলে, ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হয়।

করবীর পাতা সিদ্ধ পানি

করবী গাছের কাঁচা পাতা পানিতে ভাল রকম সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি দিয়ে প্রতিদিন ক্ষত ধুলে উক্ত ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কলমী শাকের ঝোল

কিছুদিন নিয়মিত কলমী শাকের ঝোল খেলে শরীরে গর্মী বা উপদাংশের বিষ থাকলে তা দূর হয়।

ক্কাথ প্রয়োগ

বুনো কচুরির রস, ছোট চান্দার রস, ছোট ইচের শিকড়ের রস-একত্রে পানিতে ভাল রকম সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি দিয়ে প্রত্যহ নিয়মিত ক্ষত ধুলে গর্মী রোগ সহজে নিরাময় হয়।

এই সঙ্গে তিনটি উলুর ফুল ও তিনটি গোল মরিচ বেঁটে, এক কুঁচ পরিমিত কয়েকটি বড়ি বানিয়ে সেই বড়ি দৈনিক সকালে, বিকালে ও রাতে সেবন করা আবশ্যক।

কন্টিকারীর শিকড়

প্রত্যহ পানের সঙ্গে আধ ইঞ্চি পরিমাণ কন্টিকারী গাছের বা কাঁটা নটের শিকড় খেলে গর্মীর ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হয়।

গুলঞ্চের পাতা সিদ্ধ পানি

গুলঞ্চের পাতা ভালভাবে সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি দিয়ে প্রত্যহ নিয়মিত ক্ষত ধুলে, ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৩০. গোঁদ : সাধারণত পায়ের গোড়ালীতে বা পাতার কোন স্থানের মাংস অতিশয় শক্তভাব ধারণ ক'রে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাকে 'গোঁদ হওয়া' ব'লে। এ রোগ চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়।

আকন্দের শিকড় বাঁটা জাব

চাউল ধোয়া পানি দ্বারা আকন্দ গাছের শিকড়ের ছাল বেঁটে লাগালে গোঁদ রোগ নিরাময় হয়।

৩১. ঘা বা ক্ষত : ঘা রা ক্ষত নানারকম হ'তে পারে। সাধারণতঃ যে সব ঘা অন্য কোন রোগ বা উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরূপ ঘা আরোগ্যের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

অশথের ছাই

অশথ্থ বা পাঁকুড় গাচের ছাল পুড়িয়ে, ছাই বানিয়ে, সেই ছাই ঘা-এর উপর নিয়মিত দু'তিন বার ছড়িয়ে দিলে—ঘা আরোগ্য হয়।

আকন্দি পাতার চাপ

দুরারোগ্য ও বিষাক্ত লালবর্ণ ক্ষতে আকন্দি লতার পাতার যে পাশ তৈলাক্ত ও সবুজ, সেইদিক ঘা-এর ওপর নিয়মিত কয়েকদিন লাগালে ঘা আরোগ্য হয়।

কিন্তু ঐ পাতার সাদা পাশ লাগালে ঘা বৃদ্ধি লাভ ক'রে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

ক) কাটা ঘা : কেটে গিয়ে রক্তপাত হ'লে উক্ত রক্তপাত নিবারণ ও ঘা আরোগ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় :

অ্যালাচির পাতার জাব + চূণ

অ্যালাচির কাঁচা পাতা হাতের তালুতে চূণের সঙ্গে পিষে মলম তৈরী ক'রে সেই মলম সদ্য কাটা ঘায়ে লাগালে রক্ত বন্ধ হয় ও ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

কাইয়োঝাঙার গাছ + চূণের পানি

কাইয়োঝাঙার গাছের কচি পাতা ও চূণের পানি মিশিয়ে হাতে ডলে মলম তৈরী ক'রে—সেই মলম সদ্য কাটা ঘায়ে লাগালে রক্তপড়া বন্ধ হয় ও ঘা শীঘ্র নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

কুকশিমার পাতার জাব

কুকশিমা বা কুকুর শোঁকা গাছের পাতা বেঁটে কাটা স্থানে লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়া বন্ধ হয় ও ঘা সৃষ্টি হয় না। ক্ষতস্থানও জোড়া লেগে যায়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গাঁদা পাতার জাব

গাঁদা ফুল গাছের পাতা ও ডগা বেঁটে জাব তৈরী ক'রে সেই জাব বেঁধে দিলে অতি সাংঘাতিক রকম কাটা স্থানও জোড়া লেগে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়, ঘা হয় না (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

চূণ + নাবিকেল তেলের মলম

শামুকের চূণ ও খাঁটি নারিকেলের তেল একত্রে মেড়ে কাদাটে ক'রে সেই মলম কাটা ঘায়ে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়, ব্যথা থাকে না এবং ঘা শীঘ্র নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

দূর্বাঘাসের আগা

কোন স্থান আকস্মিকভাবে কেটে গেলে ঐ স্থানে দূর্বাঘাসের কচি সাত-আটটি আগা পানি দিয়ে ধুইয়ে ফেলে, চিবিয়ে, লালাসহ চর্বিত দ্রব্য লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং ঘা সৃষ্টি হয় না। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গাবের ক্বাথ

কাঁচা গাব সিদ্ধ ক'রে ক্বাথ বানিয়ে, সেই ক্বাথ ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে পুরাতন কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিলে–উক্ত ঘা দ্রুত নিরাময় হয়।

খ) গালে ঘা : সাধারণতঃ শিশুদের গালে ও জিহ্বায় ঘা হ'লে সোহাগা খোলায় ভেজে খৈ ক'রে উক্ত খৈ গুঁড়া ক'রতে হয়। তারপর সেই খৈ মধু দ্বারা মিশিয়ে গালে ও জিভেয় প্রতিদিন দু'তিনবার ক'রে কয়েকদিন লাগালে ঐ রোগ নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

গ) জিভেয় ঘা : জিহ্বায় ঘা' হ'লে তা নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত 'মাজন' ব্যবহার্য।

মাজন

সোহাগা, ফিটকিরি, জোয়ান, তুঁতে, গুটি খয়ের ও হিরার কষ আলাদা আলাদাভাবে ভেজে গুঁড়া ক'রে, সেই গুঁড়া প্রত্যহ দু'তিন বার গালে ও জিহ্বায়–ক্ষত স্থানে মাখালে উক্ত ক্ষত নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

(উক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে তুঁত, হিরার কষ ও ফিটকিরি পরিমাণে একটু কম দিতে হয়। অন্যগুলো চারি আনা পরিমাণে ব্যবহার ক'রলে চ'লে)।

ঘ) নালি ঘা : নালি ঘা চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনীয়।

নিমপাতা + ঘি

ঘি দ্বারা নিম পাতা ভেজে সেই নিম পাতা পুরানো ক্ষত বা নালি ঘা-এ লাগালে তা আরোগ্য হয়।

মহাসমুদ্রের মূল

পুরানো নালি ক্ষত মহাসমুদ্রের মূল ঘষে লাগলে, ঘা ধীরে ধীরে পুরে ওঠে এবং শীঘ্র নিরাময় লাভ ক'রে।

হুঁকোর পানি + আপাং পাতা

হুঁকোর পানির সঙ্গে আপাং-এর পাতা বেঁটে পুরানো ক্ষতে প্রলেপ দিলে, ক্ষত দ্রুত আরোগ্য হয়। প্রলেপ প্রত্যহ দু'বার ক'রে নিরামর না হওয়া পর্যন্ত লাগানো আবশ্যক।

ঙ) পায়ের অঙ্গুলির মধ্যস্থ ঘা : সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাদার মধ্যে অতিরিক্ত চলাফেরা ও কাজ করার জন্য পায়ের আঙ্গুলি-সন্ধিতে যে ঘা হয়-তা নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

আঁচ পোড়া

শুকানো নারকেলের আঁচা বা মালা পুড়িয়ে কাঁসার থালায় একটু কাত ক'রে ঢেকে রাখলে এক প্রকার লাল তৈল নির্গত হয়। ঐ তেল প্রত্যহ রাতে শোবার আগে অঙ্গুলি-সন্ধির ঘায়ে উপর্যুপরি কয়েকদিন মাখলে ঘা আরোগ্য হয় এবং নতুন ঘা হয় না। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

তুষ-তেলা

তুষ পুড়িয়ে তেল বানিয়ে সেই তেল পায়ের অঙ্গুলি-সন্ধির ঘায়ে প্রয়োগ করলে, ঘা আরোগ্য হয়। পর পর কয়েকদিন রাতে উক্ত তেল ব্যবহার করা আবশ্যক। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

(তেল তৈরীর নিয়ম : হাঁড়িতে তুষ দিয়ে জ্বাল দিলে, যখন তুষ পুড়ে, ধোঁয়া বের হওয়া শুরু হয় তখন হাঁড়ির মধ্যে একটি কাঁসার বাটি বসিয়ে দিয়ে, হাঁড়ির উপর আর একটি পানি পূর্ণ মেটে পাত্র বসিয়ে, কাদা দিয়ে এমনভাবে মুখবন্ধ করা দরকার, যাতে হাঁড়ির ধোঁয়া বাইরে না বেরোয়। তারপর জ্বাল বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ রাখলে, বাটিতে যে লাল তরল পদার্থ জমে তাকেই 'তুষ-তেল' ব'লে।

চ) পোড়া ঘা : পুড়ে বা কেটে গেলে উক্ত নিম্নোক্ত প্রকার তেল তৈরী ক'রে মাখলে ঘা নিরাময় হয়।

তৈল পাক

খাঁটি সরিষার তেল আধসের জ্বাল দিয়ে টগবগ ক'রে ফুটিয়ে উক্ত তেলের মধ্যে দশ-পনেরোটা কেঁচো ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এরূপ জ্বালাতে জ্বালাতে তৈল এক পোয়া

থাকতে নামিয়ে সেঁকে পরিষ্কার শিশিতে ভরে রেখে সেই তেল প্রত্যহ দু'তিনবার ঘায়ে লাগাতে হবে।

এই তেল লাগালে 'নালি ঘা'ও আরোগ্য হয়।

৩২. **চক্ষুরোগ :** চক্ষু রোগ নানাপ্রকার। চোখে বাতাস' লেগে যন্ত্রণা হলে–চোখ লাল হয় ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে। কিন্তু বিশেষ পিঁচুটি জমে না। এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঔষধসমূহ ব্যবহার্য্য।

ঝাড়া/পানি পড়া

চোখে 'বাতাস লাগালে' কেউ কেউ 'কোলহু-সুরা' বা 'সুরা ইখলাস' পড়ে চোখে ফুঁ দিয়ে দেন এবং গ্লাসে পানি প'ড়ে দেন, তাতেই রোগ আরোগ্য হয়। পড়া পানি খেতে হয় এবং দু'চোখে তিন চারবার ঝাপ্টা দিতে হয়। চোখ ঝাড়তে হয় দু'তিন বার।

অপরাজিতার পাতার প্রলেপ

অপরাজিতা ফুলের পাতা বেঁটে কপালের দুপাশের রগে প্রলেপ দিলে চোখের জ্বালা ও চোখ দিয়ে পানি ঝরা নিবারণ হয়।

ক) চোখ উঠা : 'চক্ষু প্রদাহবা' চোখে পিঁচুটি জমা ও যন্ত্রণাকেই 'চোখ উঠা' ব'লে। এতে চক্ষু লাল হয় ও চোখে যন্ত্রণা হয়। চোখ রাত্রে জুড়ে যায় এবং চোখে পিঁচুটি জমে। এরূপ 'চোখ উঠা' নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

করবীর পাতার আঁঠা

চোখ উঠলে করবীর পাতার সামান্য আঁঠা চোখের কোণে দিলে 'চোখ ওঠা' নিরাময় হয়।

সরিষার তেল

চোখ ওঠার উপক্রম হলে, খাঁটি সরিষার তেল দুচোখে দুফোঁটা ঢেলে দিলে আর 'চোখ ওঠে' না কিংবা চোখে জ্বালা–যন্ত্রণা হয় না।

তেঁতুলের পাতার রস

চোখ–ওঠার উপক্রম হ'লে, কাঁচা তেঁতুলের পাতার রস চোখে দিলে, চোখ ওঠেনা (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)। (ঐ পাতা গাছ থেকে তুলে এনে পানিতে ধুয়ে হাতে ডলে রস বের ক'রে সেই রস এক দিনে দু'তিন বার চোখে দিতে হয়। তাতে ব্যথা সারে, পিঁচুটি পড়া বন্ধ হয়, চোখের লালিমাও দূর হয়।)

শিউলি-পাতার রস

শিউলি ফুলের পাতার রস দৈনিক দু'তিন বার, দু'তিন দিন চোখে দিলে, চোখ ওঠা নিরাময় হয়।

হাতি শুঁড়োর পাতার রস

হাতি শুঁড়ো গাছের পাতার রস দু'ফোঁটা ক'রে দৈনিক দু'তিন বার কয়েকদিন যাবৎ চোখে দিলে, চোখ ওঠা নিরাময় হয়। জ্বালা, ফোলা এবং ব্যথাও সারে।

আকন্দের আঁঠা

চোখ উঠলে' বা চোখ ওঠার' উপক্রম হলে, আকন্দের আঁঠা পায়ের নখগুলোর ওপর অতি ধীরে ধীরে মাখিয়ে দিলে আর চোখ ওঠে না কিংবা চোখ উঠে থাকলে, তা শীঘ্র নিরাময় হয়।

(খ) চোখে বাতাস লাগা : কখনো কখনো আকস্মিকভাবে চোখে যন্ত্রণা হয়। চোখ ফোলে কিংবা লাল হয়, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। চোখের মধ্যে করকর ক'রে এবং চোখে বালির কণা পড়েছে ব'লে মনে হয়। চোখে পিঁচুটি জন্মায়। দূষিত বাতাস চোখে লাগার ফলে অমনভাবে চোখ আক্রান্ত হয় ব'লে লোকে মনে ক'রে। এরকম চক্ষু-রোগ চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত মন্ত্র পড়ে চোখের মধ্যে কয়েকবার ফুঁ দিলেই এ রোগ আরোগ্য হয়। যেসব মন্ত্র একাজে ব্যবহার করা হয়-সেগুলোর মধ্যে আরবী 'ইসম-কালাম' ও বাংলা মন্ত্রও রয়েছে। নিম্নে এরূপ একটি বাংলা মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল।

আহা রে নদের কুল
এক বোটে পাঁচ ফুল
সারে যাও অমুকের চোখ শূল
কার আজ্ঞে—
মা কালীর আজ্ঞে
এই লংকা ছা'ড়ে যাইয়ে
অন্য লংকায় যাইয়ে পড়গে॥

এই মন্ত্র এক এক বার পড়ে আক্রান্ত চোখে এক এক ফুঁ দিতে হবে। কিন্তু তৃতীয় বার মন্ত্র পাঠ ক'রে এক সঙ্গে তিন ফুঁ দিয়ে রোগীকে বলতে হবে—বল "নেই"। রোগী বলবে "নেই"।

গ) চোখের ছানি : চোখের ছানি নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ফলপ্রদ।

মান কচুর শিকড়

মানকচুর চার-পাঁচ খানা শিকড়-একখানা, এক এক 'কর' পরিমিত লম্বা, কেটে-প্রতি খণ্ড শিকড় অতি ধীরে ধীরে চোখের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে টেনে নিয়ে, বাসি পানিতে আস্তে আস্তে টেনে টেনে ধুলে-চোখের ছানি উঠে যায়।

(শিকড় চোখে বা পানিতে জোরে জোরে টানলে চোখ নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে)

৩৩. **চর্ম রোগ :** 'চর্মরোগ' বলতে সাধারণত ঘা, চুলকানি, পাঁচড়া, ফোঁড়া ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে। ঐ সব রোগের ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ নির্দিষ্ট থাকলেও এখানে সাধারণ অর্থে 'চর্মরোগ'-এর কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করা হল।

ঘৃতকুমারীর শাঁস

প্রতিদিন সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ ঘৃতকুমারীর শাঁস সামান্য মধুসহ সেবন ক'রলে যাবতীয় চর্মরোগ নিরাময় হয়।

ঘৃতকুমারীর শাঁস + কাঁচা হলুদ + মধু

দৈনিক সকালে এক থেকে দেড় ঝিনুক ঘৃতকুমারীর শাঁস-কাঁচা হলুদের রস ও মধু কিছুদিন সেবন ক'রলে চর্মরোগ শীঘ্র নিরাময় হয়।

ঘৃতকুমারীর রস + গুঁড়া হলুদ

প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ঝিনুক ঘৃতকুমারীর শাঁস স্বল্প পরিমাণ হলুদের গুঁড়াসহ কিছুদিন যাবৎ সেবন ক'রলে চর্মরোগ দূর হয়।

দূর্বার রস + তিল তৈল

এক ছটাক দূর্বার রস ও এক পোয়া তিলের তেল এক সঙ্গে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে-সেই তেল সমস্ত শরীরে কয়েকদিন মালিশ করলে, সব রকম চর্মরোগ নিরাময় হয়।

৩৪. **চুলকানি :** চুলকানি বলতে সাধারণত চর্মের ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ বুঝায়। ঐসব উদ্ভেদ খুব চুলকায় এবং কখনও কখনও চুলকাবার পরে রস ঝরে-জ্বালা ক'রে। এ রকম চুলকানি নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বিত হয়।

কেরোসিনের প্রলেপ

চুলকানি নিবারণের জন্য কখনও কখনও আক্রান্ত অংগে কেরোসিন তেল প্রলিপ্ত করা হয়। তাতে চুলকানির উপশম হ'য়ে থাকে।

গরম ঝিকের সেঁক

কোন অজ্ঞাত কারণে পায়ের তালুতে চুলকালে এবং উক্ত স্থানে ফোস্কা দেখা দিলে, ঐ স্থান উনুনের গরম ঝিকের ওপর চেপে চেপে ধরে তাপ দিলে ফোস্কা-মধ্যস্থ পানি শোষিত হয় এবং চুলকানিও বন্ধ হয়। (পরীক্ষিত ও ফ্রদপ্রদ)।

মলম

সাংঘাতিক প্রকার চুলকানি আরোগ্যের জন্য-নারিকেল তেলের মধ্যে গন্ধক, কর্পূর, মোমছাল ও বেলে সিঁদুর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে গুঁড়া ক'রে-ক্রমে ক্রমে মিশিয়ে মলম তৈরী ক'রে সেই মলম ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রতিদিন দু'তিনবার উক্ত মলম চুলকানি আরোগ্য

না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার্য। পাঁচড়া জাতীয় ক্ষতেও এ মলম ব্যবহার করা চলে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)। এটি পচনশীল পাঁচড়ারও মহৌষধ।

চিরতার ক্বাথ

প্রতিদিন চিরতার 'ক্বাথ' মধুসহ সেবন ক'রলে শরীরের চুলকানি নিরাময় হয়।

নিমের পাতা সিদ্ধ করা পানিতে স্নান

নিমের পাতা সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি ঠাণ্ডা হবার পর, তা' দিয়ে প্রতিদিন স্নান ক'রলে চুলকানি আরোগ্য হয়।

কাঁচা হলুদ সহ নিমের কাঁচা পাতা বেঁটে সমস্ত শরীর প্রলিপ্ত ক'রে তিন-চার ঘন্টা পর, উপর্যুপরি কয়েকদিন স্নান ক'রলে চুলকানি-পাঁচড়ায় উপশম হয়।

গিমা শাকের ঘন্ট

গিমা শাকের ঘন্ট প্রত্যহ দু'তিন বার ক'রে কয়েকদিন ভাতের সঙ্গে খেলে শরীরের চুলকানি দূর হয়।

৩৫. **চোঁয়াল ফোলা :** 'চোঁয়াল ফোলা' বা 'মাম্পস' একটি সাংঘাতিক রোগ। এটি হ'লে, তা নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।

প্রলেপ

নাটার শাঁস, তামাক মাখানো ডালার বা বস্তার কাঁই, আধ কাঁচা সোমরালির বীচির কালো শাঁস ও হুঁকোর পানি এক সঙ্গে বেঁটে মলম তৈরী ক'রে সেই মলম, প্রত্যহ গরম ক'রে দু'তিনবার, কয়েকদিন লাগালে চোঁয়াল ফোলা রোগ নিরাময় হয়। এতে ব্যথা-বেদনাও দূর হ'য়ে থাকে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৩৬. **জণ্ডিস বা কামোল :** জণ্ডিস বা 'কামোল' রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মরচের পাতার রস

মরচের গাছের কাঁচা পাতা পিষে রস ক'রে, সেই রস দৈনিক দু'তিনবার ক'রে তিন-চার দিন **খাওয়ালে 'জণ্ডিস' বা 'কামোল' রোগ নিরাময় হয়।**

৩৭. **জ্বর :** জ্বর নানারকম। বৈচিত্র্য অনুযায়ী জ্বর-চিকিৎসারও নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মন্ত্র নাম, পানি পড়া, ঝেড়ে দেওয়া, পটি বাঁধা, পালা বাঁধা, বড়ি খাওয়া, পাচন খাওয়া প্রভৃতি নানা উপায়ে জ্বর চিকিৎসা হ'য়ে থাকে। নিম্নে সাধারণ জ্বর চিকিৎসার বিবিধ উপায় উল্লেখ করা হল।

মন্ত্র

ওরে ওরে জ্বরা অতিসার
বাড়ী বন গাঁ বিষ্টুপুর
মানিক দিয়েছেন তোমারে বর
ফলনার হাড় পচে মাংস পচে
চলে যা জ্বর অগ্নির তেজে।
চলে বা জ্বর বিস্ক্যার তেজে।
ওরে জ্বর যদি ওরে
ফলনার কম্প ক'রে
না যাস—
ভোর খোয়াজ খেজেরের মাথা খাস॥

এই মন্ত্রটি 'ফলনা'র স্থানে রোগীর নাম উচ্চারণ ক'রে চিকিৎসককে "পশ্চিম দিকে চিৎ হ'য়ে শুয়ে একুশ বার পড়তে" হয়-তা হলেই-উদ্দিষ্ট ব্যক্তির রোগ নিরাময় হয়।

নামের ঝাড়া বা ফুঁক

"শ্রীযুক্ত রামশরণ পাল, বেচু ঘোষ, শিশু রাম, শংকর, কানাই, নিতাই, হরি, পাঁচকড়ি, নিধিরাম, বড় রমানাথ দাস, অন্দিরাম, নিত্যানন্দ, নয়ান, লক্ষ্মীকান্ত, দেদো কৃষ্ণ, গোদা কৃষ্ণ, বিশুচান, কিনু, গোবিন, হটু ঘোষ, শ্যাম ও ভীম রায়।" এই বাইশ ফকীরের নাম তিনবার পড়ে রোগীর গায়ে হাই (ফুঁ) দিবে।"—তাহলে ঐ রোগীর জ্বর ও আনুষংগিক উপসর্গাদি দূরীভূত হবে।

(এই মন্ত্রটি একটি খাতায় পাওয়া। খাতাটি ১৩১৪ সালে 'কষ্টিভাঙ্গা' স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারকানাথ সরকারের লিখিত-কর্তাভজা-সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ। 'বাইশ ফকীর' কর্তাভজাদের বিশেষ মান্য এবং সেকারণে এটি তাদের একটি সাম্প্রদায়িক চিকিৎসা বিষয়ক মন্ত্র।)

কুড়চীর ক্বাথ + মধু

আধ ছটাক পরিমাণ কুড়রীর ক্বাথ, মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে, দুপুরে ও বৈকালে-তিনবার সেবন ক'রলে জ্বর আরোগ্য হয়।

কৈ উড়ার পাতা ও ভঙ্গরাজের পাতার রস

কৈ উড়ার পাতা ও ভৃঙ্গরাজ-এর পাতা এক সঙ্গে বেঁটে রস ক'রে প্রত্যহ দু'তিনবার খাওয়ালে 'নতুন জ্বর' আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চের রস

এক ঝিনুক পরিমাণ গুলঞ্চের রস কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রত্যহ দু'তিনবার খেলে নতুন 'ম্যালেরিয়া জ্বর' আরোগ্য হয়।

বেশীদিন খেলে এতে পুরাতন জ্বরেও উপকার হ'য়ে থাকে।

তুলসী পাতার রস

প্রত্যহ সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ সাদা তুলসী পাতার রস কয়েক দিন যাবৎ সেবল ক'রলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না।

নাটা গাছ + ভাঁটির আগা + বেল পাতা

নাটার ডগা, ভঁটির আগা, বেলগাছের জালি পাতা ও তুলসী পাতা একসঙ্গে বেঁটে রস ক'রে, সেই রসের মধ্যে গরম লাল টকটকে লোহা পুঁড়িয়ে সেঁক দিয়ে বা 'নোয়াড়' ক'রে, প্রত্যহ দু'তিনবার আধ থেকে এক ঝিনুক পরিমাণে কয়েকদিন খেলে, 'জাপকো জ্বর' আরোগ্য হয়।

বোরোই ফুল + মানকচুর ফুল

বোরোই ফুল ও মান কচুর ফুল পানি দিয়ে বেঁটে মাথায় পটি দিলে 'গরম লাগা' জ্বরে তালু ফোলা হ্রাস পায় ও জ্বর আরোগ্য হয়। একে 'তালু ফোলা জ্বর'ও ব'লে। সাধারণত শিশুদের-ই এরকম জ্বর হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

বাতাবি লেবুর রস

বাতাবি লেবুর গায়ে কাদা মাখিয়ে উনুনের মধ্যে দিয়ে পুড়িয়ে উক্ত লেবুর ছোবলার রস বড় চা চামচের এক চামচ খাওয়ালে ম্যালেরিয়া জ্বর নিরাময় হয়।

ক) পলা জ্বর : যেসব জ্বর একদিন পর একদিন বা দুদিন পর একদিন আসে, সেগুলোকে 'পালা জ্বর' ব'লে। গ্রামে 'পালা জ্বর' চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় :

আকান্দি লতার দিক পরিবর্তন

কারো 'পালা জ্বর' হ'লে তার নাম উচ্চারণ ক'রে—আকান্দি লতার পূর্বমুখী ডগা রোগীর নাম উচ্চারণ ক'রে শাস ধরে, পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দিলে ঐ ব্যক্তির জ্বর বন্ধ হয়। শনি-মঙ্গলবারে একাজ ক'রতে হয়।

আপাংগাছের শিকড় + লাল সুতা

'পালা জ্বর' নিবারণের জন্য আপাংগাছের শিকড় শনিবার বা মঙ্গলবারে শ্বাস বন্ধ ক'রে তুলে, সাত তার লাল সুতার দ্বারা পেঁচিয়ে কোমরে বেঁধে দিতে হয়। তাহলে, রোগীর রোগ নিরাময় হ'য়ে থাকে।

আকছটির চারা ভাঙানো

'পালা জ্বর' বন্ধ ক'রতে হলে, রবিবার-বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য যে কোনদিন ভোরে রোগীর নাম নিয়ে অফুলা আকছটির চারার মাথা নিচের দিকে বাঁকিয়ে খড়-কুটা দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। তাতে 'পালা জ্বর' বন্ধ হয়।

খ) টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর : 'ঠাণ্ডার পরে গরম' বা 'গরমের পর ঠাণ্ডা লেগে' শ্লেষ্মা প্রধান যে জ্বর হয় গ্রামে তাকেই 'সান্নিপাতিক' বা 'টাইফয়েড জ্বর' ব'লে। এ রকম জ্বর নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হ'য়ে থাকে।

কাঁটানটের পাতা সিদ্ধ পানি

এক মুঠো পরিমাণ কাঁটানটের শুকনো গাছ আধ সের পানিতে জ্বাল দিয়ে, আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ঐ পানি ঠাণ্ডা হবার পর ছেঁকে প্রত্যহ দু'তিনবার পান ক'রলে 'সান্নিপাতিক' বা 'টাইফয়েড জ্বর' নিবারণ হয়।

চিরতার ক্বাথ

চিরতার ক্বাথ' প্রস্তুত ক'রে, সেই 'ক্বাথ' প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে এক ঝিনুক পরিমাণে পান ক'রলে সান্নিপাতিক জ্বর নিরাময় হয়।

এই ক্বাথ কিছুদিন নিয়মিত সেবন ক'রলে 'পুরানো জ্বরে'ও উপকার হয়।

গ) পচা জ্বর : যে জ্বর অনেকদিন চলে, ঔষধপত্রে বিশেষ উপকার হয় না ; রোগী শয্যাশায়ী হয় না আবার সুস্থও থাকে না-এমন জ্বরকে 'পুরোনো জ্বর', 'পচা জ্বর' 'জীর্ণ জ্বর' প্রভৃতি ব'লে। এ রকম জ্বর নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।

পাচন

পচা বা পুরানো জ্বরের পাঁচন তৈরীর জন্য উলু খড়ের মূল এক সের, বেনা ঘাসের মূল এক সের, ক্ষেত্র পটপটি বা ক্ষেত পাগড়া এক পোয়া এবং বিরোট বেগুণের গাছ আধ সের এবং- আধ সের নিমের ছাল, আধ পোয়া ধনে, এক পোয়া পলতার পাতা, আধ সের বাঁশের কাঁচা শিকড়, এক পোয়া আমগুরুস বা গুলঞ্চ কুচিয়ে একত্র ক'রে একটি মেটে হাঁড়ি বা তামার পাত্রে দু' থেকে দশ ঘন্টা সিদ্ধ করা আবশ্যক। অতঃপর ঐ পানি ঘন ও গাঢ় হ'লে বোতলে

সেঁকে নিয়ে প্রত্যহ দু'তিন বার ক'রে জ্বর না সারা পর্যন্ত তিন-চার সপ্তাহ সেবন করা প্রয়োজন। এতে দুষ্ট প্রকৃতির পুরানো ও পচা জ্বর আরোগ্য হয়।

বড়ি

কল্পনাথের কাঁচা পাতা বেঁটে বড়ি তৈরী ক'রে, সেই বড়ি রোদে শুকিয়ে দু'তিন সপ্তাহব্যাপী প্রত্যহ একটি ক'রে বড়ি খেলে 'পচা জ্বর', 'পুরানো জ্বর' ও 'লিভার'-প্লীহা সংযুক্ত জ্বর' নিরাময় হয়।

বড়ি

কালোমেঘ বা কল্পনাথের আগা, নাটার কচি ডগা এবং সৈন্ধব লবণ এক সঙ্গে বেটে বড়ি তৈরী ক'রে-সেই বড়ি রোজ সকালে ও বৈকালে একটি ক'রে দু'থেকে তিন সপ্তাহ খেলে পচা, পুরাতন ও লিভার-প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়।

গুলেঞ্চের পাতা ভাজি

পুরানো ঘুষঘুষে জ্বর আরোগ্যর জন্য গুলঞ্চের পাতা শাকের ন্যায় ভেজে ভাতের সাথে প্রত্যহ দু'তিন বার মাখিয়ে খাওয়া আবশ্যক। জ্বর নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এরূপ খেতে হয়।

শিউলি পাতার রস

শিউলি ফুলের পাতার রস, লোহা পুড়িয়ে 'নোয়াড়' ক'রে কয়েক দিন খাওয়ালে পুরানো ম্যালেরিয়া জ্বর নিরাময় হয়।

নিমের ক্বাথ

এক ঝিনুক মাত্রায় প্রত্যহ দু'তিন বার নিমের ক্বাথ সেবন ক'রলে যাবতীয় পুরানো জ্বর আরোগ্য হয়।

ক্ষুৎকুসুৎতের গাছ

দৈনিক সকালে ক্ষুৎকুসুৎতের গাছের তিনটি আগা ও তিনটি আলোচাল এক সঙ্গে এক সপ্তাহ যাবৎ চিবিয়ে খাওয়া আবশ্যক। তারপর ঐ গাছের আগা ও সমপরিমাণ আদা এক সঙ্গে খাওয়া আবশ্যক-এক সপ্তাহ। পরবর্তী সপ্তাহে খেতে হবে ঐ গাছের আগা ও লবণ এক সঙ্গে চিবিয়ে। এমনিভাবে প্রতিদিন সকালে স্নানের পর বাসি পেটে একুশ দিন এই ঔষধ খেলে-মেয়েদের দুষ্ট প্রকৃতির 'পচা জ্বর' বা 'পুরানো জ্বর' নিরামস হয়।

ক্ষুৎকুসুৎতের গাছ + বাবলার পাতা

ক্ষুৎকুসুৎতের আট-নটি ডগা ও পাতা এবং প্রায় সমপরিমাণ বড় বাবলার পাতা এক সঙ্গে বেঁটে মাথায় পটি দিলে শিশুদের কঠিন রকমের জ্বরও নিরাময় হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

ঘ) জ্বর-জ্বালা : জ্বরের সঙ্গে শরীরে জ্বালা থাকে, উক্ত জ্বালা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

অশোকের ক্বাথ

জ্বর-সংযুক্ত শরীরের দাহ ও জ্বালা নিবারণের জন্য আশোকের ক্বাথ প্রত্যহ দু'তিন বার সেবন করা আবশ্যক। তাহলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ঙ) জ্বর-পিপাসা : জ্বরের সঙ্গে অতি বা অল্প পিপাসা থাকা সম্ভব। অল্প পিপাসায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করলেও চলে। কিন্তু অতিরিক্ত পিপাসা বন্ধ করা জরুরী হ'য়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার হ'য়ে থাকে।

অশোকের ছালের পানি

জ্বরে খুব পিপাসা থাকলে অশোকের ছাল ছেঁচে, পানিতে ভিজিয়ে রেখে, সেই পানি প্রত্যহ তিন-চার বার পান করালে পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

৩৮. **জোঁক লাগা :** জোঁক লাগলে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এজন্য জোঁক লাগার পর প্রতিশোধক চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। নিম্নে এরকম কয়েক প্রকার চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হ'ল।

চূণের প্রলেপ

জোঁক লাগলে ঐ স্থানে চূণের প্রলেপ দিলে ঘায়ের সৃষ্টি হয় না, বিষ নষ্ট হয় এবং চুলকানিও নিরাময় হয়।

মুখের থু থু

পায়ে চিনে জোঁক লাগলে ঐ স্থানে মুখের থু থু দিলে চিনে জোঁকের বিষ বিনষ্ট হয় এবং কোন ক্ষত উৎপন্ন হয় না।

হুঁকোর কাঁই + চূণ

বড় জোঁক যদি তীব্রভাবে দংশন ক'রে, তাহলে সেই স্থানে হুঁকোর কাঁই ও চূণ একসঙ্গে মিশ্রিত ক'রে মলম বানিয়ে, সেই মলম প্রত্যহ দু'তিন বার ক'রে কয়েকদিন লাগালে ক্ষত নিরাময় হয় এবং বিষ উঠে যায়।

৩৯. **জিয়ল মাছের কাঁটা :** জিয়ল মাছ ধরা বিপজ্জনক। ঐ মাছের মাথার দুপাশে যে দুটি কাঁটা থাকে তা বিষাক্ত। শরীরের যে কোন অংশে ঐ কাঁটা বিঁধলে নিরতিশয় যন্ত্রণা হয়। এ যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়।

পেঁয়াজের রস

জিয়ল মাছের কাঁটা হাতে বা পায়ে বিঁধলে ঐ স্থানে কাঁচা পেঁয়াজের রস লাগালে বেদনা দ্রুত নিরাময় হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

প্রস্রাব ব্যবহার

জিয়ল মাছের কাঁটা ফুটলে ঐ স্থানে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব লাগালে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৪০. **টীকা :** গো–বীজজাত টীকা দিলে অনেক সময় টীকার ঘা' সারতে চায় না, জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। এ ধরনের ক্ষত নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অলবম্বিত হয়।

প্রস্রাব ব্যবহার

টীকার দুষ্ট প্রকৃতির ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হ'লে ও রক্তবর্ণ ধারণ ক'রলে –রোগীর নিজের প্রস্রাব উক্ত ক্ষতে প্রত্যহ দু'তিনবার লাগালে কয়েক দিনের মধ্যে ক্ষত নিরাময় হয়, জ্বরাদিও থাকে না। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৪১. **ঠোঁঠ ফাটা :** জ্বর হ'লে কিংবা শীত পড়লে সাধারণত ঠোঁট ফেটে যায়। এরকম ঠোঁট ফাটা নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায় গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে।

দূর্বার শিশির

সকাল বেলায় দূর্বা ঘাসের ডগায় শিশির জমে থাকলে ঐ শিশির হাত মুখ ধোবার আগে আঙ্গুল দিয়ে তুলে এনে ঠোঁটে পর পর তিন–চার দিন সকালে মাখলে–ঠোঁট আর ফাটে না। এ ঔষধে বিশেষভাবে শীতকালীন ঠোঁট ফাটা নিরাময় হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

দুধের সর

পর পর কয়েকদিন রাতে দুধের সর ঠোঁটে মাখালে ঠোঁট ফাটা সেরে যায়।

৪২. **দাদ :** 'দাদ' আরোগ্যের জন্য গ্রামীণ জনসাধারণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন ক'রেন। ঐ গুলোর কিছু কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল।

তুলসী ও লেবুর পাতার রস

তুলসী পাতার রসের সাথে সমপরিমাণ লেবুর রস মিশিয়ে দাদে লাগালে দাদ সেরে যায়।

ক্ষুৎকুসুৎতের রস

শিশুদের মাথায় দাদ বা একজিমা হ'লে ক্ষুৎকুসুৎতের গাছের পাতার রস প্রয়োগ ক'রলে উক্ত ঘা নিরাময় হয়। এই রস প্রত্যহ দু'তিন বার ক'রে কয়েকদিন ব্যবহার করা আবশ্যক।

ক্ষুরে মাখানো তেল

শিশুদের মাথায় 'দাদ' হ'লে নাপিতের ক্ষুরে সরিষার তেল মাখিয়ে সেই তেল সারা মাথায় লাগালে দাদ আরোগ্য হয়।

চূণ+সোডার প্রলেপ

শামুকের চূণ ও কাপড় কাঁচা সোডা একত্রে মিশিয়ে দাদের উপর প্রলেপ দিলে ঐ স্থান পুড়ে গিয়ে ঘা হয়ে দাদ সেরে যায়।

৪৩. **দাঁতের পোকা :** দাঁত ক্ষয় ক'রে গভীর গর্তে পরিণত হওয়া, কালো হওয়া ও জ্বালাযন্ত্রণা করা, এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুগ্রাহ্য পোকার অত্যাচার ব'লে লোকে মনে ক'রে। লোক–চিকিৎসকগণ নানা উপায়ে ঐসব পোকা বের ক'রতে পারেন। নিম্নে এরূপ কতিপয় ঔষধের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

'জাব'

দাঁতের পোকা ফেলার জন্য সাতটি এক কোয়া রসুন বা সাত কোয়া রসুন ও মানকচুর ডেগোর পঁচানি এক সঙ্গে বেঁটে তার মধ্যে আপাং গাছের মূল কুচিয়ে কেটে মিশিয়ে কলার পাতার উপর বিছিয়ে দিয়ে রোগীর মুখ হাঁ করিয়ে চোঁয়ালের পাশে ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পোকা লাফিয়ে লাফিয়ে কলাপাতার উপর পড়তে থাকে। ঐ জাব শনিবার বা মঙ্গলবারে সকালে হাতে-পায়ে পানি না লাগিয়ে দেওয়া আবশ্যক। আপাং গাছের মূল, 'শ্বাস' বন্ধ ক'রে তুলতে হয়। 'জাব' পর পর দু'তিন সপ্তাহ–দু'তিন বার দেওয়া আবশ্যক।

৪৪. **দাঁতের যন্ত্রণা :** দাঁতের যন্ত্রণা একটি সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ রোগ। এ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। নিম্নে এরূপ কতিপয় চিকিৎসা–প্রণালীর বিবরণ দেওয়া হল।

আকন্দের কষ + লবণ

আকন্দের নরম ডগা ভাঙলে যে সাদা কষ নির্গত হয়, উক্ত কষ সামান্য লবণসহ বেদনাযুক্ত দাঁতের গোড়ায় লাগালে দাঁতের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। (পরীক্ষিত ওফলপ্রদ)।

(কিন্তু ঐ আঠা খুব সাবধানে লাগাতে হয়। মাড়ী বা অন্য স্থানে আঠা লাগলে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এজন্য এ ঔষধ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।)

কুলকুচা

আমের ছাল ও জামের ছাল এক সঙ্গে পানি দিয়ে জ্বালিয়ে সেই পানি গরম গরম কুলি ক'রলে দাঁতের জ্বালা নিবারণ হয়।

আমের ডাল

আমের ডালের আগার কচি অংশ ছেঁচে ল্যাম্পের শীর্ষে ধরলে যে 'ফেঁফড়া' বা 'কষ' বেরোয়, তা গরম গরম বেদনা যুক্ত দাঁতের গোড়ায় লাগালে ফোলা কমে ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

কচা গাছ

কচা, টাকি ভেন্না, বিলাতী কচা, বিলাতী ভেন্না বা নোনা কচা নামক গাছের আঁঠা-ডাল ভেঙে সদ্য সদ্য দাঁতে লাগালে দাঁতের ফোলা ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

কুলকুচা

ঐ গাছের শিকড়, কর্পূর, খয়ের, ভুঁতে, নারকেল ও সুপুরি এক সঙ্গে জ্বালিয়ে সেই পানি কুলি ক'রলে দাঁতের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পানি গরম গরম কয়েকবার কুলি করা আবশ্যক।

কুলকুচা

কচি ডাবের মুখের থকথকে সাদা অংশ দা দিয়ে কুচিয়ে পানিতে সিদ্ধ ক'রে, সেই পানি গরম গরম কুলি ক'রলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের জ্বালা নিবারণ হয় এবং ফোলা কমে। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৪৫. **ধাতু-দূর্বলতা :** 'ধাতু দূর্বলতা' বলতে সাধারণভাবে শারীরিক শক্তিহীনতা বোঝায়। রোগাক্রমণ, অতি মৈথুন, বৃদ্ধ বয়স, অতি পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে 'ধাতু দূর্বলতা' দেখা দিতে পারে। রোগাক্রমণ ব্যতীত অতি-মৈথুন কিংবা অতি পরিশ্রম জনিত কারণে বীর্য ক্ষয়, বীর্য হ্রাস বা শারীরিক শক্তিস্বল্পতা দেখা দিলে নিম্নোক্ত উপায়ে চিকিৎসা করা হয়।

অশথ

অশথ গাছের মূলের ছাল ও ডগা এক সঙ্গে বেঁটে সেই রস এক ঝিনুক পরিমাণ সামান্য মধূ ও মিশ্রীসহ প্রত্যেহ সকালে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে ধাতু-দূর্বলতা দূর হয়।

আলকুশী

প্রতিদিন সকালে আলকুশী বীজের শাঁস মাসকালাইয়ের সাথে বেঁটে সামান্য পরিমাণে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে ধাতুদূর্বলতা দূর হয়।

উলট কম্বল

উলট কম্বলের ডগা কুচিয়ে গ্লাসে রাতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি সকালে আখের চিনি দিয়ে খেলে ধাতু পুষ্ট হ'য়ে শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

কাঁটা কুমোরে লতা + ছাগলের দুধ

কাঁটা কুমোরে লতার লালাভ লকল'কে ডগা কুচিয়ে এক সের ছাগলের দুধের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে ঘন হবার পর নামিয়ে, ঐ বস্তু আঁখের চিনি ও ডিমের কুসুম মিশিয়ে প্রতিদিন একবার সকালে সপ্তাহকাল সেবনে ধাতু পুষ্ট হ'য় ও শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

কাঁটা কুমোরের লতার ডগা

কাঁটা কুমোরে লতার ডগার কচি অংশ প্রত্যহ সকালে এক মাস যাবৎ চিবিয়ে খেলে শুক্র-তারল্য দূর হ'য়ে শরীর সবল হয়। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় দু'বারও এ ঔষধ খাওয়া যায়। এক সঙ্গে ৫/৭টি ডগা চিবিয়ে খেতে হয়।

তুলসীর শিকড়

দৈনিক এক থেকে দু'কর পরিমিত তুলসী গাছের শিকড় পানের সঙ্গে চিবিয়ে খেলে ধাতু দুর্বলতা বা ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়।

ফরিদমুটির পাতা + আঁখের চিনি

ফরিদমুটির কয়েকটি পাতা পানিতে চটকালে যে দইয়ের মত জমাট দ্রব্য সৃষ্টি হয়, তা কয়েকদিন সকালে আঁখের চিনি মিশিয়ে খেলে ধাতু দুর্বলতা দূর হয়।

মধু-বেড়েলার ডগা + আঁখের চিনি

দৈনিক সকালে মধু-বেড়েলার সাতটি ক'রে ডগা আঁখের চিনিসহ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন ক'রলে ধাতু-দুর্বলতা বা শুক্রতারল্য দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

শিমুল গাছের মূল

কচি শিমুল গাছের নরম মূল কুচিয়ে পানিতে ভিজিয়ে আঁখের চিনি দিয়ে দৈনিক সকালে সাত দিন এক গ্লাস পরিমাণ পান ক'রলে ধাতু-পুষ্ট শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

শিলাজুত

শিলাজুত পানিতে ভিজিয়ে রেখে দৈনিক সকালে বাসি পেটে আঁখের চিনি মিশিয়ে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে ধাতু-দুর্বলতা দূর হয় ও শরীরে শক্তি বাড়ে।

৪৬. **নিউমোনিয়া :** গ্রাম্য লোকে নিউমোনিয়াকে বাতশ্লেষ্মা বা ঠাণ্ডার পর গরম লাগা অথবা গরমের পর ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বলে। এই জ্বর ও তার আনুষঙ্গিক উপসর্গ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

আকন্দের পাতার সেঁক

আকন্দের পাতায় খাঁটি সরিষার তেল মাখিয়ে ঈষৎ গরম ক'রে নিউমোনিয়াগ্রস্থ রোগীর বুকে সেঁক দিলে উপকার হয়।

৪৭. **পক্ষাঘাত :** পক্ষাঘাতকে গ্রাম্য ভাষায় অঙ্গ 'প'ড়ে যাওয়া' বা এক পাশ প'ড়ে যাওয়া (একাঙ্গীন পক্ষাঘাত) বলে। একে 'শুকোয় যাওয়া' ও বলা হয়। এ রোগ চিকিৎসার ঔষধ নিম্নরূপ—

দৈয়ে-খৈয়ে গাছের রস

দৈয়েখৈয়ে গাছের তিন-চারটি ডগা ও কাল কাসুন্দে গাছের আধ মুঠো কচি পাতা সামান্য লবণসহ বেঁটে রস তৈরি ক'রে, সেই রস অসাড় অঙ্গে প্রত্যহ দু'তিন বার করে এক থেকে তিন সপ্তাহ মালিশ ক'রলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৪৮. **পাঁকুই :** পায়ের পাতার উপরিভাগে ও গিঠায় উৎপন্ন এক ধরনের এক্সিমাকে পাঁকুই ঘা বলা হয়। এই ক্ষত অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, সহজে নিরাময় হয় না। পাঁকুই নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

কাঁটানটের রস + সরিষার তেল

কাঁটান'টে গাছের রস সমপরিমাণে সরিষার তেল মিশিয়ে পাঁচ ছ'দিন ক্ষতের উপর লাগালে পাঁকুই নিরাময় হয়।

৪৯. **পাঁচড়া :** বিশেষ ধরনের তীব্র চর্মরোগকে পাঁচড়া বলা হয়। উক্ত রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নরূপ ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

করবীর মূল + তিল তৈল

এক তোলা পরিমাণ করবীর মূল ভেজে এক ছটাক তিলের তেলের মধ্যে রেখে ঐ তেল সেঁকে পাঁচড়ায় দৈনিক দু'তিন বার ক'রে এক থেকে তিন সপ্তাহ লাগালে পাঁচড়া নিরাময় হয়।

রয়নার তেল

রয়নার তেল চুলকানি-পাঁচড়ায় কয়েকদিন নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে রোগ নিরাময় হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৫০. **পাথরী :** পাথরী দু'রকম। মূত্র পাথরী ও পিত্ত পাথরী। নিম্নে মূত্র-পাথরীর চিকিৎসা-পদ্ধতি উল্লেখ করা হ'ল।

পাথরী + দৈ

যে কোনো লোকের দেহ নির্গত পাথরী সদ্য পাতানো দৈয়ের সাথে ঘ'ষে তিন দিন সকালে তিন বার খেলে পাথরী বেরিয়ে যায়।

ঝিল + দুধ

পথের দশ-পনেরটি ঝিল কুড়িয়ে নিয়ে গরম খোলায় ভেজে লাল টকটকে ক'রে সেই ঝিল জ্বালানো দুধের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে কিছুক্ষণ পর সেঁকে উক্ত দুধ পান ক'রলে পাথরী নিরাময় হয়। এরূপ কয়েক দিন দুধ পান করা আবশ্যক।

৫১. **পিত্ত-প্রকোপ :** অনাহার, অসময়ে আহার, বিশেষত: সকালের খাবার অতি বিলম্বে খেলে পিত্ত প্রকুপিত হ'য়ে শরীরে নানা উপদ্রব সৃষ্টি হয়। তা দূর করার জন্য পিত্ত-প্রকোপ প্রশমনে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়।

লবণ

প্রতি ওয়াক্তে ভাত খাবার অন্যবহিত পূর্বে লবণ জিহ্বায় দিয়ে আহার্য গ্রহণ ক'রলে—পিত্ত প্রকোপ হয় না। এটি নিয়মিতভাবে সারা জীবন পালন করা আবশ্যক।

উচ্ছে সিদ্ধ

আহার গ্রহের সময় প্রথম উচ্ছে সিদ্ধ নিয়মিত খেলে পিত্ত প্রকোপ হয় না।

কালকাসুন্দার রস + মধু

প্রতিদিন সকালে কালকাসুন্দার রস এক তোলা পরিমাণে কিছু মধুর সঙ্গে মেড়ে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে পিত্ত প্রকোপ প্রশমিত হয়।

চাউল পোড়া পানি

এক থেকে দু'ছটাক ঢেঁকি ছাটা চাউল পুড়িয়ে রাতে গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি সকালে বাসি পেটে দু'তিন দিন সেবন ক'রলে পিত্ত প্রকোপ দূর হয়।

নিমের পাতা ভাজি

নিমের পাতা ভেজে পর পর দু'তিন দিন খেলে পিত্ত দোষ দূর হয় এবং প্রকুপিত পিত্ত শান্ত হয়।

৫২. **পিপাসা নিবারণ :** বিশেষ বিশেষ রোগাবস্থায় পিপাসার অবিদ্যমানতা কিংবা প্রাবল্য দেখা দেয়। অতি-পিপাসা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

কুরচীর ক্কাথ + মধু

কাশিসহ পিপাসার আধিক্য দেখা দিলে কুরচীর ক্কাথ মধুসহ সেবন ক'রলে পিপাসা নিবারণ হয়।

মুথার ক্কাথ

জ্বরসহ অতিশয় পিপাসা দেখা দিলে মুথার ক্কাথ সেবন ক'রলে পিপাসা দূর হয়।

ডাবের পানি

অতিশয় পিপাসা দেখা দিলে ডাবের পানি খাওয়ানো হয় যাতে পিপাসা নিবৃত্তি হয়।

৫৩. **পেটের পীড়া :** পেটের পীড়া তথা পেট নামা, পেট কামড়ানি বা পেটে বেদনা নানা কারণে হ'তে পারে। সে সবের মধ্যে ক্রিমিজনিত পেট কামড়ানি আরোগ্যের নিমিত্ত নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বিত হয়।

আকন্দের পাতার সেঁক

আকন্দের পাতায় তেল মেখে, সেই তৈলাক্ত দিক আগুনে গরম ক'রে পেটে সেঁক দিলে কামড়ানির উপশম হয়।

কলা গাছের ডগার রস

দয়া কলা গাছের ডগা আগুনে সেঁকে মুচড়িয়ে রস বের ক'রে আধ থেকে এক ঝিনুক মাত্রায় খাওয়ালে 'পেট কামড়ানি' নিরাময় হয়।

বড়ি

আমলকির ছাল, বয়ড়ার ছাল, হরিতকীর ছাল সমপরিমাণ নিয়ে, তার সঙ্গে কিছুটা সৈন্ধব লবণসহ আধ পোয়া মিশ্রীর গুঁড়া মিশিয়ে মাঝারি গরম বোরোই পরিমাণ বড়ি বানিয়ে, উক্ত বড়ি দৈনিক তিন বার আহারের পর একটি ক'রে দুই থেকে চার সপ্তাহ সেবন ক'রলে পেটের পীড়া দূর হয়।

সঁড়ার পাতা + আলো চাল + জামের পাতা

সঁড়ার পাতা, আলো (আতপ) চাল ও জামের পাতা—পানি দিয়ে একত্রে ছ'টকে ছেঁড়ে সেই পানি রোগীকে খাওয়ালে 'পেটের পীড়া' বা পেটনামা' আরোগ্য হয়।

৫৪. **পোকামাকড়ের কামড় :** নানারকম পোকা–মাকড়ে অনেক সময়ে কামড়ায়, হুল ফুঁটায় কিংবা কাঁটা বেঁধায়। তার ফলে আক্রান্ত স্থানে যন্ত্রণা হয়, ফোলে কিংবা বিষ–র্জজরিত হয়। এরূপ আকস্মিক বিপদ–পাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ক. বিছা লাগলে উক্ত স্থানে ধুপের ধোঁয়া দিয়ে পরে আকন্দের আঁঠা লাগালে জ্বালা–যন্ত্রণা দূর হয়।

চুনের প্রলেপ

বিছা লাগলে, বিছার কাঁটা ফেলে দিয়ে, কাঁচি দিয়ে আঁচড়িয়ে, উক্ত স্থানে শামুকের চুনের ঘন প্রলেপ লাগালে চুলকানি ও ফোলা নিরাময় হয়।

খ. বিচ্ছুতে দংশন ক'রলে গোয়ালে লতার পাতার রস বার বার আক্রান্ত স্থানে লাগালে বিষ বিনষ্ট হয় ও জ্বালা–যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

গ. বোলতায় দংশন ক'রলে (হুল ফুটালে) আক্রান্ত স্থানে তুলসী পাতার রস লাগালে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ঘ. ভীমরুলে 'দংশন' ক'রলে (হুল ফুটালেও) তুলসীর পাতার রস লাগালে উপকার হ'য়ে থাকে।

ঙ. মাজালীতে 'দংশন' ক'রলে (চিমটায়) সাধারণ বুনো কচুর ডগার মধ্যস্থ রস বের ক'রে, আক্রান্ত স্থানে লাগালে জ্বালা–যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

চ. ডেয়োতে 'দংশন) ক'রলে (চিমটায়) সঙ্গে সঙ্গে থু থু দিলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ছ. মৌমাছিতে 'দংশন' ক'রলে (হুল ফুটালে) আক্রান্ত স্থান থেকে হুলটি তুলে ফেলে মধু লাগালে জ্বালা–যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৫৫. **প্লীহার বিবৃদ্ধি :** শিশুদের নানা কারণে প্লীহার বিবৃদ্ধি ঘটে। এতে শিশুর জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। উক্ত রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

মন্ত্র–১

বাণে বাণে আটাআটি
এই বাণে কলা কাটি
কলার নীচে গিলা রয়
রাম বাণে প্রাণ লয়।

(মন্ত্রটি খাতায় প্রাপ্ত। খাতায় ব্যবহার–বিধি লেখা নেই।)

মন্ত্র-২

আহারে বিজা'তে পিলেই
এই বার যাও ঘরে
রামের হাতের বাণে পিলেই
যাবে ছারে খারে।
কার আজ্ঞে, রামের আজ্ঞে
শীগ্গীর যাইয়ে ক'লজেয় লাগ্গে।।

মন্ত্র-৩

নামের পিলেই চামের বাণ
পিলেইর হ'ল সাত বাণ
বাণ ফেলে মারলাম পিলেইর গায়
সমুদ্দুর ছা'ড়ে পিলেই
বাম কোহে যাও।।

শিশুদের প্লীহা বৃদ্ধি পেলে রাতে ঘুটের ছাই এনে শিশুটির শিরোদেশে রাখতে হয়। তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতে-পায়ে পানি না লাগিয়ে, মুখ-হাত না ধুইয়ে, বাসি বিছানায় ব'সে ঐ মন্ত্র প'ড়ে, ঐ ছাই হাতে মাখিয়ে শিশুটির প্লীহাকে উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে সাত বার ঝাড়তে হয়। এরকম তিন দিন ঝাড়লে প্লীহা ক'মে যায় এবং শিশু সুস্থ হয়।

গরুর চোনা

গরুর সদ্য ত্যক্ত চোনা (মূত্র) প্রতিদিন একবার ক'রে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে প্লীহার বিবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য হয়।

৫৬. **প্রদর** : প্রদর মূলত: দু'রকম—শ্বেত প্রদর ও রক্ত-প্রদর। এ রোগ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য। লোকবৈদ্যগণ আলোচ্য রোগ-চিকিৎসার নানা উপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন। নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

আকছটির শিকড়ের রস + ডাব

পুরাতন আকছটির শিকড়ের রস আধ ঝিনুক তিনটা ডাবের মধ্যে সমান তিন ভাগ ক'রে ঢেলে দিয়ে স্নানের পর ঘাটে দাঁড়িয়ে একটা, মাঝ পথে এসে একটা ও বাড়ীতে এসে একটা খেলে রক্তপ্রদর বা 'রক্তধাতু ভাঙা' রোগ নিরাময় হয়।

আমলকীর বীজ + মিশ্রী

আমলকীর বীজ গুঁড়ো ক'রে তার সাথে মিছরী মিশিয়ে দৈনিক তিন-চার বার ক'রে কয়েক দিন সেবন ক'রলে স্ত্রীলোকের শ্বেত-প্রদর, নিরাময় হয়।

উলট কম্বল + গোল মরিচ

উলট কম্বলের মূলের সঙ্গে তিনটা গোল মরিচ বেঁটে তিনটা বড়ি তৈরি ক'রে ঋতু চলাকালীন প্রতিদিন সকালে বাসি পেটে একটা ক'রে বড়ি সেবন ক'রলে স্ত্রীলোকের প্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

কাঁটা ন'টের শিকড় + আতপ চাউল

আতপ চালের পানি দিয়ে সিকি তোলা পরিমাণ কাঁটা ন'টের শিকড় বেঁটে এক ঝিনুক পরিমাণ প্রত্যহ সকালে খেলে শ্বেত প্রদর আরোগ্য হয়। এক থেকে তিন সপ্তাহ এ ঔষধ সেবন করা আবশ্যক।

গাবের রস + আবির

গাবের রস ও আবির মেড়ে ছায়ায় শুকিয়ে মটর পরিমাণ বড়ি বানিয়ে কচার বা জিয়ল গাছের ছালের রস কিংবা উলট কম্বলের রস দিয়ে মেড়ে তিন দিন পর পর তিনটি বড়ি খেলে শ্বেতপ্রদর নিরাময় হয়। রক্ত-প্রদর নিরাময়ের জন্য ঐ ঔষধ (বড়ি) দুর্বাঘাসের রসসহ তিন দিন পর সেব্য।

মষুম ডালির গাছ + আদা + গোল মরিচ

মষুম ডালির গাছের শিকড়ের ছাল দু'তোলা, আদা সিকি তোলা, পুরানো গুড় দু'তোলা ও একুশটা গোল মরিচ এক সঙ্গে বেঁটে একুশটা বড়ি তৈরি ক'রে প্রতি রাতে একটি ক'রে বড়ি ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন ক'রলে 'শ্বেত প্রদর' নিরাময় হয়।

সৈন্ধব লবণ + ঘি

সৈন্ধব লবণের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে আগুনের তাপে গরম ক'রে আধ ঝিনুক মাত্রায় প্রত্যহ একবার ক'রে পর পর সাত দিন খেলে শ্বেত ও রক্ত প্রদর আরোগ্য হয়।

শ্বেত আকন্দ + গোল মরিচ

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ও আড়াইটি গোল মরিচ বেঁটে কুঁচ পরিমাণ বড়ি বানিয়ে পর পর তিন দিন তিনটা বড়ি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বাসি পেটে খেলে শ্বেত প্রদর নিরাময় হয়।

বুনো গমের পাতার রস + ছাগলের দুধ

বুনো গমের পাতার রস আধ ঝিনুক সমপরিমাণ ছাগলের দুধসহ তিন থেকে সাত দিন সকালে একবার ক'রে সেবন ক'রলে মেয়েদের এক বিশেষ প্রকার 'শ্বেত প্রদর' যাকে গ্রামে 'তাঁতরানো ধাতু ভাঙা' ব'লে, তা আরোগ্য হয়।

৫৭. **প্রমেহ :** প্রমেহ রোগকে 'প্রস্রাবের দোষ', ধ্বজভঙ্গ, 'ধাতু রোগ', 'ধাতু ভাঙা' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এ রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে।

'প্রমেহ রোগ' নিবারণের জন্য গ্রাম্য পীর-ফকীর, ওঝা-বৈদ্যগণ পানি প'ড়ে দিয়ে থাকেন। উক্ত পানি পড়বার জন্য একটি নতুন হাঁড়িতে শনিবার বা মঙ্গলবার সূর্য উঠার আগে নদীর ঘাট থেকে উজানী-ভেঁটোনি পানি একটি নতুন মেটে পাত্রে আনতে হয়। ঐ পানি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেলে তিনি মন্ত্রপূত ক'রে দেন। তারপর তা সাত দিন, একুশ দিন বা একচল্লিশ দিন খেতে হয়। তাতেই প্রমেহ রোগ বা 'ধাতুক্ষয়' বন্ধ হ'য়ে যায়। একটি খাতায় প্রাপ্ত এরূপ কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

১

বিচমোল্যা এর্কে
বিচমোল্যা সের্কে
বিচমোল্যা ধা
বিচমোল্যার জোরেতে
ফলনার রোগ বিয়াধি যা॥

(মন্ত্রটির ব্যবহার-বিধি লেখা নেই।)

২

বিচ্মোল্যা রাহিউল্যা
বিচমোল্যা নয়
জল্লি জালাল এছেমের বরেতে
ফলনার রোগ-বিয়াধি নিক্ষয়॥

এই মন্ত্র এক হাজার এক বার প'ড়ে পানিতে ফুঁদিয়ে সেই পানি মন্ত্রপুত করার পর, তা পান ক'রলে, প্রমেহ রোগ নিরাময় হয়। (কিন্তু কত দিন এ পানি খেতে হবে তা খাতায় লেখা নেই।)

৩

ইন্দির নালে আসে ধাত
ব্রহ্মানালে ক্ষয়
যে নালে আসে ধাত
ঐ নালে মিলয়।
অমুকের তন কাঁচা মন কাঁচা
কাঁচা যমুনার কুল
আকাশের চন্দ্র সূর্য দুই কাঁচা
কাঁচা আমার

আল্লা–মোহাম্মদের নূর॥
অমুকের ধাতির ব্যারাম
শীঘ্র সার
দোহাই আমার আল্লার
দোহাই আমার আল্লার
দোহাই আমার আল্লার॥

এই মন্ত্র তিন বার প'ড়ে তিন ফুঁ ক'রে মোট ন'টি ফুঁয়ে পানি প'ড়ে দিয়ে রোগীর নিকট থেকে এক টাকা নিয়ে দান ক'রবে। (পানি ক'দিন খেতে হবে সে সম্পর্কে খাতায় কিছু লেখা নেই।)

অনন্তমূলের ক্কাথ

এক পোয়া অনন্তমূল এক সের পানিতে সিদ্ধ ক'রে এক পোয়া থাকতে নামিয়ে, সেঁকে, ঐ পানি দৈনিক এক ঝিনুক/চামচ পরিমাণ পান ক'রলে 'প্রস্রাবের দোষ' বা 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

অর্জুনের ক্কাথ

অর্জুনের কাঁচা ছাল এক ছটাক, এক পোয়া পানিতে সিদ্ধ ক'রে, এক ছটাক থাকতে নামিয়ে সেঁকে দৈনিক সকালে সপ্তাহকাল সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ

দৈনিক সকালে অশ্বগন্ধা চূর্ণ সিকি তোলা পরিমাণ ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ + দুধ + চিনি

প্রত্যহ রাতে এক সপ্তাহকাল অশ্বগন্ধা চূর্ণ সিকি তোলা, কাঁচা দুধ ও চিনিসহ সেবন ক'রলে প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

আমলকী

দৈনিক সকালে দু'একটা ক'রে কাঁচা আমলকী চিবিয়ে দু'তিন সপ্তাহ খেলে 'প্রমেহ রোগে' বিশেষ উপকার হয়।

উলট কম্বলের ছাল চূর্ণ

উলট কম্বলের শিকড়ের ছাল গুঁড়া ক'রে, এক পোয়া কাঁচা দুধ এবং দু'টি পাকা কলা, এক সঙ্গে চটকিয়ে তিন দিন খেলে 'ধাতু দোষ' বা 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

কলমী শাকের রস

প্রতিদিন সকালে এক ঝিনুক কলমী পাতার রস আধ পোয়া ছাগলের দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়। এ ঔষধ এক থেকে তিন সপ্তাহ খাওয়া আবশ্যক।

কলার মোচার ফুলের রস

কলার মোচার ফুলের রস দৈনিক সকালে ও বিকালে দু'বার এক ঝিনুক পরিমাণে সপ্তাহকাল পান ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

কাঁপাস পাতার রস + দুধ

এক ঝিনুক কাঁপাসের পাতার রস আধ পোয়া কাঁচা দুধের সাথে কিছুদিন নিয়মিতভাবে দৈনিক সকালে বাসি পেটে সেবন ক'রলে প্রস্রাব সরল হয় 'প্রমেহ রোগে'র উপশম ঘটে।

কেশুখে ও গাঁদা ফুলের রস + মধু

এক বা আধ ঝিনুক পরিমাণ কেশুখের রস, সমপরিমাণ গাঁদা ফুলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে দু'বার ক'রে কিছুদিন সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

গাবের ক্কাথ + আখেঁর চিনি

পাকা গাব সিদ্ধ ক'রে ক্কাথ প্রস্তুত করার পর ঐ ক্কাথ আঁখের চিনিসহ এক ঝিনুক পরিমাণ প্রতিদিন সকালে সেবন ক'রলে সপ্তাহকাল মধ্যেই প্রমেহ রোগ নিরাময় হয়।

গুলঞ্চের রস + মধু

প্রতিদিন সকালে গুলঞ্চের রস, আট-দশ ফোঁটা মধুসহ মেড়ে সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' আরোগ্য হয়। এ ঔষধ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেব্য।

গোয়ালে ও গাঁদা পাতার রস + মধু

এক ঝিনুক পরিমাণ গোয়ালে লতা-গাছের মূলের রস দ্বিগুণ পরিমাণ গাঁদা ফুল গাছের পাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে সামান্য মধুসহ দৈনিক সকালে ও বিকালে দুবার ক'রে দু'তিন সপ্তাহ সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরামঁয় হয়।

জামের আঁটি + মধু

জামের আঁটি গুঁড়ো ক'রে মধুর সঙ্গে মেড়ে পর পর তিন দিন সকালে সেবন ক'রলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

তেলাকুচার শিকড়ের রস + কাঁচা দুধ

তেলাকুচার শিকড়ের রস ও ছাগল বা গরুর কাঁচা দুধ এক সঙ্গে মিশিয়ে দৈনিক সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ সপ্তাহকাল খেলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

বেড়েলার মূলের রস + মধু

বেড়েলা গাছের মূলের রস ও মধু একত্রে মেড়ে দৈনিক সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ এক সপ্তাহ যাবৎ খেলে প্রমেহ রোগ দুর হয়।

ত্রিফলা + আঁখের চিনি

ত্রিফলা বা 'আমলকী, বয়ড়া ও হরিতকী' ভিজিয়ে আঁখের চিনি দিয়ে কয়েক দিন খেলে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এ ঔষধ মাসাধিক কালও নিয়মিত খাওয়া যায়।

ডাব + কলমির ডগার রস + আঁখের চিনি

একটি ডাবের মধ্যে সাতটি কলমির ডগার রস ও আধা তোলা আঁখের চিনি মিশিয়ে ডাবটি ভাল ভাবে ঝাঁকি দিয়ে পর পর তিন দিন তিনটে খেলে 'প্রমেহ' বা 'ধাতু দোষ' নিরাময় হয়।

হাঁসের ডিম + আঁখের চিনি

প্রত্যহ একটি হাঁসের ডিমের কুসুম আঁখের চিনিসহ চ'টকে পর পর সাত দিন সাতটা আহার ক'রলে ধাতু দোষ বা 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়।

বিলেই আঁচড়ার পাতার রস + আদা

বিলেই আঁচড়ার পাতার শির ছাড়িয়ে তার সঙ্গে এক কর আদা, পান্তা ভাতের পানি ও আঁখের চিনি এক সঙ্গে সাত দিন সকালে পর পর খেলে 'প্রমেহ রোগ' আরোগ্য হয়।

পিঁয়াজ + মধু

দেশী বড় পিঁযাজ চাকা চাকা ক'রে কেটে মধুর মধ্যে ভিজিয়ে ঐ পিঁয়াজ প্রতিদিন সকালে বাসি পেটে চিবিয়ে খেলে 'প্রমেহ রোগ' নিরাময় হয়। উল্লেখযোগ্য যে, একটি বড় পেঁয়াজ সাত খানা ক'রে কেটে প্রতিদিন তার একখানা উক্ত রূপ খাওয়া আবশ্যক।

৫৮. **প্রস্রাব বন্ধ :** নানা কারণে প্রস্রাব বন্ধ হওয়া সম্ভব। সাধারণত: রোগ ভোগের চরম পর্যায়ে যাদের প্রস্রাব বন্ধ হয়, তাদের প্রস্রাব খোলাসা করার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

আমলকী + ছ্যাঁদলা

আমলকীর সঙ্গে পানির মেটে কলসীর তলদেশে জমা ছ্যাঁদলা বেঁটে ঐ বস্তু দ্বারা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া রোগীর নাভির চারি পাশে প্রলেপ দিলে শীঘ্র প্রস্রাব নিঃসরণ হয়।

কাদার ভারা

নাভির চার পাশে ও উপরে পচা কাদার 'ভারা' দিলে প্রস্রাব বন্ধ হওয়া রোগীর প্রস্রাব নিঃসরণ হয়। (সর্বক্ষেত্রেই এ 'ঔষধ' কার্যকর নয়।)

গাঁদা ফুলের পাতার ভারা

কারো প্রস্রাব বন্ধ হ'য়ে তল পেট ফেঁপে উঠলে তেলাপোকার পেট ও নাড়ী-ভুঁড়ি এবং গাঁদা ফুল গাছের পাতা এক সঙ্গে বেঁটে নাভির চারপাশে ভারা দিলে শীঘ্র প্রস্রাব হয়।

টোপা শ্যাওলার 'ভারা'

টোপা শ্যাওলা, নীল ও মেটে ঘড়ার নিচেকার ছ্যাদলা এক সঙ্গে বেঁটে নাভিতে 'ভারা' দিলে প্রস্রাব নিঃসরণে সহায়ক হয়।

৫৯. **ফিট :** ফিট বা মূর্ছা লাগার নানা কারণ থাকতে পারে। মূর্ছিত রোগীকে সজ্ঞান ক'রে তোলার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বিত হয়।

কাঁটা কুমোরে গাছ

কার্তিকী অমাবস্যায় কাঁটা কুমোরে গাছ শ্বাস বন্ধ ক'রে তুলে রেখে ঐ গাছের এক কর পরিমাণ কেটে ফির হ'য়ে পড়া রোগীর গলায় বেঁধে দিলে ফিট বন্ধ হয় এবং রোগী সুস্থ হ'য়ে ওঠে।

মানকচুর শিকড়

মানকচুর শিকড় পূর্ব দিকের শিকড় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে তুলে এনে মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর কানের মধ্যে দু'তিন বার ঘুরালে ফিট বন্ধ হয় এবং রোগী সুস্থ হয়।

হলুদ পোড়া

শুকনো আস্ত হলুদে আগুন লাগিয়ে পুড়ালে যে ধোঁয়া উঠতে থাকে, ঐ ধোঁয়া ফিটের রোগীর নাকের কাছে ধ'রলে তার জ্ঞান ফিরে আসে ও সে সুস্থ হয় (পরীক্ষিত ও ফল প্রদ)।

৬০. **ফোলা :** সাধারণ ফোলা ও বেদনা এবং শোথ রোগীর ফোলা ও অন্যান্য উপসর্গ এক নয়। নিম্নে সচরাচর সাময়িক ফোলা ও ব্যাথায় ব্যবহৃত চিকিৎসার উপায় বর্ণনা করা হ'ল।

কার্পাস পাতা + সরিষায় তেল

কার্পাসের পাতায় সরিষার তেল লাগিয়ে গরম ক'রে যে কোনো ফোলা ও ব্যাথাযুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ বেঁধে রাখলে উপকার হয়।

কুকুশিমা পাতার সেঁক

শরীরের যে কোন স্থানে সাধারণ ফোলায় কুকুশিমা পাতা গরম ক'রে সেই 'জাব' বাতাক্রান্ত ফোলা জায়গায় বেঁধে রাখলে, ফোলা ব্যথা ও অসাড়তা দূর হয়।

'জাব'

লবণ, হুঁকোর পানি দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরি ক'রে সেই 'জাব' বাতাক্রান্ত ফোলা জায়গায় বেঁধে রাখলে ফোলা, ব্যথা ও অসাড়তা দূর হয়।

ধুতুরা পাতার রস

যে কোন রকম ফোলা ও ব্যথায় ধুতুরা পাতার রস দিলে উপকার হয়।

মহাসমুদ্রের গাছের শিকড়

মহাসমুদ্রের গাছের পূর্ব দিকের শিকড় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে তুলে এনে পায়ে বেঁধে দিলে পা ফোলা রোগীর রোগ নিরাময় হয়।

৬১. **ফোঁড়া :** ফোঁড়া নানা রকমের হতে পারে, ফোঁড়া হওয়ার কারণও অনেক রকম থাকা সম্ভব। ফোঁড়া চিকিৎসার জন্য যে-সব ঔষধ সচরাচর ব্যবহার করা হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপ।

অশত্থের পাতা

ফোঁড়া ওঠার উপক্রম হ'লে আশত্থের পাতা ঐ স্থানে বেঁধে রাখলে ফোঁড়া ব'সে যায়, ওঠে না।

আপাংয়ের পাতা + আতপ চাল

আপাংয়ের পাতা ও আতপ চাল এক সঙ্গে বেঁটে ফোঁড়ার মুখ ব্যতীত তার চার পাশে প্রলেপ দিলে, সহজে ফোঁড়া পেকে ফেঁটে পুঁজ বেরিয়ে ক্ষত নিরাময় হয়।

রেড়ীর বীজের শাঁস + দুধ

রেড়ীর বীজের শাঁস দুধের সঙ্গে বেঁটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেকে ফেঁটে যায় ও নিরাময় হয়।

কাঁটা ন'টের বীজের প্রলেপ

কাঁটা ন'টের বীজ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেঁটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেকে সত্বর ফেটে দিয়ে আরোগ্য হয়।

করবী মূলের প্রলেপ

করবী গাছের মূল, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেঁটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া সহজে পেকে ফেটে গিয়ে আরোগ্য হয়।

কাঁটা ন'টের শিকড়ের 'জাব'

কাঁটা ন'টের শিকড় গরুর দুধ দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরি ক'রে ফোঁড়ায় লাগালে, ফোঁড়া সহজে পেকে গিয়ে আরোগ্য হয়।

ঘৃতকুমারীর শাঁস

ফোঁড়ার ওপর ঘৃতকুমারীর শাঁস লাগালে ব্যথা ও টাটানি-যন্ত্রণা দূর হয়।

ধুতুরার পাতার রস + ঘি

ধুতুরার পাতার রস ও সামান্য ঘি মিশিয়ে ফোঁড়ায় লাগালে, ফোঁড়া শীঘ্র পেকে গিয়ে নিরাময় হয়।

নিমের পাতার প্রলেপ

নিমের পাতা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেঁটে ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে, ফোঁড়া সহজে পেকে ও ফেটে শীঘ্র নিরাময় হয়।

বেড়েলার শিকড়ের 'জাব'

বেড়েলার শিকড়ের ছাল বেঁটে ফোঁড়ায় 'জাব' লাগালে, উক্ত ফোঁড়া শীঘ্র পেকে গিয়ে নিরাময় হয় এবং জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়।

হরিতকী + শ্বেত চন্দন

হরিতকী ও শ্বেত চন্দন মাটির পাত্রে সামান্য পানির সঙ্গে ঘ'ষে সেই 'কাদা' ফোঁড়া বা যে কোনো ব্রণের ওপর লাগালে ফোঁড়া বা ব্রণ শীঘ্র পেকে নিরাময় হয়।

৬২. **বমন :** 'বমন' নানা কারণে দেখা দেওয়া সম্ভব। কৃমি, পিত্ত–প্রকোপ কিংবা অন্য কোন কারণে বমনের উদ্রেক হয়। নিম্নে বমন–নিরাময়কারী কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

কুকুশিমা বা কুকুর শোঁকা গাছের পাতার রস

এক চামচ পরিমাণ কুকুর শোঁকা গাছের পাতার রস কিছুদিন যাবৎ সেবন ক'রলে পৈত্তিক বমন নিরাময় হয় এবং পিত্ত–দোষ দূর হয়।

হরিতকীর গুঁড়া + মধু

হরিতকীর গুঁড়া ও মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকবার লেহন ক'রলে বমন নিবারণ হয়।

৬৩. **বমি ও বমিভাব :** বমি–বমি ভাব যদিও তেমন মারাত্বক কোন রোগ নয়, তথাপি তা যথেষ্ট অস্বস্তিকর কারণ হয়। এ অবস্থা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কাগজি লেবু

কাগজি লেবু হাতে ড'লে শুঁকলে বমি বমি ভাব দূর হয় (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

কাগজি লেবুর পাতা

কাগজি লেবুর পাতাও হাতে ড'লে শুকলে বমি বমি ভাব দূর হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

দূর্বার রস + চিনি

গা–বমি বা বমি বমি ভাব নিবারণের জন্য এক ঝিনুক দূর্বার রস ও এক তোলা পরিমাণ চিনি, মিশ্রিত ক'রে কিছুক্ষণ পর পর সেবন করা আবশ্যক।

হরতকীর গুঁড়া + মধু

হরিতকীর গুঁড়া মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লেহন ক'রলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

৬৪. **বসন্ত :** বসন্ত সাধারণত: দু'রকম—জল বসন্ত ও গুঁটি বসন্ত। বসন্ত-রোগ চিকিৎসার নানারকম পদ্ধতি ও ঔষধ এদেশে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত উপায়সমূহ লক্ষণীয়।

করলার পাতা ও হলুদের রস

করলার পাতার রসের সাথে কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে এক ঝিনুক পরিমাণ প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'র এক থেকে তিন সপ্তাহকাল পান ক'রলে যে কোন রকম বসন্ত রোগের উপকার হয়।

কলমী শাকের ঝোল

বসন্ত রোগ কোন কারণে 'লাট খেয়ে' শরীরে ব'সে গেলে এবং বসন্তের উদ্ভেদ ঠিকমত বেরোতে না পেরে জটিল অবস্থার সৃষ্টি ক'রলে কলমী শাকের ঝোল খাওয়ানো আবশ্যক। তাতে উদ্ভেদ বেরিয়ে আসে এবং রোগ শীঘ্র নিরাময় হয়।

তুলসী পাতার রস + আদার রস

বসন্ত-রোগের উদ্ভেদ ভালভাবে বের হ'তে না পারলে তুলসী পাতার রস ও সমপরিমান আদার রস মিশিয়ে দৈনিক দু'বার এক ঝিনুক ক'রে কয়েক দিন নিয়মিত পান ক'রলে শীঘ্র উদ্ভেদ প্রকাশ পেয়ে রোগ নিরাময় হয়।

নিমের পাতা

বসন্ত-রোগীর বিছানায় কাঁচা নিমের পাতা ছড়িয়ে তার ওপর রোগীকে শোয়ালে, রোগীর উপকার হয়।

কাঁচা হলুদ ও নিম পাতার প্রলেপ

কাঁচ হলুদ ও নিম পাতা একত্রে ভালভাবে পিষে বসন্ত-রোগীর ঘায়ের ওপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। এরূপ প্রলেপ দিয়ে কয়েক ঘণ্টা পর বসন্ত-রোগীকে স্নান করানো উপকারী। এই প্রলেপে বসন্তের বিষ বিনষ্ট হয় এবং রোগী শীঘ্র আরোগ্য হয়।

হরিতকীর বীজ

হরিতকীর বীজ ফুটো ক'রে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখলে বসন্ত রোগ হয় না। পুরুষ লোকের ডান হাতের ও স্ত্রী লোকের বাম হাতের কব্জিতে বাঁধা আবশ্যক।

৬৫. **বহুমূত্র :** 'বহুমূত্র' রোগে অনেক রকম। কিন্তু লোক-চিকিৎসকগণ বহুমূত্রের সেইসব শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল কিনা সন্দেহ। তাঁরা এ রোগ নিরাময়ের নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকেন।

জগডুমুরের রস

পাকা জগডুমুরের রস এক ঝিনুক পরিমাণ দৈনিক দু'বার ক'রে তিন থেকে এক সপ্তাহ সেবন ক'রলে বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয়।

৬৬. **ব্রণ :** ব্রণকে 'বস ফোঁড়া' বা যৌবন উদ্‌গমনকারী ফোঁড়া বলা হয়। এ রোগ তরুণ-তরুণীদের চোঁয়াল প্রদেশে হতে দেখা যায়। রোগটির লৌকিক ঔষধ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

আকন্দে আঁঠা

ব্রণের ওপর আকন্দের আঁঠা প্রত্যহ দু'তিন বার লাগালে 'ব্রণ রোগ' শ্রীঘ্র নিরাময় হয়।

করবীর মূলের প্রলেপ

ঠাণ্ডা পানি দ্বারা করবীর মূল বেঁটে ব্রণের ওপর প্রত্যহ একবার বা দু'বার ক'রে কয়েকদিন প্রলেপ দিলে ব্রণ নিরাময় হয়।

৬৭. **বাত :** লৌকিক মতে মানুষের 'বাত' রোগ প্রায় আশি প্রকার। এগুলোর মধ্যে আমবাত, গেঁটেবাত, বিষবাত, রসবাত, ঝেঁঝে বাত, বাতরক্ত, বাতপিত্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমবাত শব্দটি সাধারণত অ্যালার্জি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে বাত চিকিৎসার মন্ত্র ও ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র-১

বিছমিল্লা
কুরোতি কুরোতি
বংশাবতী
বাত রস
দাঁত রস
পচা, গীদ্ধ, জানকী রস
জা'নে শুনে না কয়
সুবংশের নিব্বংশ হয়।
কার দোয়া—
সুলতান শরীফের দোয়া
দোহাই গুপ্ত পীর
গুপ্ত পীর॥

উক্ত মন্ত্র এক নিঃশ্বাসে তিন বার প'ড়ে রোগীর শরীরের আক্রান্ত স্থানে উপর থেকে নীচের দিকে হাত লাগিয়ে টানতে হবে এবং ফুঁ দিতে হবে।

এভাবে তিন দিন সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে ঝাড়লে বাত রোগ নিরাময় হয়। অতঃপর রোগীর গজাল মাছ, মৃগেল মাছ ও মসুরের ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ।

মন্ত্র-২

বিসমোল্লা মালেক আল্লা
বিন্দাবনে আলী
ধ'রে গাছের গোড়া
এক বাগ সবগে লাঙ্গা
হুমুনিয়া রায়
অমুকের অঙ্গের ভূত-প্যাত
বাও-বাতাস, দ্যাও-দোষ্টি
ব্যথা শূলো
আনাছে-কানাছে, ডানে ডুনে
যে কিছু আসরে আয়েছে
এই নামে পুড়াই
করুণ ছাই
হু হু শব্দে মাগে
আল্লার কাছে, করি
এই কৈফত
করি এই দরবার॥

(খাতায় প্রাপ্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি লেখা নেই।)

মন্ত্র-৩

দেলোয়ারী মোহাম্মদ মুসকিল
কোসয়াল মোহাম্মদ মোস্তফা
মোরতজা আলী
লায়লাহা আল্লাহু
মুসারঙা পতি
বিসমোল্লা তীর
আলহামদুর ছিলে
কোলহুআল্লার কামান
মার দুষমন
দূর কর তামাম
সুঅষা জয়—

আল্লা মোহাম্মদের কলেমায়
যা বুলি তাই হয়
বসতি অঙ্গ উঠলি সুনা
পাহাড় ভেঙে পর্বত টোটে
উনকোটি বিহান্দি আল্লা
তোমার আওয়াজে কাটে
বিসমিল্লা তয়
তাইতি অমুকের জ্বরজারি
ব্যথা শূলো নিক্ষয়
বিসমোল্লা কৈ।

নির্দেশ : "একুশ বার, এক দমে পড়তে হবে"।

(এছাড়া অন্য কোন নির্দেশ, উক্ত খাতায় অনুপস্থিত।)

যে কোনো 'বাত ঝাড়ার' ক্ষেত্রেই এরকম মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অতঃপর 'গেটে বাত ও অন্যান্য বাতের ঔষধ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. গেঁটে বাত : সাধারণত: মানুষের শরীরের গাঁটে গাঁটে বা সন্ধিস্থানসমূহে যে ফোলা ও ব্যথা প্রায়শ: আমাবশ্যা-পূর্ণিমায় দেখা দেয়, কিংবা বৃদ্ধি পায়—তাকে গেঁটে বাত ব' লে। এ রকম বাতরোগে নিম্নলিখিত চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বনীয়। যথা—

আকন্দের পাতা

আকন্দের পাতা সেঁকে দিয়ে আক্রান্ত স্থানে বেঁধে রাখলে গেঁটে বাতের উপশম হয়।

আকনেদর আঁঠা

অকান্দের আঁঠা মর্দন ক'রলেও 'গেঁটে বাত' আরোগ্য হয়।

অশত্থ

অশত্থের ছালের ক্কাথ এক ছটাক মধুর সাথে দৈনিক সকালে এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন ক'রলে 'রক্ত বাত' বা 'বাত রক্ত' নিরাময় হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ

দৈনিক সিকি তোলা পরিমাণ অশ্বগন্ধার গুঁড়া তিলের তেলে মেড়ে গায় মাখলে 'বাতপিত্ত রোগ' আরোগ্য হয়। এ ঔষধ রোগী অনুযায়ী এক থেকে ছয় সপ্তাহ ব্যবহার্য্য।

আলকুশী

দৈনিক সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ আলকুশীমূলের রস, এক থেকে তিন সপ্তাহ যাবৎ পান ক'রলে 'গেঁটে বাত' নিরাময় হয়।

আলকুশীর ক্বাথ

আলকুশীর পাতা পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে সেই পানি প্রত্যহ আধ ছটাক পরিমাণ পান করলে 'পৈত্তিক বাত' বা 'রক্তপিত্তরোগ' নিরাময় হয়। এ ঔষধ ক্ষেত্র বিশেষে মাসাধিককাল ব্যবহার্য।

ভেন্নার তেল+সৈন্ধব লবণ

ভেন্নার তেলের সঙ্গে কিছু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে সেই তেল সামান্য গরম ক'রে বাতাক্রান্ত স্থানে মালিশ করলে বাত–বেদনার উপশম হয়।

করবী মূলের প্রলেপ

করবী মূল ঠাণ্ডাপানিতে বেঁটে প্রলেপ দিলে বাতাক্রান্ত স্থানের বেদনা ও যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং বাতের উপশম ঘটে। এই প্রলেপ প্রত্যহ সকালে ও বিকালে দু'বার ক'রে তিন থেকে সাত দিন প্রযোজ্য।

কাঁচা রসুন

কাঁচা রসুন ভাতের সাথে লবণ দিয়ে খেলে বাত রোগ নিরাময় হয়। এ ঔষধ প্রতিদিন খেলে সারাজীবন বাতরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কাঁচা রসুন+চাল ভাজা

কাঁচা রসুন চাল ভাজার চিবিয়ে খেলেও বাতরোগ দূর হয়। এও নিয়মিত রূপে অনেকদিন খাওয়া আবশ্যক।

তুলসী পাতার রস

তুলসী পাতার রসে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বাতে আক্রান্ত স্থানে পটি বেঁধে দিলে বাত–বেদনার উপশম হয়।

মালিশ

গনধভাঁদুলের মূল, ডাঁটা ও পাতা–সর্ষের তেলে সিদ্ধ করে সেই তেল সেঁকে বাতাক্রান্ত স্থানে নিয়মিত কিছুদিন মালিশ করলে–অতি কঠিন বাতরোগও নিরাময় হয়।

৬৮. **বাতাস লাগা :** সাধারণত অবশাঙ্গ (Paralysis) রোগকে 'বাতাস লাগা' রোগ বলে। এ রোগের মূল কারণ হিসেবে মনে করা হয় : জ্বিন–পরী, চলাকালে বাতাসে যে ঢেউয়ের সঞ্চার হয়, সেই ঢেউয়ের সংস্পর্শে কেউ এলে তারই এ রোগ হয়। আলোচ্য রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য 'তেল পড়া', 'পানি পড়া', 'ঝাঁড়–ফুঁক' ইত্যাদি উপায় অবলম্বিত হয়। নিম্নে ঝাড়–ফুঁকের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র

স্বর্গ হ'তে এল বাতাস
ভুবনেতে প'ল
শনি-মঙ্গলবারে বাতাস
শ্মশান থেকে চলে।
শ্মশান থেকে এসে বাতাস
ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুপুরের কালে বাতাস
লাগে যাহার গায়
অঙ্গহীন করিয়া বাতাস
তাহাকে ফেলায়
একচল্লিশ দিন গত হ'য়ে
যখন যায়
তখন তাহার অংগ
পড়িয়া যে যায়।
শুকাইতে শুকাইতে ঠ্যাং
ওঠে হাতেরই উপর
হাতের উপর থেকে বাতাস
মস্তকেতে যায়
ধরি বাতাস করি কাজ
দুবলারো চরে
দোহাই দোহাই বুড়ো ফকির
তোমার দোহাই।

এই মন্ত্রপাঠ ক'রে রোগীকে পর পর সাত দিন ঝাড়া আবশ্যক। অতঃপর নিম্নের মন্ত্রটি দ্বারা পানি প'ড়ে ঐ রোগীকে নিয়মিত একুশ দিন প্রত্যহ দু'তিন বার খাওয়ানো আবশ্যক।

পহেলা মোর আল্লার নাম
নিতে করলাম শুরু
নিদানের ভরসা মওলা
দয়া করবেন গুরু
এস বাতাস ধর কথা
মানুষের দেহ ছেড়ে তুমি
যাও অন্যথা—
এক একে বলি কথা
বসিয়া শোন হেথা
কথা যদি না শোন
শুনিবা পরে

আস্তে আস্তে বাতাস তুমি
নামো দেহ ছেড়ে
বাম হস্তে লাগিল বাতাস
লাগিল লাগিল
দেহেরো মাঝেরে বাতাস
ঝুরিতে লাগিল
যে হস্ত দে আইচ বাতাস
সেই হস্তেতে যাও।
বলিতে বলিতে বাতাস
নামিতে লাগিল
নামিল বাতাস ধরারও মাঝারে
একে একে তিন দিন ঝাড়িতে লাগিল
নামিতে লাগিল বাতাস
বাম হস্তেতে
নামিয়া বাতাস ঘুরিল
ঘোরেরো মাঝেতে
চার রাত তিন দিন যাবৎ
ঘুরিতে লাগিল
ঘের ছাড়িয়া বাতাস তুমি
শ্মশান দিকে যাও
যেও পতে আইচ বাতাস
তার অপর পতে যাও
অপর পতে যাইয়ে বাতাস
ছাড় রুগীর কথা
রুগীর নাম মুখে না লইবা বাতাস
না করো অন্যথা—
রোগীর নাম লইলে পরে
বংশ নিব্বংশ করিব
জানিবা নিশ্চয়।
বংশের কলংক না করিবা
বলি বার বার—
যাও বাতাস রুগীর
দেহ ছেড়ে যাও।

এ মন্ত্রটি ব্যবহারের আগে, যে নদীতে জোঁয়ার-ভাঁটা বয়-সেই নদীতে চার টাকা দশ আনা দুই পয়সা ফেলে দিয়ে ব'লতে হবে-"চান পাই মেছের শাহ্ ফকীরের ওখানে চলে

যাও"। দর্জির দোকান থেকে নতুন কাপড়ের টুকরা এনে তাতে ঐ টাকা বেঁধে ফেলে দিতে হবে।

এ ধরণের রোগী আরোগ্য ক'রতে হ'লে ফকীরকে খুব ভোরে গোসল ক'রে এসে ভিজে কাপড়ে চাল-গুড়-নারকেল এক সঙ্গে দিয়ে সিন্নি রান্না ক'রতে হবে। তারপর ঐ সিন্নি শিশুদের বিলয়ে দিতে হবে।

ফকীর এ রকম রোগীর চিকিৎসার সদকা হিসেবে সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা নিতে পারবে।

৬৯. **বাধক বেদনা :** স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা নিরাময়ের নানা উপায় আছে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত উপায় সমূহ লক্ষণীয়।

বটিকা বা বড়ি

কাঁটা কুমোরে লতার পূব দিকের তিনটি ডগা নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে তুলে, এক কোষী তিনটি রসুনের সঙ্গে বেঁটে, তিনটি বড়ি তৈরি ক'রে পর পর তিন দিন সকালে বাসি পেটে খেলে বাধক বেদনা নিরাময় হয়।

৭০. **বাণ ফেরানো :** 'বাণ' নামক এক জাতীয় মন্ত্র আছে। উক্ত মন্ত্র প্রয়োগ ক'রলে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যাদির ক্ষতি হয়। এ মন্ত্র কোন উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ ক'রলে তার গলা দিয়ে রক্ত ওঠে কিংবা রক্তবাহ্য হয়। কলেরাও দেখা দেয়। কোন রকম ডাক্তারী চিকিৎসাই তাকে রক্ষা ক'রতে পারে না। আবার উক্ত মন্ত্র কোন গাভীর প্রতি প্রয়োগ ক'রলে তার বাঁটে দুধ থাকে না কিংবা দুগ্ধ দোহন ক'রতে গেলে সে অস্থির হয়, লাথি ছোড়ে, দুগ্ধ দান ক'রে না। এ ধরণের মন্ত্র কোন বৃক্ষে প্রয়োগ ক'রলে অতি শীঘ্র তার ডালপাতা শুকিয়ে সেটি মারা যায়। পুকুরের মাছের প্রতি প্রয়োগ ক'রলে সমস্ত মাছ ম'রে ভেসে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে এরকম দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পেতে 'ব্রাণ-ফেরানো মন্ত্র' প্রয়োগ করা হয়। বাণ-ফেরানো মন্ত্র সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, কখনও কখনও তা প্রয়োগের অবকাশ পাওয়া যায় না। সাধারণত শত্রুতা সাধন কিংবা খেলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষতি/হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে বাণ-মারা মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, সেগুলো প্রতিহত ক'রতেই আলোচ্য 'বাণ-ফেরানো' মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। নিম্নে জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হ'ল।

মন্ত্র-১

বিস্বার আনলে জুড়িলাম বাণ
বড় বড় বাণ না সয় টান
ধর্মেরই বড় বাণ
তুলে নিলাম হাতে।
একেতে পড়ে এক
দুইতে পড়ে দুইতেরও চান

তিনে পড়ে তিনকুল প্রেতম
চারি পড়ে চতুর্দিক নারায়ণ
পাঁচে পড়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডব
জয়েতে পড়ে ছয় গিরে রাবণ
সাতে পড়ে সাঁতলি পর্বত
অষ্টে পড়ে অষ্ট গিরে রাগ
নয়েতে পড়ে নব দূর্গা চণ্ডী
দশে পড়ে দশ গিরে রাবণ
এগারতে এগারো ভুবন
বারোতে বারো রশ্মিদেব
তেরতে তেরতং কল
স্বর্গ মস্তক পাতাল
        করি একাকার।
কোন কোন বাণ
পুড়ে ম'ল আমার
        এই জলপড়ার ঘায়ে
জলে পড়ে জলকুমারী
উনকোটি আগুনি পোড়ে বিষহরি—
মুখদোষে পুড়ে ম'ল
কালকার ভূবানি
পোড়ার শোগে পোড়ে য্যাতো
এরাম লক্ষণ সীতে পোড়ে
        লক্ষ্মী স্বরস্বতী
উড়োনি/গুড়োনি/পোড়ে
        দেবী পদ্মপতি।
আসাৎ পোড়ে তারা
হারে
        বেশতে
        দেশটে
গহীন গুমুরি পোড়ে
        পাকড়েরি ডাল
মড়ার শ্মশানে পোড়ে
        কোন দেবী/বীর হনুমান
        ন্যাও পুতো
        পুরপানি
ন্যাও বলিদান।
        কোন কোন বাণ

আমার এই রুগীর কণ্ঠে
বলে দ্যাও তার নাম
সুশা সুনাতন
নিস্তার কর নিরাঞ্জন
ও আল্লা ও আলী
আমার তিন তালি
যদি ছোটে
আল্লা মোহাম্মদের
মস্তক ফাটে।
আল্লা
আমি মরি
তাতে নাইতো দায়
আজ আবানে তোমার নামের ভেরস যায়॥

নির্দেশ : এক কলস পানিতে এই মন্ত্র দু'বার পড়ে দুই ফুঁ এবং তৃতীয় বার প'ড়ে তিন ফুঁ দিয়ে উক্ত পানিকে মন্ত্রপূত ক'রতে হবে। তারপর সেই পানি দিয়ে রোগীকে গোসল করালে এবং খাওয়ালে বাণ-মারা জনিত ক্ষতি নিবারণ হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে।

মন্ত্র-২

আদ্য মাতা বসুমতি
তুমি আমার বাপ
তুমি আমার মা
আমারে যে মারে বাণ
তারে তুই খা...
যে বাণ আসে
সেই বাণ খাও
খাবার হয়তো খাও মা
না খাবার হয়তো
যে বিটা মারে বাণ
তাহার বুকুস্থলে যাও।

নির্দেশ : 'নয় বার' এই মন্ত্র ন'বার পড়ে পানি মন্ত্রপূত ক'রে তা দিয়ে রোগীকে গোসল করালেও তা' তাকে তিনবার খাওয়ালে রোগী বাণমন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত হয়। সে নিরাময় লাভ ক'রে।

৭১. **ব্যথা-বেদনা :** সাধারণভাবে শরীরের কোন অংশ বেদনাক্রান্ত হ'লে, নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঝাড়লে উক্ত বেদনা বিদূরিত হয়।

মন্ত্র

আমাবস্যের লাগে জোয়ার
পূর্ণিমের ভাঁটি
তাই দে ঝাড়ি পাজির কাঠি॥

পাজির কাঠি (গ্রামে গরুছাগলের দড়ি পাকাবার সময় যে দু'টি ছোট বাঁশের কাঠি ব্যবহৃত হয় তাই) ও বাসি পানি (রাতে বা পূর্ব দিন এনে রাখা পানি) দিয়ে আক্রান্ত স্থান ঝাড়তে হয়। ঝাড়ার সময় পানিতে কাঠি দু'টি ভিজিয়ে ভিজিয়ে আক্রান্ত স্থানের, উপর থেকে নীচের দিকে কাঠি বুলিয়ে বুলিয়ে টেনে ঝাড়তে হয় এবং ফুঁ দিতে হয়। প্রতিবার মন্ত্র পড়ে এক ফুঁ। এরকম সাত বার প'ড়ে সাত ফুঁ। উল্লিখিত নিয়মে দু'তিন দিন ঝাড়লে বেদনা দূর হয়।

৭২. **বিছানায় প্রস্রাব :** কৃমি ও অন্যান্য কারণে শিশুরা (ক্ষেত্র বিশেষ তরুণ-তরুণীরাও) রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বিছানায় প্রস্রাব ক'রে থাকে। এ রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র ও ঔষধ ব্যবহার্য।

মন্ত্র

জয় রহিম জয় রাম
বালিশের তলায় কালীর নাম
তিন টোকা তিন ফুৎ
বিছানায় না মোতে পুত॥

মন্ত্রটি তিনবার পড়ে শিশুকে তিন বার ঝেড়ে দিলে তার শয্যা-প্রস্রাব নিবারণ হয়। এরূপ দু'তিন দিন ঝাড়া আবশ্যক।

লজ্জাবতী লতার শিকড়

লজ্জাবতী লতার শিকড় বেঁটে সিকি থেকে অর্ধ ঝিনুক পরিমাণ দৈনিক একবার ক'রে দু'তিন দিন খাওয়ালে বিছানায় প্রস্রাব করা রোগ আরোগ্য হয়।

৭৩. **বুকের দুধ বৃদ্ধি :** বিভিন্ন কারণে মাতার স্তন্য শুকিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দুধ বাড়াবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কলমী শাক

কলমী শাকের ঝোল কয়েক দিন নিয়মিত সেবন করলে প্রসূতীর বুকের দুধ বাড়ে।

কেশুখের রস

প্রত্যহ সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ কেশুখের রস মধুসহ কয়েক দিন সেবন ক'রলে মাতার বুকের দুধ বৃদ্ধি পায়।

মহাসমুদ্রের গাছ

মহাসমুদ্রের গাছের ছাল ও গোল মরিচ একত্রে পিষে রস ক'রে স্তনে প্রত্যহ দু'তিন বার কয়েকদিন মাখালে বুকের দুধ বেড়ে থাকে।

মুথা

প্রসবের পর মাতার স্তনে দুধ কম হ'লে টাটকা মুথা বেঁটে স্তনে প্রলেপ দিলে বুকের দুধ বৃদ্ধি পায়।

৭৪. **বাধক বেদনা :** এটি একটি স্ত্রী ব্যাধি। এই ব্যাধি নিরাময়ের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য।

উলট কম্বল

উলট কম্বলের মূলের সঙ্গে তিনটা গোল-মরিচ বেঁটে ঋতুর তিন-চার দিন পূর্ব থেকে ঋতু চলাকালীন প্রত্যহ সকালে সেবন ক'রলে বাধক বেদনা দূর হয়।

ভেন্নার পাতার সেঁক

বাধক বেদনা তীব্র হলে বেড়ী বা ভেন্নার পাতা গরম ক'রে তলপেটে সেঁক দিলে বেদনা নিরাময় হয়।

বড়ি

বাধক বেদনা নিবারণের জন্য একুশটি গোল মরিচ ও কচা গাছের ছাল এক সঙ্গে বেঁটে সাতটি বোরোই পরিমাণ বড়ি বানিয়ে রাখতে হবে। তারপর রোগিনী স্নান ক'রতে যাবার সময় ঐ বড়িগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে স্নানকালে ঘাটে গিয়ে একটা, ডুব দিয়ে উঠে একটা, ফেরার পথে অর্ধেক এসে একটা, ঘরের ছাঁচেয় দাঁড়িয়ে একটা, বারান্দায় উঠে একটা, ঘরের দরজায় গিয়ে একটা ও ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে একটা ঐ বড়ি খাবে। তাহ'লেই তার বাধক/ফুল বাধক রোগ আরোগ্য হবে।

৭৫. **বুকের দোষ :** সাধারণত 'হার্ট ডিজিজ' বোঝাতে 'বুকের দোষ' কথাটা ব্যবহার করা হয়। দূর্বলতা বুক কাঁপা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি এই রোগের নির্দেশক লক্ষণ। লোক-চিকিৎসকগণ 'বুকের দোষ' নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

অর্জুনের ক্বাথ

আধ ছটাক কাঁচা অর্জুনের ছাল আধ সের পানিতে সিদ্ধ করে, আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, দৈনিক সকালে একবার ক'রে এক সপ্তাহ পান করলে 'বুকের দোষ' দূর হয়।

অর্জুনের ছালের গুঁড়া

ক. অর্জুনের ছালের গুঁড়ো, ঘি সহযোগে গরম ভাতের সঙ্গে দৈনিক দু'বার ক'রে এক থেকে তিন সপ্তাহ নিয়মিত খেলে 'বুকের দোষ', 'বুক ধড়ফড়ানি' (কাঁপা) প্রভৃতি দূর হয়।

খ. ঐ গুঁড়ো দিয়ে বোরোই পরিমাণ বড়ি তৈরি ক'রে গরম ভাত কিংবা গোল মরিচ সহ খেলেও 'বুকের দোষ' দূর হয়।

৭৬. **মচকা-ভাঙা :** দুর্ঘটনার জন্য হাত বা গা ম'চকে গেলে তা চিকিৎসার জানা রকম পদ্ধতি আছে। নিম্নে এরকম কয়েকটি পদ্ধতির ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র

হাড় মুচুর মুচুর
ভেন্নার কচুর কচুর
কার আজ্ঞে?
মা হাঁড়ি-ঝির আজ্ঞে
যে হাড় ভাঙিচিস
শিগ্‌গীর যাইয়ে
জোড়া লাগ্‌গে॥

শরীরের কোন স্থান ম'চকে গেলে সরিষার তেল ও লবণ এক সঙ্গে মিশিয়ে তা আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে জোরে ডলে উপরের দিক থেকে নীচের দিকে টেনে, উক্ত মন্ত্র পাঠ ক'রে ক'রে ঝাড়তে হয়। প্রত্যহ দু'বার ক'রে সকালে ও বিকালে ঝাড়া আবশ্যক। তিন দিন ঝাড়লে মচকা-ব্যথা নিরাময় হয়, প্রতিবারে সাতবার ঝাড়া দরকার।

আপাং গাছের জাব

আঘাত লেগে শরীরের কোন অংশ থেঁতলে বা ম'চকে গেলে আতপ চালসহ আপাং গাছ বেঁটে 'জাব' দিলে সত্তর রোগ আরোগ্য হয়। 'জাব' কয়েকদিন দেওয়া আবশ্যক।

কেরোসিন+লবণ

কোন স্থান ম'চকে গিয়ে ফুললে ও ব্যথা হ'লে কেরোসিন তেল ও লবণ এক সঙ্গে ঐ স্থানে লাগিয়ে খুব জোরে জোরে ড'লে মালিশ ক'রে দিলে, রোগ নিরাময় হয়। দৈনিক দু'তিন বার মালিশ করা আবশ্যক।

জাব

গরুর চোনা, কাল ধুতুরার ডাল-পালা, পাথর কুচির পাতা, আমড়া গাছের শিকড়, তুলসী গাছের পাতা ও বুঁজ পাতার ছাই-একত্রে পানি দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরি ক'রে পর পর তিন রাত শোবার সময় আক্রান্ত স্থানে লাগালে মচকা বা ভাজা আরোগ্য হয়।

৭৭. **মাথার চুল ওঠা :** যে কোন কারণে মাথার চুল উঠতে পারে। সাধারণত যৌবনকালে চুল ওঠা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয় :

আমলকী

দৈনিক কাঁচা আমলকী বেঁটে মাথায় প্রলেপ দিয়ে দু'তিন ঘন্টা রেখে ফেললে মাথার চুল ওঠা নিবারণ হয়। এরূপভাবে এক থেকে তিন সপ্তাহ মাথা প্রলেপিত ও ধৌত করা আবশ্যক।

৭৮. **মাথার যন্ত্রণা :** মাথার রোগ সম্পর্কে ইতোপূর্বে 'গরম লাগা' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে কোন কারণে মাথায় যন্ত্রণা হোক না কেন, তা নিরাময়ের ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

অনন্তমূল+শতমূল

অনন্তমূল ও শতমূল একত্রে বেঁটে রস ক'রে, ক'ড়ে পাত্রে রেখে, সেই রস মাথায় মাখলে মাথার যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

আকন্দ গাছ

শনি–মঙ্গলবারে অফোঁটা আকন্দ গাছের মূল শিকড় 'নিশ্বাস ধরে' তুলে এনে 'এক পেশে মাথা ধরা' রোগীর চুলে, তার বিছানায় সুতো দিয়ে ব'টে বেঁধে দিলে–ঐ রোগ নিরাময় হয়।

একাজে শীষ আকন্দ গাছের মূল ব্যবহার্য। আর রোগীর যে পাশের মাথা ধরা থাকে, তার বিছানার ও সেই পাশের সুতো তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে চুল যতটা বটা (বিনুনি করা) যায়, ততটা ব'টে ঐ শিকড় বাঁধতে হয়।

আমলকী, গোলাপ পানি ও সাদা চন্দন এক সঙ্গে ঘ'ষে কপালে প্রলেপ দিলে 'মাথা ধরা' রোগ নিরাময় হয়।

'পটি'

ভিজিয়ে রাখা আমলকী ও নারকেলের মুচির ফুল ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেঁটে মাথায় পটি দিলে মাথার গরম উঠে গিয়ে জ্বালা–যন্ত্রণা নিবারণ হয়। তিন থেকে দু' সপ্তাহ এই পটি ব্যবহার্য। (এ ঔষধ উন্মাদ, অর্ধ–উন্মাদ ও স্নায়বিক পীড়াগ্রস্থ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।) (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)

আষ্টলির গাছের পটি

আষ্টলি গাছের মঞ্জরী, ভাঁটির গাছের মঞ্জরী ও বোরোইর জালিপাতা সহ মঞ্জরী পানি দিয়ে বেঁটে মাথায় পটি দিলে স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এই পটি শিশুদেরও দেওয়া যায় এবং শিশুদের 'দোষদৃষ্টি', 'কৃমি' প্রভৃতি নিরাময় হয়।

কদুর পাতা

কদুর (লাউয়ের) জালি পাতা বেঁটে মাথায় 'ভারা' দিলে মাথার জ্বালা–যন্ত্রণা দূর হয়।

করবীর মূল

করবী গাছের মূল বেঁটে কপালে প্রলেপ দিলে মাথা ধরা নিরাময় হয়।

ঘৃতকুমারীর 'পটি'

ঘৃত কুমারীর শাঁস কপালে মাখিয়ে মাথার তালুতে পটি আকারে কয়েকদিন লাগালে মাথার যন্ত্রণা, মাথা ধরা প্রভৃতি নিরাময় হয়।

তেলাকুচার মূলের রস+তিল তৈল

তেলাকুচার মূলের রস আধ পোয়া ও এক ছটাক তিলের তেল এক সংঙ্গে মেড়ে মাথীয় নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে মাথার যন্ত্রণা দূর হয় এবং মাথা ঠাণ্ডা থাকে। (উক্ত মূল বিনা পানিতে বেঁটে রস বের ক'রতে হয়। পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

৭৯. **মূত্র কৃচ্ছ :** 'স্বল্প মূত্র' রোগ চিকিৎসার জন্য সাধারণত যে সব ঔষধ ব্যবহার করা হয়–তার বিবরণ নিম্নরূপ।

অশোক

অশোকের সিকি তোলা পরিমাণ বীজ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেঁটে প্রতিদিন সকালে সেবন ক'রলে মূত্রকৃচ্ছ রোগ আরোগ্য হয় এ ঔষধ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেব্য।

কুরচীর 'ক্বাথ'

দৈনিক সকালে কুরচীর 'ক্বাথ' আধা ঝিনুক পরিমাণ বাসি পেটে মধুসহ এক থেকে তিন সপ্তাহ যাবৎ সেবন ক'রলে স্বল্পমূত্র রোগ নিরাময় হয়।

(এই 'ক্বাথ' তৈরি ক'রতে হ'লে এক সের কুরচীর ছাল ও আট সের পানি এক সঙ্গে জ্বাল দিয়ে দু'সের থাকতে নামিয়ে সেঁকে পুনরায় জ্বাল দিয়ে এক পোয়া থাকতে নামিয়ে ঠাণ্ডা করলেই 'ক্বাথ' প্রস্তুত হয়।)

দূর্বা ঘাস

আধ পোয়া দূর্বাঘাসের মূল দু'সের পানিতে সিদ্ধ ক'রে আধ সের থাকতে নামিয়ে সেঁকে দৈনিক তিন বার আখেঁর চিনি মিশিয়ে সেবন ক'রলে 'মূত্রকৃচ্ছ রোগ' আরোগ্য হয়।

৮০. **মূত্র পাথরী :** 'মূত্র পাথরী' একটি যন্ত্রণাদায়ক ও শল্য চিকিৎসামূলক রোগ। কিন্তু আমাদের দেশে লৌকিক চিকিৎসায় বিনা অস্ত্রোপচারে এ রোগ নিরাময় হবার অনেক নিদর্শন লাভ করা যায়। নিম্নে এ ধরণের কতিপয় চিকিৎসা–পদ্ধতির উল্লেখ করা হ'ল।

অনন্তমূলের রস+ মধু

দৈনিক সকালে এক তোলা অনন্তমূল বেঁটে রস নিষ্কাশন ক'রে, ঐ রস সমপরিমাণ মধু সহ মেড়ে এক সপ্তাহ পান ক'রলে 'মূত্র পাথরী' রোগ নিরাময় হয়। পাথরী মূত্রের সঙ্গে নির্গত হ'য়ে রোগরোগ্য ঘটে।

হরিতকী

হরিতকীর বীজ দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে সেই দুধ দৈনিক সকালে পান ক'রলে 'মূত্র পাথরী' রোগ আরোগ্য হয়।

৮১. **মূত্র শূল :** মূত্র শূল রোগে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

আদার রস+ভেন্নার তেল

চার পাঁচ ফোঁটা আদার রস ও সমপরিমাণ ভেন্নার তেল এক সঙ্গে ঘুঁটে সেবন ক'রলে মূত্র শূলের উপশম হয়।

৮২. রজঃ স্রাব : অতিরিক্ত 'রজঃস্রাব' রোগ–বিশেষ। তা' দূর করার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধসমূহ প্রযোজ্য।

আপাং–এর শিকড়ের রস

কোন স্ত্রীলোকের যে কোন কারণে অতিরিক্ত রজঃস্রাব শুরু হ'লে, দু'আনা পরিমাণ আপাং গাছের শিকড় পানির সাথে বেঁটে সেই রস ছেঁকে পান করালে অতিশ্রাব বন্ধ এবং বেদনাদিও দূর হয়। এ রস একদিনে দু'তিন বার খাওয়ানো যায়।

আকনের শিকড়+সাঞ্চু শাক

শীষ আকন্দের শিকড় ও সাঞ্চশাক-লতাপাতাসহ বেঁটে রস ক'রে–'নোয়াড় ক'রে' তিন দিন সকালে বাসি পেটে এক ঝিনুক ক'রে খাওয়ালে অতিরিক্ত রজঃস্রাব নিবারণ হয়।

ধান ভেজানো পানি

বেশি স্রাব হ'লে ধান ভেজানো পানি ভালভাবে সেঁকে দু'তিন ঝিনুক পরিমাণ এক দিন খেলেই স্রাব নিয়মিত হয়।

কদমের শিকড়

চারা কদম গাছের শিকড়ের রস এক ছটাক সমপরিমাণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে একবার খাওয়ালে অতি রজঃস্রাব বন্ধ হয়।

৮৩. **রক্ত পড়া নিবারণ'** নানা কারণে রক্তপাত হ'তে পারে। কেটে গেলে যে, রক্তপাত হয়, তার ঔষধ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হ'য়েছে। কোন অজ্ঞাত কারণে 'নাক' 'মুখ' বা 'গলা' দিয়ে রক্তপাত হ'লে তা চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে।

ক. গলা দিয়ে রক্ত পড়া : গলা দিয়ে রক্ত পড়া রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত লোকৌষধ ব্যবহার করা হয়।

দূর্বার রস

দূর্বার রস দৈনিক দু'তিন বার এক ঝিনুক পরিমাণ কয়েকদিন যাবৎ সেবন ক'রলে গলা দিয়ে রক্তপড়া নিবারণ হয়।

ঘ. নাক দিয়ে রক্ত পড়া : যেকোন কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত হ'লে তা' নিম্নোক্ত ঔষধে নিরাময় হয়।

উচ্ছের পাতার রস

উচ্ছের পাতার রস নাক–এর মধ্যে সকালে ও বিকালে দু'বার ক'রে দু'এক দিন দিলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া নিরাময় হয়।

দূর্বা ঘাস

দূর্বার রস নস্যির মত নাকে টেনে নিলে তখুনি নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

হরিতকী

একটা হরিতকী কেটে ফুটো ক'রে 'শ্বাস ধরে' সুতো দিয়ে হাতে বেঁধে দিলে সঙ্গে নাক দিয়ে রক্ত পড়া নিরাময় হয়।

কারো নাক দিয়ে রক্তপাত হ'তে থাকলে মন্ত্র শুনিয়ে কিংবা মন্ত্রপূত পানি পান করিয়ে উক্ত রক্ত পড়া বন্ধ করা হয়। এ ধরণের দু'টি মন্ত্র নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র–১

মুড়ো গাঁর বুড়ো মোল্যা
দোগাছে গাঁর নারা পাটনি
এই কথা যে জানবে তার

নাক দে রক্ত পড়া হবে না
যে শুনবে তার নাক দে রক্ত পড়া হবে না॥

"এই মন্ত্র তিনবার ক'রে পড়ে পর পর তিনদিন শুনাতে হবে।" তাহলেই রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

মন্ত্র-২

রক্তরই ডগমগ রক্তরই কায়া
রক্ত দেখে দেবীর পৌছিল দয়া।
হাড়ে মাংসে কাটে ঘা
যে শিরের রক্ত
সেই শিরি যা—
খোদার হুকুমে কাটা ঘা
নির্বিষ হ'য়ে যা॥

প্রাপ্ত খাতায় মন্ত্রটির নির্দেশক নিয়ম লেখা নেই॥ এটি কি ধরণের রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রযোজ্য তারও উল্লেখ নেই।

দূর্বার রস+আখেঁর চিনি

যে কোন প্রকার রক্তস্রাব নিবারণের জন্য এক থেকে দেড় ঝিনুক দূর্বার রস আখেঁর চিনি দিয়ে সেবন ক'রলে রক্তপাত নিবারণ হয়।

৮৪. **রক্ত পিত্ত :** 'রক্ত পিত্ত' রোগ গ্রস্থ রোগীর শরীরে সর্বদা দাহ বা জ্বলুনি থাকে। উক্ত রোগ আরোগ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

অর্জুনের ক্কাথ

অর্জুন গাছের কাঁচ ছাল আধ ছটাক, আধসের ঠাণ্ডা পানিতে সিদ্ধ ক'রে, আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে দৈনিক সকালে একবার ক'রে এক সপ্তাহ পান ক'রলে 'রক্ত পিত্ত রোগ' নিরাময় হয়।

কাঁটানটের শিকড়

কাঁটানটের শিকড় বেঁটে, সেই রসের সাথে আঁখের চিনি মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে বাসি পেটে ঝিনুক পরিমাণ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন করলে 'রক্ত পিত্ত রোগ' আরোগ্য হয়।

কুকুশিমা গাছ

দৈনিক এক ঝিনুক পরিমাণ কুকুশিমা পাতার রস সকালে বাসি পেটে এক থেকে তিন সপ্তাহ যাবৎ সেবন করলে 'রক্তপিত্ত' রোগ নিরাময় হয়।

দূর্বা ঘাস

দৈনিক সকালে এক ঝিনুক দূর্বার রস মধুসহ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন ক'রলে 'রক্তপিত্তরোগ' নিরাময় হয়।

৮৫. **রক্ত প্রস্রাব :** রক্ত প্রস্রাব একটি লোমহর্ষক রোগ। এই রোগের নানা প্রকার চমৎকার লৌকিক চিকিৎসা আছে। নিম্নে, কপিতয় ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

কদমের চারা + লবণ

চারা কদম গাছে লবণসহ বেঁটে এক ঝিনুক পরিমাণ দৈনিক সকালে ও বিকালে দু'তিন দিন খাওয়ালে রক্তপ্রস্রাব নিবারণ হয়।

পানি পড়া

'আলহামদো' সুরা একচল্লিশ বার প'ড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি প্রত্যহ চার-পাঁচ বার কয়েকদিন খাওয়ালে রক্তপ্রস্রাব নিবারণ হয়।

৮৬. **রক্ত ভাঙা :** মহিলাদের রক্ত ভাঙা একটি সাংঘাতিক রোগ। এ রোগের চিকিৎসা কষ্টকর। নিম্নে এ রোগের দু'টি ঔষধের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

ডালিম গাছ

ডালিমের শিকড়ের ছাল, ডালিম গাছের পরগাছা, ডালিমের ফুল এবং সাতটা গোল মরিচ একত্রে পিষে কুঁচ পরিমাণ বড়ি বানিয়ে, সেই বড়ি দৈনিক তিনটে তিন বার জলসহ সেবন ক'রলে 'রক্তভাঙা' রোগ নিরাময় হয়।

অশোকের ছাল+দুধ

অশোক ফুলগাছের ছাল দুই তোলা, এক পোয়া গরুর দুধ ও এক সের জল একত্রে জ্বাল দিয়ে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে সেই জল দিনে দু'বার ক'রে তিনদিন সেবনে 'রক্তভাঙা রোগ' আরোগ্য হয়।

৮৭. **রক্ত-শূন্যতা :** 'রক্তশূন্যতা' দূর করার লৌকিক ঔষধসমূহের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

উচ্ছের পাতার রস

প্রতিদিন সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ উচ্ছের পাতার রস এক থেকে তিন সপ্তাহ খেলে 'রক্তশূন্যতা' দূর হয় এবং রক্ত পরিষ্কার হয়।

কালকাসুন্দর রস

দৈনিক সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ কালকাসন্দার রস আঁখের চিনিসহ এক থেকে তিন সপ্তাহ যাবৎ খালি পেটে সেবন ক'রলে 'রক্তশূন্যতা' দূর হ'য়ে রক্ত বৃদ্ধি পায়।

৮৮. **রক্তাতিসার :** উদরাময়ের সঙ্গে রক্ত থাকলে, তাকে রক্তাতিসার বলে। এ রোগ চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

অর্জুনের ছাল চূর্ণ+ছাগলের দুধ

অর্জুনের ছাল রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্রতিবারে এক তোলা পরিমাণ গুঁড়ো, ছাগলের দুধের সাথে দৈনিক তিনবার রোগ-আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সেবন ক'রলে 'রক্তাতিসার' নিরাময় হয়।

৮৯. **শোথ রোগ :** 'ফোলা' প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হ'য়েছে। 'শোথ রোগ' অতিশয় মারাত্মক। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায়ও এ রোগের বিশেষ কোন কার্যকর ঔষধ আবিস্কৃত হয় নি। লোক-চিকিৎসায় কখনো কখনো শোথ রোগে ফল পাওয়া যায়। নিম্নে শোথ রোগের কতিপয় ঔষধের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

অশ্বগন্ধা+ঘৃত+মধু

অশ্বগন্ধার গুঁড়া আধা তোলা, ঘি ও মধুসহ মেড়ে দৈনিক সকালে একবার এবং রাতে একবার কিছুদিন যাবৎ সেবন ক'রলে 'শোথ রোগ' নিরাময় হয়।

কলমি শাকের বয়লা

কলমির যে ডগা পূর্বদিকে লম্বা হ'য়ে যায়, সেই ডগা তুলে এনে রোগীর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে দুই ভ্রূ মাঝখান পর্যন্ত লম্বা ক'রে 'শ্বাস ধরে' ছিঁড়ে নিয়ে 'বয়লা ভাঙিয়ে' হাতে পরিয়ে দিলে ঐ বয়লা যত শুকোয় ফোলাও তত কমে। শোথ রোগে এটি অত্যন্ত উপকারী।

কলার গাছ

শনিবার বা মঙ্গলবারে দয়াকলা গাছের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকের শিকড় 'শ্বাস ধরে' তুলে 'এক কর' পরিমিত শিকড় কেটে বা ছিঁড়ে নিয়ে শোথ রোগীর যে পাশ ফুলেছে তার বিছানার কাঁথার সেই পাশের সুতো দিয়ে শিকড়টি রোগীর বাঁ হাতে বেঁধে দিলে 'শোথ রোগ' নিরাময় হয়।

সাধারণত একাংগীন শোথেই এ ঔষধ কার্যকর হয়।

সাজিনার পাতা

সাজিনার কচি পাতা ভেজে দৈনিক দু'তিন বার ক'রে কয়েক দিন ভাতের সাথে মাখিয়ে খেলে 'শোথ রোগ' নিরামায় হয়।

৯০. **শূল বেদনা :** শূল বেদনা নানা রকম। নিম্নে এই রোগের কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

অপরাজিতা

দৈনিক সকালে সিকি তোলা পরিমাণ নীল অপরাজিতার মূল সামান্য মধু, চিনি ও ঘি সহ চিবিয়ে খেলে শূল বেদনা নিবারণ হয়। উদর শূলের পক্ষে এ ঔষধ উপযোগী।

ইন্দ্র যব

দৈনিক সকালে দুপুরে ও রাতে এক আনা পরিমাণ ইন্দ্র যবের গুঁড়ো মধুসহ কয়েকদিন সেবন ক'রলে শূল বেদনা নিরাময় হয়। উদর শূলেই এ ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মুথা

দুই তোলা পরিমাণ মুথার মূল আধ সের গরুর চোনার সঙ্গে জ্বাল দিয়ে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে রোজ সকালে এক তোলা পরিমাণে সেবন ক'রলে 'শূল বেদনা' আরোগ্য হয়।

হরিতকীর গুড়া

দৈনিক সকালে এক তোলা শুড়ের সঙ্গে সম পরিমাণ হরিতকীর গুড়ো মিশিয়ে এক সপ্তাহকাল সেবন করলে 'শূল বেদনা' আরোগ্য হয়।

৯১. **শ্লেষ্মা নিবারণ :** শ্লেষ্মাধিক্য দূর করার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ সমূহ প্রযোজ্য।

মালিশ

কাঁটা শেজির পাতার রস ও খাঁটি সরিষার তেল 'মেড়ে বুকে মালিশ ক'রলে শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়। (উক্ত রস বের ক'রতে হ'লে, শেজির পাতা আগুনের তাপে ধরতে হয়। পাতা লাল হ'য়ে উঠে। তারপর সেই পাতা চিপলে রস পাওয়া যায় এবং উক্ত রসই ব্যবহার্য)।

শেজির পাতার সেঁক

শেজির পাতায় খাঁটি সরিষার তেল মাখিয়ে আগুনের তাপে ঈষৎ গরম ক'রে বুকে সেঁক দিলে শ্লষ্মার প্রকোপ হ্রাস পায়।

মুথার মূল+গোল মরিচ

মুথার মূল ও সমপরিমাণ গোল মরিচের গুঁড়া একত্রে মিশিয়ে সেই গুঁড়া সিকি তোলা মাত্রায় দৈনিক তিন-চার বার মধুসহ সেবন ক'রলে শ্লেষ্মা-দোষ বিনষ্ট হয়।

৯২. সর্দি–কাশি : গ্রীষ্মপ্রধান ও বৃষ্টি বহুল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের সর্দি–কাশি লেগে থাকে। উক্ত সর্দি–কাশি নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করা হয়।

কাঁটান'টের ক্বাথ

কাঁটান'টের শুকনো গাছ এক তোলা, তিন–চারটা তেজপাতা, দশ–বারোটা গোল–মরিচ, দু'তিনটা পিপুল, কিছু দারুচিনি ও সামান্য মিশ্রী এক সঙ্গে আধ সের পানিতে সিদ্ধ ক'রে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ ক্বাথ এক ঝিনুক পরিমাণ দৈনিক তিন চার বার সেবন ক'রলে সর্দি–কাশির উপশম হয়।

নিমের ক্বাথ

প্রত্যহ সকালে এক ঝিনুক পরিমাণ নিমের ছালের ক্বাথ সেবন ক'রলে 'সর্দি–কাশি' নিরাময় হয়।

৯৩. সর্প–দংশন : সর্প–দংশন–চিকিৎসা অতিশয় শ্রমসাধ্য। অথচ এ চিকিৎসায় চিকিৎসকের অর্থ নেবার উপায় নেই। গুণীনরা যে ভাবে সর্প–দংশনের চিকিৎসা করেন, তার একটি খসড়া পরিচয় নিম্নে, দেওয়া হ'ল।

সর্প–দংশনের পর রোগীর নিকটাত্মীয় কেউ নিকটস্থ ওঝাকে খবর দেন এবং তাঁকে রোগীর নিকট নিয়ে আসেন। ওঝা এই খবর শুনেই রোগীর বিষ ঠেকিয়ে রাখার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নিজের অঙ্গে ধূলির 'তাগা' বাঁধেন। কিংবা নিজের কাপড়ের প্রান্তে সমন্ত্র গিঁঠ দেন। নিম্নে এরূপ একটি মন্ত্রের নমুনা দেওয়া হ'ল।

গিঁঠ মন্ত্র

ওপারে ধোপাজী কাপড় কাচে
পদ্মপত্রে নীর ঘষে
ও ধোপাজী তুমি আমার শিস
অঞ্চলের মোড়ায় বান্দিলাম বিষ॥

এই মন্ত্র একবার প'ড়ে কাপড়ের প্রান্তে গিঁঠ দিলে বিষ, ঐ সময় পর্যন্ত দংশিত ব্যক্তির যে পর্যন্ত উঠেছে, সেখানে থেকে যায়। তার উপরে আর উঠতে পারে না।

তারপর ওঝা রোগীর নিকট উপনীত হ'য়ে যে–স্থানে সাপে কামড়েছে, তার কিছু উপরে, পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে ধূলির, সুতার বা দড়ির 'তাগা' বাঁধেন। মন্ত্র সহযোগে এ কার্য সম্পন্ন করা হয়।

নিম্নে এরূপ কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হ'ল।

ধুলি মন্ত্র

ধুলোর মোড়নে বান্ধিলাম লাল
কাঁহা যাও বিষ কালমিকাল

হাড়ে মাংসে রক্তে নাহি সন্দি
জাতি কালকূট বিষ
তোরে করলাম বন্দী॥

এ মন্ত্রে ধূলা পড়ে সাপে যেখানে কামড়েছে, তার কিছু উপরে (অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বিষ উঠেছে ব'লে মনে করা যায়, তার উপরে) পূর্বোক্ত 'ধূলিতাগা' বাঁধতে হয়। তাহ'লে বিষ আর তার উপরে যেতে পারে না।

ডোর মন্ত্র

ধ্বলি ধ্বলি ধ্বলি সার
ধ্বলি ধ্বলি বিষ নাই আর
হাড়ে মাংসে ধ্বলি খাটে
ধ্বলি ধরিলে বিষ না উঠে॥

সর্প-দংশন করা মাত্র এই মন্ত্রে দংশিত স্থানের কিছু উপরে ডোর বাঁধতে হয়। তাহ'লে বিষ আর উপরে উঠতে পারে না।

মোড়ন মন্ত্র

ধনি বাঁধন ধান ফুলকা
ধনি বেঁধে গেলাম লঙ্কা
লঙ্কা থেকে দিলাম ডাক
যেইখানের ধনি সেইখানে যাক
কার আজ্ঞার—
দেবী মা মনসার আজ্ঞায়॥

সাপে কামড়াবার পর রোগীর বিষ কত উঠেছে তা পরীক্ষা করার পর সেই স্থানে এই মন্ত্রে দড়ি কিংবা বস্ত্রাদি দিয়ে মুচড়ে তাগা বাঁধলে বিষ আর উপরে উঠতে পারে না।

সূতা-বন্ধন মন্ত্র

ব্রহ্মা স্মরণে হরিলাম বিষ
নিরঞ্জন রাখিলেন বিষ॥
হাড়ির ঘরে বিষের মরণ।
মর বিষ ব্রহ্মা তাগায় পূরণ॥
কার আজ্ঞায়?
দেবদেব মহাদেবের আজ্ঞায়॥

সাত বা ন'কার (আঁশ) সূতা হাতে নিয়ে উপরে লিখিত মন্ত্র পড়ে তিন ফুঁ দিয়ে তিনটি গিঁঠ দিয়ে সুতোটি দংশিত স্থানের কিছু উপরে বেঁধে দিতে হয়। তাহলে বিষ আর উপরে যেতে পারে না।

চাড়া মন্ত্র

মা শ্মশান চণ্ডীর নামে
চাড়া গুঁজি বামে
অমুকের বিষ যদি আর ওঠে
মা মনসার ক'লজে ফাটে
কার আজ্ঞে–
তোর ভাতারের আজ্ঞে
শীগ্‌গীর নাইয়ে লাগগে॥

এ মন্ত্রটি যে খাতায় পেয়েছি–সে খাতায় ব্যবহার পদ্ধতি লিখিত ছিল না।

অবশ্য যথার্থই সাপে কামড়েছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে "গুণীন" বা ওঝা মন্ত্র দ্বারা 'হাত চালান' দিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকে। একার্যে 'তুলা রাশিওয়ালা' লোকের দরকার হয়। তেমন একজন লোককে সংগ্রহ করে তার ডান হাত মাটিতে উপুড় করে রেখে ওঝা নিজের হাতে ধুলি নিয়ে মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুলি অল্প অল্প করে ঐ ব্যক্তির হাতের পিঠের ওপর ফেলতে থাকে। মন্ত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলা ফেলা শেষ হলে, হাতটি সর্পদষ্ট রোগীর দংশন-স্থানের উপর দিয়ে যতদূর পর্যন্ত বিষ উঠেছে, তত দূর অবধি গিয়ে স্থির হয়। আর উপরের দিকে ওঠে না। একমাত্র বিষাক্ত সাপে কামড়ালেই এরূপ মন্ত্রপূত হাত চলে, অন্যথায় 'চালান দেওয়া হাত' (পোকা-মাকড়ের দংশন হ'লে) দংশিত স্থানে গিয়েই থেমে যায়। তার উপরে যায় না। ফলে গুণীন এবং দর্শকরা বুঝতে পারেন যে, লোকটি সর্পদিষ্ট হ'য়েছে কিনা।

এ রকম 'হাত চালান' দেবার একটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

হাত চালান মন্ত্র

চাল কাটে চালোয়ান কাটে।
আর কাটে চালায়োন রেক।
হাত চলিতে পবন চলে
চলেন মহাদেব॥
চলরে হাত শীঘ্র চল।
যদি না চলিস তাহ'লে
ভাদ্র মাসে যে তাল চুরি ক'রে
তার পোঁদতল দিয়া যাস॥
কার আজ্ঞে—
বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞে॥

তুলারাশিযুক্ত লোকের বাঁ হাত মাটিতে উপুড় ক'রে রেখে তার উপর এই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয় ; তাহ'লে হাত চলতে থাকে এবং বিষ যতদূর পর্যন্ত ওঠে হাতও ততদূর পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। তারপর বিষ নামাবার জন্য 'ঝাড়ন মন্ত্র' প্রযোজ্য।

ঝাড়বার সময় রোগীর বাম হাত বা বাম পায়ের (আহত স্থানের অবস্থান অনুযায়ী) কনিষ্ঠাংগুলিতে "মন্ত্রপূত' পাকানো সূতা বেঁধে দু'হাতের প্রথম দু'আঙ্গুলে লাগিয়ে কোমল অথচ দ্রুত গতিতে, মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বার বার টানতে হয়। একজন এমনি ভাবে সূতা টানে আর 'গুণীন' অফুলো আকছটি বা মেছাকের গাছ, কালধুতুরার গাছ কিংবা গামছা পাকিয়ে হাতে নিয়ে তা রোগীর দংশিত স্থানের উপর দিয়ে, উপর থেকে নীচের দিকে বুলিয়ে বুলিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝাড়তে এবং ফুঁ দিতে থাকে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি 'ঝাড়ন মন্ত্র' উল্লেখ করা হ'ল।

ঝাড়ন মন্ত্র–১

বোড়া সাপ ধোড়া সাপ
গোক্ষরা সাপ আদি
তাহাদের জননী মা মনসার বন্দি
তারপর বন্দি গো সেই ওঝা ধন্বন্তরী
যাহার দোহাইতে বিষ
যাবে বাপের বাড়ী।
শোন মা মনসা কানি
শিব তোমার কে—
আমি গোপন কথা ব'লে দেব
বিষ ঝেড়ে দে।
কামাখ্যার কালী মাতা রজঃস্বলা হয়
সেই রজঃ খাইতে তোমার যত সাপ ধায়
ত্রিভুবন ভরিয়া সাপ ফাঁক নাহি আর
এই বারের মত রক্ষা ক'রো
দোহাই তোমার—
কালো বিষ/সাদা বিষ/নীল বিষ/বলে—
সর্ববিষ নাশো মাগো
তোমার নগেন ব'লে।
কার আজ্ঞে
মনসার আজ্ঞে
শীগগীর যাইয়ে লাগ্‌গে
লাগ্‌গে
নেই বিষ
নেই বিষ
নেই বিষ
এই ত্রিভূবন খোদার দয়ায় নির্বিষ॥

ঝাড়ন মন্ত্র-২

বিষ ঝাড়ি, বিষ নামাই
কি সাপে দংশেছেরে লেখাই
যে যে সাপের দন্তে বিষ
করি করি নির্বিষ
যে বিষেতে অঙ্গ ছায়
ঘা মুখে লা'মে আয়
কার আজ্ঞে?
মনসার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে?
কালীর আজ্ঞে
অমুকের বিষ সাধিতে
শীগ্‌গীর লাগগে॥

ঝাড়ন মন্ত্র-৩

কোন শালা ক'রেছে রে দংশন
সেই সাপের মা-রে সেই
নিজে ক'রে রমণ
যদি আরও কিছু শুনতে না চাও
আল্লা নবীর নামে দূর হ'য়ে যাও
আছে বিষ?
নেই বিষ
গাজী জীবের দোয়ায়
নির্বিষ
নির্বিষ॥

প্রাপ্ত খাতায় এসব মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি লিখিত নেই।

এ ধরণের প্রচুর মন্ত্র আছে। এসব মন্ত্র দ্বারা ঝেড়ে ওঝা রোগীর শরীর থেকে বিষ নামিয়ে আনেন এবং রোগীকে নিরাময় করেন।

এ রকম চিকিৎসায় মন্ত্রাদির সঙ্গে লতা-গুল্মের ব্যবহারও আছে। নিম্নে মন্ত্রাদির সঙ্গে প্রযুক্ত দু'টি 'জাব' প্রয়োগের উল্লেখ করা হ'ল।

ধুতুরার শিকড়ের 'জাব'

কাল-ধুতুরা গাছের শিকড় বেঁটে সর্পদষ্ট রোগীর মাথা ব্লেড দিয়ে চিরে সেই স্থানে 'জাব' লাগালে এবং যেখানে দংশন ক'রেছে সেখানেও ঐ 'জাব' লাগালে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে রোগী আরোগ্য হয়। (মন্ত্র সহযোগে এ ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে দেখেছি)।

মহাসমুদ্রের গাছ

মহাসমুদ্রের গাছের পাতা, ছাল ও মূল একত্রে বেঁটে 'জাব' লাগালে সর্প-দষ্ট রোগীর "মন্দ-বিষ' বিনষ্ট হয় এবং ফোলা ও ব্যথা নিরাময় হয়।

স্বপ্নদোষ : 'স্বপ্নদোষ'-ধাতু দৌর্বল্যের পরিচায়ক। এ রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

অশ্বগন্ধার গুঁড়া+কাঁচা দুধ

দৈনিক রাতে শোবার সময় সিকি তোলা পরিমাণ অশ্বগন্ধার গুঁড়ো কাঁচা দুধের সাথে মিশিয়ে কিছুদিন যাবৎ সেবন ক'রলে 'স্বপ্নদোষ' সেরে যায় এবং শরীরে শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ইন্দ্রযব

প্রতিদিন রাতে শোবার সময় এক আনা পরিমাণ ইন্দ্রযবের গুঁড়ো ঠাণ্ডা পানিসহ কিছুদিন যাবৎ সেবন ক'রলে 'স্বপ্নদোষ' নিবারণ হয়।

৯৪. **সান্নিক :** 'সান্নিক' রোগ কর্ণপ্রদাহের-ই প্রকারভেদ। এই রোগ চিকিৎসার নানাবিধ লৌকিক পদ্ধতি ও ঔষধপত্র আছে। নিম্নে সান্নিক নিরাময়ের কয়েকটি ঔষধের উল্লেখ করা হ'ল।

দন্তি গাছের শিকড়

শনিবার বা মঙ্গলবারে বেলা পূর্ব দিকে থাকতে দন্তিগাছের শিকড় 'শ্বাসধরে' তুলে ঐ শিকড় কণ্ঠার উপর গলায় বেঁধে দিলে সান্নিকের অসুখ নিরাময় হয়।

(এই ঔষধ দেবার জন্য ওঝা বা ফকীর মাত্র "পাঁচ পয়সা জরিমানা" গ্রহণ ক'রতে পারে। আধিক নিলে ক্ষতি হয়।)

৯৫. **সুতিকা :** 'সুতিকা' মহিলাদের 'বাধক' রোগের মত এক প্রকার কঠিন ব্যাধি। এর দু'টি প্রকারভেদ আছে। শুকনো সুতিকা ও উদরাময় যুক্ত সুতিকা। নিম্নে সুতিকা রোগের ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

আপাং গাছের শিকড়

আপাং বা 'বিলেই হ্যাঁচড়া' গাছের পূর্ব দিকের শিকড় শনি-মঙ্গলবারে নিঃশ্বাস ধ'রে তুলে লোহার মাদুলিতে ভ'রে মাজায় বা কোমরে বেঁধে রাখলে সুতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

৯৬. **স্বপ্নে খাওয়া :** স্বপ্নে খাওয়া নিবারণমূলক নিম্নোক্ত চিকিৎসা উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্র

রক্তের দলা মাংসের দলা
অমুকের সঙ্গে

মহাদেবের সেটা
কোথায় কামড় দিবি বেটা ॥

এক গাছি নীল সুতা উক্ত মন্ত্রে এক নিঃশ্বাসে একবার পড়ে ফুঁ দিয়ে এক গিঁঠ এই নিয়মে একুশ বার প'ড়ে একুশ গিঠ দিয়ে সেটি রোগীর গলায় বা হাতে বেঁধে দিলে, স্বপ্নে ভক্ষণ বন্ধ হয়।

৯৭. **স্তন্য প্রদাহ :** দুগ্ধবতী রমণীর দুধের প্রদাহ বন্ধ হ'য়ে স্তন্য প্রদাহ হ'লে, তা' নানাভাব চিকিৎসা করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র

তুম্ব তুম্ব রামের ঝি
ফতে ব'সে ক'রো কি
চালতে গাছে দিয়ে পাও
ঝ্যানের তুম্ব সেনি যাও ॥

স্তনের ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে এই মন্ত্রে সাতবার ঝেড়ে ফুঁ দিলে এক দিনে তিন চার বার ঝাড়লে প্রদাহ ও ফোলা নিরাময় হয়। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

• ধুতুরার পাতার রস+গুঁড়া হলুদ

ধুতুরার পাতার রস আধা ঝিনুক এবং সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক সঙ্গে মিশিয়ে প্রদাহিত স্তনে লাগালে-স্তন্য প্রদাহ নিবারিত হয়। এ ঔষধ প্রত্যহ দু'তিনবার লাগাতে হয়।

ভেন্নার পাতার 'জাব'

ভেন্নার পাতা বেঁটে 'জাব' দিলে স্তনের প্রদাহ, ফোলা প্রভৃতি নিরাময় হয়।

৯৮. **স্ত্রী রোগ :** 'স্ত্রী রোগ' ব'লতে 'স্ত্রীলোকদের রোগ' তথা যৌনাঙ্গের রোগ বোঝায়। যৌনাংগ সংক্রান্ত নানা প্রকার রোগ এর অনুর্ভূক্ত। নিম্নে স্ত্রীরোগের ঔষধ-পরিচয় দেয়া হ'ল।

অশোকের 'ক্বাথ'

প্রত্যহ ভোরে বাসি পেটে এক ঝিনুক পরিমাণ অশোকের ক্বাথ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন ক'রলে-যাবতীয় 'স্ত্রী রোগ' আরোগ্য হয়।

কলাগাছের শিকড়

শনিবার বা মঙ্গলবারে দয়া কলা গাছের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকের শিকড় 'শ্বাস ধরে' তুলে 'এক কর' পরিমাণ কেটে বা ছিঁড়ে নিয়ে, রোগীর বিছানার সুতো দিয়ে বেঁধে মাদুলিতে

ভ'রে কোমরে ধারণ ক'রলে স্ত্রী–রোগ বিশেষত প্রমেহ, যৌনাঙ্গের টাটানি, যন্ত্রণা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবপাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

(পুরুষ রোগীকে এ ঔষধ দেওয়া যায়।)

ডালিম গাছ

ডালিম গাছের ছাল ভিজিয়ে রেখে সেই পানি দিয়ে প্রতিদিন যৌনাঙ্গ ধৌত করলে–যোনিমুখের যাবতীয় রোগ নিরাময় হয় এবং যোনিমুখের প্রসারতা ক'মে গিয়ে তা' কুমারীত্ব লাভ করে। এ ঔষধ মাসাধিক কাল নিয়মিত ব্যবহার্য।

৯৯. হজম শক্তি বৃদ্ধি : অগ্নিমান্দ্য দূর করে হজম শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নানাবিধ লোকৌষধ ব্যবহার করা হয়। নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করা হল।

আদা+লবণ

কাঁচা আদা লবণসহ চিবিয়ে খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমলকী

কাঁচা আমলকী চিবিয়ে খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পাথর কুচির পাতা+লবণ

পাথর কুচির পাতা লবণসহ চিবিয়ে খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে।

ধুতরার বীজ

এক থেকে চারটা ধুতরার বীজদানা গুঁড়ো করে ঠাণ্ডা পানির সাথে পান করলে হজম শক্তি বাড়ে।

হরিতকী+লবণ

কাঁচা হরিতকী লবণসহ চিবিয়ে খেলে হজম শক্তি উন্নত হয়।

১০০. হাঁফানি : 'হাঁফানি' একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু কোন কোন লোকৌষধে এ রোগ অতি সুন্দরভাবে আরোগ্য হয়। নিম্নে 'হাঁফানি'র কতিপয় ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

আকন্দর ছালের গুঁড়া

আকন্দের শিকড়ের ছাল গুঁড়ো করে তাতে আকন্দের আঁঠা মাখিয়ে শুকিয়ে তামাকের মত তার ধূমপান করলে হাঁফানি এবং হাঁফানি-কাশি আরোগ্য হয়। দৈনিক দু'তিনবার করে এক থেকে ছ' সপ্তাহ এরূপে ধূমপান করা আবশ্যক।

অশ্বগন্ধার ক্কাথ

অশ্বগন্ধার ক্কাথ, ঘি ও মধু প্রতিদিন সকালে একবার করে এক চামচ পরিমাণ এক থেকে তিন সপ্তাহ সেবন করলে হাঁফানি, ও হাঁফানি কাশি নিরাময় হয়।

আকন্দ গাছ+সাদা চন্দন+গোলমরিচ

শীষ আকন্দ গাছের পূর্ব দিকে, পশ্চিম মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে, 'শ্বাস ধ'রে' একটানে গাছটা তুলে, তার শিকড় পানি দিয়ে বেঁটে রস বানাতে হবে। তারপর পানি দিয়ে সাদা চন্দন ঘ'ষে মিশিয়ে উভয় বস্তু এক পোয়া পরিমাণ বানাতে হবে। অতপর মিশ্রিত দ্রব্যের সঙ্গে একুশটা গোল-মরিচ বেঁটে গুঁড়ো ক'রে মিশিয়ে-বেলা পূর্ব দিকে থাকতে ঐ দ্রব্য এক চুমুক মাত্র খেতে হবে। তা'হলেই হাঁফানি নিরাময় হবে। এ ঔষধ একবার এক চুমুকই মাত্র সেব্য।

ঔষধ খাবার পর একুশ দিন গরুর মাংস, পচা মাছ, গজাল মাছ, বাউস মাছ এবং শাকপাতা খাওয়া নিষেধ। সেই সঙ্গে পাঁচ পয়সার 'সিন্নি' কিনে জুমার ঘরে দিতে হ'বে। ফকীর বা ওঝা রোগীর নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক বা অর্থ গ্রহণ ক'রতে পারবে না।

জগডুমুর গাছ

জগডুমুরের কচি আগা সাতটি ও আকছটির গাছের কচি আগা সাতটি সামান্য লবণ সহযোগে বেঁটে রস করে-সেই রস আধ ঝিনুক পরিমাণে প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে কয়েকদিন খাওয়ালে হাঁফানি নিরাময় হয়। হাঁফানি কঠিন হ'লে, এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বর্ণসিন্দুর যোগ করা চলে।

ধুতুরার ফল

অতিশয় শুকনো ধুতুরার ফল পুড়িয়ে তার ধূম নাকে টানলে হাঁফানি, শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি দূর হয়।

ধুতুরার পাতা

ধুতুরার পাতা শুকিয়ে সেই পাতা দিয়ে তামাক সহযোগে বিড়ি বানিয়ে ধূমপান ক'রলে হাঁফানি আরোগ্য হয়। ঐ পাতা কলিকায় পুঁড়িয়ে ধূমপান ক'রলেও হাঁফানি আরোগ্য হয়

১০১. হাম জ্বর ঃ শিশুদের 'হাম' উঠলে উক্ত রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

করলার পাতার রস+কাঁচা হলুদ

করলার পাতা ছেঁচে রস করে তার সঙ্গে সমপরিমাণ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে আধ ঝিনুক পরিমিত প্রতিদিন সকালে খাওয়ালে 'হাম জ্বর' আরোগ্য হয়।

কলমী শাকের রস

'হাম' কোন কারণে লাট খেয়ে বসে গেলে কলমী শাকের রস সামান্য পরিমাণে দিনে দু'বার সেবান করালে, উদ্ভেদ বেরিয়ে হাম জ্বর শীঘ্র নিরাময় হয়।

তুলসী পাতার রস+আদার রস

হামের উদ্ভেদ ঠিক মত বেরোতে না পেরে জটিলতার সৃষ্টি হ'লে তুলসী পাতার রস ও সমপরিমাণ আদার রস সিকি ঝিনুক থেকে এক ঝিনুক পরিমাণ দিনে দু'বার করে কয়েক দিন সেবন করালে উদ্ভেদ বেরিয়ে 'হাম' শীঘ্র নিরাময় হয়।

১০২. হাড় ভাঙা : হাড় ভেঙে গেলে তা' চিকিৎসা হওয়া কঠিন। শল্য চিকিৎসা ব্যতীত যে এর আর কোন চিকিৎসা থাকতে পারে তা' পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণা করাও সম্ভব নয়। অথচ এদেশে 'হাড় ভাঙা' চিকিৎসার বহু বিস্ময়কর লৌকিক ঔষধ বিদ্যমান। নিম্নে সেসব ঔষধের কিছু কিছু উল্লেখ করা হ'ল।

মন্ত্র-১

অংগমনি অংগচুর
অংগ অসুর
আমার শুষ্ক কাষ্ঠে
কবে আংগুর
ফোটে ফুল।
আউলিয়ার দোহায়
গওস কুতুব।

(খাতায় মন্ত্রটির প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ নেই।)

মন্ত্র-২

শার শোর মনি মগজ
পঞ্চ খোয়াজের নামের আওজ

মরা বৃক্ষ হ'ল তাজা
মেলে পাতা
দোহাই আল্লা
দোহাই আল্লা॥

১০০০ বার। সম্ভবত এই মন্ত্র এক হাজার বার প'ড়ে ফুঁক দিতে হবে। এটি 'পানি পড়ার মন্ত্র' না 'ঝাড়ন মন্ত্র' তা স্পষ্ট লেখা নেই। সম্ভবত এটি পানি পড়ার মন্ত্র, ঝাড়ন মন্ত্র নয়।

অর্জুন বৃক্ষের ছাল+রসুন

কোন স্থানের হাড় ভেঙে গেলে অর্জুনের কাঁচা ছাল ও সমপরিমাণ রসুন বেঁটে প্রলেপ লাগিয়ে বেঁধে রাখলে 'ভাঙা হাড়' জোড়া লাগে এবং রোগী নিরাময় হয়।

হাড় ভাঙার 'জাব'

পঞ্চপত্র বিশিষ্ট হাড় ভাঙার লতা গাছ তুলে এনে গরুর দুধ দিয়ে বেঁটে 'জাব' তৈরি ক'রে সেই 'জাব' ভাঙা জায়গায় লাগিয়ে দিলে এক থেকে তিন সপ্তাহের অতি চূর্ণবিচূর্ণ হাড়ও জোড়া লেগে যায়। এই 'জাব' তৈরির সময় দুধের মধ্যে কিম্বা পাটানোড়ায় 'বিন্দু' মাত্র পানি থাকলে রোগীর আক্রান্ত স্থান পঁচতে শুধু ক'রবে। আর 'জাব' দেবার পর কাঁচা দুধ দিয়ে মাঝে মাঝে 'জাব' ভিজিয়ে দিতে হবে অন্যথায় রোগী তীব্র যন্ত্রণার জন্য 'জাব' রাখতে পারবে না। (পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ)।

(এই 'জাব' ছাগল ব্যতীত অন্যান্য পশুপক্ষীকেও দেওয়া চলে।)

টোপলা

(যশোর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত নড়াইল থানার আদমপুর গ্রামের ডাক্তার ইব্রাহীমের বংশধরগণ হাড় ভাঙার এক রকম অদ্ভুত 'টোপলা' দিয়ে থাকে। যেখানে যে রকমেই হাড় ভাঙুক না কেন ঐ টোপলা এক গাছি শনের সূতা দ্বারা পেঁচিয়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিতে হয়। যে এই টোপলা বাঁধে তার সাথে রোগীর পনের দিনের মধ্যে যেন দেখা না হয়। এই টোপলা অত্যন্ত কার্যকর। লেখকের বৃদ্ধা মাতা ও শিশু কন্যার আঘাত লেগে 'ক্লাডিক্যাল বোন' ভেজে যায় (পি.জি.ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে এক্স-রে ক'রে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল)। তারপর এই টোপলায় তারা উভয়েই আরোগ্য হ'য়েছে। একটি টোপলায় সাতটি' রোগী পরপর আরোগ্য হ'তে পারে। প্রতি বারে শুধু ঐ শণের সুতা ব'দলে দিতে হয়।

মানুষ ব্যতীত পশুপক্ষীও এ টোপলায় আরোগ্য হয়। চিকিৎসা ক'রে রোগীর নিকট থেকে টাকা নেওয়া যায় না-নিষেধ।)

বর্তমান গ্রন্থ-ধৃত ঔষধির বৈজ্ঞানিক নাম-পরিচয়

'বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা'য় যে সব গাছ-গাছড়া ও লতা-গুল্মের তথা ঔষধির ব্যবস্থার সম্পর্কে 'ঔষধ-কোষ' এ উল্লেখ করা হ'য়েছে—তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। কেননা, বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণী-বিন্যস্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম-পরিচয় ব্যতীত কোন ঔষধিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের পক্ষেও ঐসব গাছ সম্পর্কে ধারণা জন্মে না। লোক-চিকিৎসক ও গ্রাম্য অশিক্ষিত জনগণ লোক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধসমূহের যে লৌকিক ধারণা নাম নির্দেশ ক'রেন, তার সঙ্গে দেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের প্রায়শ : কোন সংযোগ না থাকায় ঐসব নাম পরবর্তী গবেষণার জন্য আদৌ সহায়ক নয়। ঐসব লৌকিক ঔষধি-নামের অধিকাংশই আঞ্চলিক। একই ঔষধি ভাষা ও অঞ্চলভেদে নানা নামে পরিচিত। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণ এদেশের বৃক্ষলতাদির এসব লৌকিক নাম-পরিচয় গ্রহণের আদৌ প্রয়াসী নন। ফলে, কোন রচনাতেই লতাবৃক্ষাদির লোক-নাম পরিচয় বিবৃত হয়নি।

পর্যবেক্ষণ ক'রলে দেখা যায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থে কিংবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত এদেশের 'বনজ-ঔষধি', 'ভেষজ উদ্ভিদ' প্রভৃতির তালিকায় সংস্কৃত নাম, শুদ্ধ বাংলা নাম, সংস্কৃত ইংরেজী ও বাংলা বানানে লেখা। কোন কোন গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাদেশিক ভাষা-নামও উল্লেখ করা হ'য়েছে। কিন্তু ঐসব ঔষধির বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলা ভাষাতেই যে কত লৌকিক নাম ভেদ র'য়েছে—তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ কোথাও করা হয়নি। ফলে, বর্তমান রচনায় যশোর জেলায় প্রচলিত কিছু সংখ্যক ঔষধির লোক-নামের পাশাপাশি শুদ্ধ নামের পরিচয় লাভ ক'রতে না পারায় সেগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র পরিচয় দানে বিরত থাকতে হ'য়েছে। আনুমানিক কোন নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। নিম্নোক্ত সাতটি রচনার উপর নির্ভর ক'রে বক্ষ্যমান রচনায় ঔষধিসমূহের বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও গোত্র পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে।

১. উদয়চাঁদ দত্ত কর্তৃক লিখিত 'দি মেটেরিয়া মেডিকা অব দি হিন্দুস' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত জর্জ কিং-এর 'এ গ্লোসারি অব ইণ্ডিয়ান প্লান্টস'। ১৯২২ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সংশোধিত সংস্করণ।

২. অসীমা চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'ভারতের বনৌষধি'। ১৯৪৬ সালে (বাংলা ১৩৫৩ সাল) বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজে প্রকাশিত।

৩. এ. আলীম লিখিত 'ঔষধির চাষ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। রচনাটি শাহ ফজলুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৫৭ সালের 'বিজ্ঞান বিচিত্রা',-১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪. ড: দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী রচিত 'ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ'।কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত।

৫. ড: কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ প্রণীত 'ভারতীয় বনৌষধি'—১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড। ১৯৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬. ড: এবনে গোলাম সামাদ-কৃত 'উদ্ভিদ সমীক্ষা'। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

৭. আচার্য্য শিবকালী ভট্টাচার্য-রচিত 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'—১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড। কলিকাতার আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত যথাক্রমে তৃতীয় মুদ্রণ (১৩৮৪/১৯৭৭), দ্বিতীয় মুদ্রণ (১৯৭৯), প্রথম সংস্করণ (১৯৭৮)।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কিং-এর গ্লোসারি-তে ঔষধিসমূহের নাম পরিচয় তিনটি স্তম্ভে দেওয়া হ'য়েছে। কিং প্রথম স্তম্ভে প্রথম ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত নাম, তার নিম্নে সংস্কৃত অক্ষরে ঐ নাম, দ্বিতীয় স্তম্ভে ইংরেজী অক্ষরে দেশীয় শুদ্ধ নাম এবং তৃতীয় স্তম্ভে তৎকালীন উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম উল্লেখ ক'রেছেন। কোন ঔষধির-ই গোত্র-নাম এবং ব্যবহার্য অংশের পরিচয় দান ক'রেননি। অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'ভারতের বনৌষধিতে' অত্যল্প কয়েকটি উদ্ভিদের প্রকৃত পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথম শুদ্ধ বাংলা নাম ও তারপর বন্ধনী মধ্যে ইংরেজী ভাষায় উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও গোত্র পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লোক-চিকিৎসায় ব্যবহার্য এসব উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অংশেরও উল্লেখ ক'রেছেন। এ আলীম লিখিত প্রবন্ধে ঔষধি-সমূহের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে শুদ্ধ একটি মাত্র বাংলা নাম, তারপর ইংরেজী ভাষায় উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও শেষে ঐ উদ্ভিদের ব্যবহার্য অংশের বিবরণ দিয়েছেন। ড: চক্রবর্তীর 'ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতেও অল্প সংখ্যক উদ্ভিদের বিবরণ বিধৃত। তিনি আলোচিত বৃক্ষলতার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও ঐসব উদ্ভিদের প্রত্যেকটির-ই গোত্র নাম নির্দেশ ক'রেছেন। 'চিরঞ্জীব বনৌষধিতে' সমস্ত ঔষধির উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম-পরিচয় থাকলেও গোত্র-পরিচয় নেই। একমাত্র ড: এবনে গোলাম সামাদ-এর 'উদ্ভিদ সমীক্ষা'য় এবং কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ-এর 'ভারতীয় বনৌষধি'তে প্রত্যেকটি উদ্ভিদের শুদ্ধ বাংলা নাম উদ্ভিদ বিজ্ঞান-সম্মত ইংরেজী নাম এবং গোত্র-পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমান তালিকায় লিখিত যেসব ঔষধির গোত্র-পরিচয় কিংবা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও পরিবার-পরিচয় উক্ত সহায়ক রচনাবলীতে পাওয়া যায়নি, সেগুলোর শুধু লোক-নাম ও ব্যবহার্য অংশের পরিচয় প্রদান করা হ'য়েছে।

সর্বশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন কোন ভেষজের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম-পরিচয়ে 'ভারতীয় বনৌষধি', 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' ও উদ্ভিদ' সমীক্ষা'য় অভিন্নতি দেখা যায়নি। এরকম ক্ষেত্রে, যেখানে সঠিক নাম স্থির করা যায়নি, সেখানে প্রস্তুত তালিকায় গৃহীত নামের পূর্বে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হ'য়েছে। আর যেসব স্থানে লৌকিক নামের পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধনামের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে সে সব স্থানে শুদ্ধনামের পরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হ'য়েছে। ঔষধিটির নাম-পরিচয় প্রদত্ত হ'য়েছে এই প্রশ্নবোধক শুদ্ধ নামটি ধ'রেই।

আলোচ্য তালিকায় প্রদত্ত ভেষজ বিবরণীতে ঔষধিসমূহের অধিকাংশের-ই ক্ষেত্রে, যশোর জেলায় প্রচলিত লোক-নামের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। একটি উদ্ভিদের সমগ্র প্রাসংগিক পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে—পাঁচটি স্তম্ভে। আনুক্রমিকভাবে এই পাঁচটি স্তম্ভের শিরোনাম যথাক্রমে—লোক-নাম, শুদ্ধ নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র নাম, ও ব্যবহার্য অংশ। তালিকাটিকে যথাসম্ভব আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াস সর্বত্রই লক্ষণীয়।

ভেষজ বিবরণী

সংখ্যা	লোক নাম	শুদ্ধ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র নাম	ব্যবহার্য অংশ
১	অর্জুন	অর্জুন	Terminalia arjuna, W. & A.	Combretaceae	ছাল, ছালসিদ্ধ পানি।
২	অনন্তমূল	অনন্তমূল	Hemidesmus indicus R. Br.	Asclepiadaceae	মূল, মূলসিদ্ধ পানি।
৩	অপরাজিতা	অপরাজিতা	Clitoria terntea, Linn.	Papilionaceae,	মূল, পাতা।
৪	অশোক	অশোক	Saraca indica Linn,	Caesalpiniceae	ছাল, বীজ, ক্বাথ।
৫	অশ্বগন্ধা	অশ্বগন্ধা	Withania somminifera , Dunal.	Solanaceae,	গুঁড়া, ক্বাথ।
৬	আকন্দ গাছ	আকন্দ গাছ	Calotropis gigantea R.Br.	Asclepiadaceae	মূল, মূলের ছাল, গাছ, গাছের ছাল, ডগা, আঠা, ফুল, পাতা, পাতাসিদ্ধ পানি।
৭	আকান্দি লতা	নিমুখো (?)	Cocculus hirsutus, (Linn) Diels.	Menispermacea	লতা, পাতা, ডগা।
৮	আঁখ	ইক্ষু	Saccharum Officinarum, Linn.	Gramineae,	(কাণ্ডের রসজাত চিনি)।
৯	আতা	শরীফা (?)	Annona Squamosa, Linn.	Annonaceae,	পাতা, বীজের শাঁশ।
১০	আদা	আর্দ্রক	Zingiber fficinaulis, Rosc.	Zingiberaceae,	গাছের মূল।

১১	আনারস	আনারস	Annanas sativus, Schutt. f.	Bromilia ceae,	ফল, ডগার মূল।
১২	আপাং	অপামার্গ	Achyranthes aspera Linn.	Amarantaceae,	মূল, গাছ, গাছের ছাই, পাতা, বীজ।
১৩	আফিম	অহিফেন	Papaver somniferun Linn.	Papaveraceae,	ফুল।
১৪	আম গাছ	আম্র বৃক্ষ	Mangifera indica Linn.	Anacardiaceae,	ডাল, ছাল, আঁঠা।
১৫	আমরুলি শাক	আমরুল	Oxalis corniculata Linn.	Oxalidaceae,	(সমগ্র অংশ)।
১৬	আমলকি গাছ	আমলকি	Emblica officinalis Gaertn,	Euphorbiaceae,	ফল, বীজ।
১৭	আলকুশি	আলকশি, আলকুশি লতা (?)	Mucvna Prurita, Hook.	Leguminosaceae.	মূল, পাতা, বীজের শাঁস।
১৮	আষ্টলি গাছ				গাছ, গোঁড়ার ছত্রাক, ডগা, মঞ্জুরী।
১৯	অ্যালাচি	লবলী (?)	Phyllanthus distichus Muell-Arg.	Euphorbiaceae,	পাতা।
২০	উস্তে	উচ্ছে	Momordica Muricata, Linn.	Cucurbitaceae,	পাতা, ফল।
২১	উলট কম্বল	ওলট কম্বল	Abroma augusta Linn, f.	Sterculiacae	মূল ডগা।
২২	উলু খড়	উলু খড়	Imperata arundinacea, Cyrill,	Gramineae,	মূল।

২৩	কচা গাছ	জিয়ল গাছ	Odina woodier, Roxb.	Anacardiaceae,	মূল, আঁঠা।
২৪	কচু গাছ	কচু গাছ	Colocasia antiquorm schott.	Araceae,	ডগা।
২৫	কচুরি পানা	কচুরি পানা	Hyacinthus, orientalis, R. Br.	Salviniceae,	(সমগ্র অংশ)।
২৬	কদম গাছ	কদম্ব গাছ	Anthocephalus cadamba Miq.	Rubiaceae,	ছাল।
২৭	কদু গাছ	লাউ, অলাবু	Lagenaria vulgaris Seringe.	Gucurbitaceae,	পাতা।
২৮	করবী গাছ	রক্তকারী করবীরক	Nerium indicum, Mill	Apocynaceae.	মূল, পাতা, আঁঠা।
২৯	করলা	করবেল্লক	Momordica charantea Linn.	Cucurbitaceae,	পাতা।
৩০	কর্পূর গাছ	কর্পূর গাছ	Cinnamomum glandu-liferum, Meissn	Lauraceae,	আঁঠা।
৩১	কলমী লতা	কলমী লতা	Ipomoea Reptans, (Linn) poir	Convolvulaceae	ডগা, লতা, পাতা।
৩২	কলা গাছ	কদলী বৃক্ষ	Musa paradisiaca Linn, Var. sapientum Kuntz.	Musaceae,	মূল, ডগা, ফল, ফুল, পাতা।
৩৩	কল্পনাথ	কালমেঘ (?)	Andrographis Paniculata, Nees	Acanthaceae	পাতা, ডগা।

৩৪	কাইয়ো ঝাঙা	কাক জম্বু (?)	Syzygium fruticosa, Skeels (?)	Myrtaceae (?),	পাতা।
৩৫	কাগজি লেবুর গাছ	কাগজি লেবুর গাছ	Citrus medica, Linn var, Acida.	Rutaceae,	ফল, পাতা।
৩৬	কাঁটা নটে	কন্টিকারি	Amaranthus spinosus, Linn.	Amaraneceae.	মূল, গাছ, বীজ পাতা।
৩৭	কাঁটা কুমোরে	কাঁটা কুমুরিয়া			মূল, পাতা, লতা।
৩৮	কাঁটা সেজি	সেজ (?)	Lantana camara Linn.	Verbenaceae,	পাতা, কষ।
৩৯	কাপাস	কার্পাস	Gossypium herbaceum Linn.	Malvaceae,	পাতা, বীজ।
৪০	কালকাসুন্দা	ছোট কালকাসুন্দা	Cassiasophe a, Linn.	Leguminoceae,	গাছ, পাতা।
৪১	কালজিরা	কৃষ্ণ জিরা	Nigella sativa Linn	Ranunculaceae,	ফল।
৪২	কুকুর শোঁকা	কুকুশিমা	Blumea lacera, Linn.	Serophulariace ae (?)	পাতা।
৪৩	কুঁজির গাছ	গুঞ্জা লতা	Abrus precatorius Linn.	Papilionaceae,	মূল, গাছ, পাতা, ফল।
৪৪	কুটরাজ				ছাল।
৪৫	কুড়চী	কুরচি	Holarrhena antidysenteri ca Wall.	Apocynaceae	গাছ, বীজ ক্বাথ
৪৬	কেশুখে	কেশুত্তি	Eolipta albd, Linn (?)	Compositae.	(সমগ্র অংশ)।
৪৭	কৈ উড়া	(?)	Asteracantha Longifolia, Nees,	Acanthaceae,	গাছ, পাতা।
৪৮	খয়ের গাছ	খদির বৃক্ষ	Acacia catachu willd	Mimoseae,	খয়ের।

৪৯	খেজুর গাছ	খর্জুর বৃক্ষ	Phoeniz sylvestis Roxb.	Palmae,	মূল, রস।
৫০	গন্ধ ভাদলে	গন্ধ-ভাদুলে	Paederia foetida Linn.	Rubiaceae,	(সমগ্র অংশ)।
৫১	গাঁদা ফুল গাছ	গাঁদা ফুল গাছ	Tagetes erecta Linn.	Compositae,	পাতা।
৫২	গাব গাছ	তিন্দুক	Diospyrod peregrina Gurice,	Elenaceae,	ছাল, ফল।
৫৩	গিমা শাক	গিমে শাক	Mollugo pentaphylla, Linn.	Ficoideae.	(সমগ্র অংশ)।
৫৪	গুলঞ্চ লতা	গুড়বূচী	Tinnospora cordifolia, (willd) Meirs.	Menispermaceae.	লতা, পাতা।
৫৫	গোল মরিচ	গোল মরিচ	Piper nigram, Linn.	Piperaceae.	ফল।
৫৬	গোয়ালে লতা	গোয়ালে লতা	Caytatia pedata (Wall) Gagnep.	Vitaceae.	পাতা।
৫৭	ঘৃতকুমারী	ঘৃতকুমারী	Aloe vera, Tourn ex. Linn.	Liliaceae.	পাতার শাঁস।
৫৮	চন্দন	শ্বেত-চন্দন	Santalum album Linn.	Santalaceae.	গাছ।
৫৯	চিরতা	চিরতা	Swertia chirata Buch—Ham.	Gentianaceae.	মূল, ছাল, পাতা।
৬০	ছোট চান্দা	সর্পগন্ধা	Rauwolfia serpentina, Benth.	Apocynaceae.	মূল।
৬১	ছোলা	ছোলা, চনক	Cicer arietinum Linn.	Papitionaceae	ফল।

৬২	জগডুমুর	যজ্ঞডম্বর	Ficus racimosa, Linn.	Moraceae.	ফল, ডগা।
৬৩	জবা	জবা	Hibiscus rosa-sinensis, Linn.	Malvaceae.	ফুল।
৬৪	জাম গাছ	জম্বু গাছ	Eugenia jambolana, Linn.	Myrtaceae	পাতা, বীজ।
৬৫	জোয়ান	জোয়ান	Carum copticul Benth & Hook f.	Umbellifereae.	ফল।
৬৬	ঝাঁপি টেপারি	বন টেপারি (?)	Physalis minima Linn.	Solanaceae,	ডগা, পাতা, ফুল।
৬৭	টাইম ফুল				আগা।
৬৮	টোপা শ্যালা	টোকা পানা (?)	Pistia stratiotes Linn.	Araceae.	(সমগ্র অংশ)।
৬৯	ডালিম গাছ	ডালিমগাছ	Punica granatum Linn.	Lythraceae.	মূল, ছাল, পাতা, ফুল।
৭০	তাল গাছ	তালি গাছ	Borassus flabellifer Linn.	Palmeae.	ডগা।
৭১	তিল গাছ	তিল গাছ	Sesamum indicum, Linn	Pedaliaceae.	পাতা, ফল, তেল।
৭২	তেজ পাতা	তেজ পত্র	Cinnamoum tamala, Nees & Eberm.	Lauraceae.	পাতা।
৭৩	তেঁতুল গাছ	তেঁতুল বৃক্ষ	Tamarindus indica, Linn. (?)	Caesalpiniceae	ফল, পাতা।

৭৪	তেলাকুচা	বিম্বী	Coccinia cordifolia Cogn.	Cucurbiaceae.	মূল, পাতা।
৭৫	তুলসী গাছ	তুলসী গাছ	Ocimum sanctum, Linn.	Labiatae.	মূল, পাতা।
৭৬	থানকুনি শাক	থুলকুড়ি	Hydrocotyle asiatica, Linn.	Umbelliferae,	(সমগ্র অংশ)।
৭৭	দন্তি গাছ	দন্তি গাছ	Baliospermum, Oxillare		মূল।
৭৮	দানব চেতান		montanum		ডাল, পাতা।
৭৯	দূর্বা ঘাস	দুর্বা ঘাস	Cynodon dactylon (Linn) Pers.	Gramineae.	মূল, পাতা, ডগা।
৮০	দৈয়ে খৈয়ে		Pers.		আগা।
৮১	ধান	ধান্য	oriza sativa, Linn.	Gramineae.	ফল, খোসা, বীজ।
৮২	ধুতরো	কাল ধুতুরা (?)	Datura metal, Linn.	Solanaceae,	মূল, পাতা, ফল, বীজ
৮৩	ধুনে,	ধনিয়া	Coriandrum sativu, Linn	Umbelliferae.	পাতা।
৮৪	নাটা গাছ	নাটা গাছ	Caesalpinia crista, Linn.	Caesalpiniaceae.	আগা, ফল।
৮৫	নারকেল গাছ	নারিকেল গাছ	Cocos mucifera, Linn.	Palmae.	তেল, ফুল, ফল।
৮৬	নারলি গাছ				ডগা, পাতা।
৮৭	নির্বিষ গাছ	নির্বিষ গাছ	Delphinium denudtum, Wall.	Ranunculaceae,	মূল।
৮৮	নিম গাছ	নিম্ব বৃক্ষ	Melia Azadirachta, Linn.	Meliaceae.	ছাল, পাতা।
৮৯	পলাশ	পলাশ (?)	Butea frondosa, Roxb.	Papilionaceae.	বীজ।

৯০	পাকুড় গাছ	অশত্থ	Ficus religiosa, Linn.	Moraceae,	মূল, ছাল, ডগা, পাতা সিদ্ধ পানি।
৯১	পাট গাছ	পাট গাছ	Carchorus capsularis, Linn.	Titiaceae.	পাতা, আঁশ।
৯২	পাথরচুনি	পাথর কুচি	Bryophulum, calycinum, salisb.	Crasulaceae,	পাতা।
৯৩	পান, লতা	তাম্বুল (?)	Piper bettle limk.	Piperaceae.	(সমগ্র অংশ)।
৯৪	পালটে মাঁদার	পলতে মাঁদার	Erythrina indica, Lamk.	Papilionaceae	ছাল।
৯৫	পেঁপে	পেঁপে	Carica Papaya, Linn.	Caricaceae	ফল।
৯৬	পেঁপুল লতা	পিঁপল	Piper longum	Piperaceae.	(সমগ্র অংশ)।
৯৭	পেপলশী গাছ	কাজ পিপল (?)	Scindapsus officinalis Schott.	Araceae.	পাতা।
৯৮	পেঁয়াজ	পেঁয়াজ	Allium cepa Linn.	Liliaceae.	মূল।
৯৯	পোটল	পটোল পলতা	Trichosanthes dioica Roxb.	Cucurbitaceae.	লতা, পাতা।
১০০	বচ	শ্বেত বচ	Acorus calamus, Linn.	Araceae	ফল।
১০১	বট গাছ	ন্যাগ্রোধ, বট বৃক্ষ	Ficus bengalenss Linn.	Urticaceae	আঁঠা, ডগা।
১০২	বন স'তে				

১০৩	বন্যে গাছ	পিঠালু, লাটু, লাটিম, পিঠালী, বাটুল ইত্যাদি	trewia nudiflora, Linn.	Euphorbiaceae,	পাতা।
১০৪	বয়ড়া	বহেড়া, বড়া গাছ	Terminalia belerica, Roxb.	Combretaceae.	ফল, ফলের শাঁস।
১০৫	বাইডলন গাছ				
১০৬	বাওস গাছ	বাসক গাছ	Adhatoda vasica, Nees.	Acanthaceae,	পাতা।
১০৭	বাবরা গাছ	বাবলা গাছ	Acacia arabica, Willd.	Mimoseae	পাতা।
১০৮	বাঁশ (ভালকো)	বংশ	Bombusa balcooa Roxb.	Gramineae.	ত্বকের নীল।
১০৯	বনা ঘাস	বেনা ঘাস,	Vetiveria zizamioides (Linn) Nash.	Gramineae,	মূল।
১১০	বেল গাছ	বিল্ব বৃক্ষ	Aegle marmelos Corr.	rutaceae.	পাতা, ফল।
১১১	বেড়েলা	বেড়েলা	Sida Stipulate, Linn.	Malvaceae.	মূল, আগা।
১১২	বোরোই	কুল	Zizyphus jujuba, (Linn) Lamk.	Rhamnaceae.	ফল, বীজ।
১১৩	বুঁজ				পাতা।
১১৪	বুড়ি পান				পাতা।
১১৫	বিরেটি (বিলেতী বেগুন)	প্রসহা, বৃহতী	Solanum khasianum, Linn.	Solanaceae.	মূল।

১১৬	বিষ কাঁটালি				(সমগ্র অংশ)।
১১৭	বিষরাজ				ঐ
১১৮	বাথুলা ঘাস				ঐ
১১৯	ভাঁটির গাছ	ফাঁটি পাতা, ভাঁট, ঘটু গাছ	Clerodendrum Viscosum, Linn.	Verbenaceae.	পাতা।
১২০	ভ্যান্না গাছ	এরন্ড, ভেরেণ্ডা, বেড়ির গাছ	Ricinus Communis, Linn.	Euphorbiaceae	তেল, বীজ, পাতা।
১২১	ম'রচে গাছ				(সমগ্র অংশ)।
১২২	মহাসমুদ্রের গাছ				মূল।
১২৩	মাকাল লতা	মাকাল	Trychosanthes Palmata, Roxb.	Cucurbitaceae,	মূল, ছাল, পাতা।
১২৪	মান কচু	মান কচু	Alocasia indica, schott.	Araceae.	শিকড়, ফুল, ডগা, মূল।
১২৫	মুথা	মোথা, মুস্তক	Cyperus rotandus, Linn.	Cyperaceae.	মূল।
১২৬	মোল্লার দাঁড়ি				(সমগ্র অংশ)।
১২৭	মৌরী	মৌরী	Foeniculum vulgaris, Mill.	Umebelliferae.	ফল।
১২৮	যষ্টি মধু	যষ্টিমধু	Glycyrrhiza Tourn ex, glabra, Linn.	Fabaceae.	ছাল।
১২৯	যুগী খ্যাতা				(সমগ্র অংশ)
১৩০	রক্তচিতা	রক্তচিতা	Plumbago indica, Linn.	Plumbaginaceae.	মূল।
১৩১	রসুন	রসোন	Allium sativum Linn.	Liliaceae.	মূল।
১৩২	লজ্জাবতী লতা	লজ্জাবতী	Mimosa punica, Linn.	Leguminosae.	মূল।

১৩৩	লবঙ্গ	লবঙ্গ	Syzygium aromaticum, (Linn.) Merr Z.L.M.	Myrtaceae.	ফল।
১৩৪	লেবু (বাতাবি) গাছ	লেবু গাছ	Citrus decumana, Linn.	Rutaceae.	ফল, পাতা।
১৩৫	শটি গাছ, বন হলদি	শটি গাছ	Curcuma Zedoaria, Rose.	Zingiberaceae	মূল।
১৩৬	শতমূল	শতমূলী	asparagus racemosus, willd.	Lilaceae.	মূল।
১৩৭	শণ	শন	Crotalaria Juncea, Linn.	Fabaceae	আঁশ।
১৩৮	শরিফা	শরীফা	Annona squamosa, Linn	Annonaceae.	বীজ।
১৩৯	শিউলি	শিউলী	Nyctanthes arbodtristis, Linn.	Oleaceae.	পাতা।
১৪০	শিম	শিমী	Dolichos Lablab, Linn.	Fabaceae	পাত।
১৪১	শিমুল	শিমুল	Bombax malabaricum , Dc.	Bombacaeceae.	মূল।
১৪২	সজিনা গাছ	সজিনা	Moringa oleifera, Lamk.	Moringaceae.	ছাল, পাতা।
১৪৩	সরিষা গাছ	সরিষা	Brassica juncea, Hook.	Cruciferae.	বীজ।
১৪৪	শড়া গাছ	শ্যাওড়া গাছ	Streblus asper Linn.	Cruciferae	পাতা।

১৪৫	সোনা তেলা	সোনামুখী (?)	Cassia angustifolia, Vahl.	Fabaceae.	পাতা।
১৪৬	সোমরাইল	সোনালু, বাঁদর লাঠি	Cassia fistula, Linn.	Caesalpiniceae .	ফুল, পাতা, ফল।
১৪৭	সুপুরি গাছ	সুপুরি গাছ	Areca catechu Linn.	Palmae.	ফল।
১৪৮	হরিতকী	হরিতকী	Terminalia chebula Retz.	Combrtaceae.	ফল।
১৪৯	হলদি গাছ	হলুদ গাছ	Curcuma domestica, Val.	Zingiberaceae	মূল।
১৫০	হাতিশুঁড়ো গাছ	হাতি শুঁড়	Heliotropium indicum, Linn.	Boraginaceae.	পাতা।
১৫১	হাড় ভাঙার গাছ	হাড় জোড়া গাছ	Cissus quadrangularis Linn.	Vitaceae	(সমগ্র অংশ)।
১৫২	হ্যালাঞ্চি (হ্যালাঞ্চ)	হেলেঞ্চা, হিলমোচিকা হিঞ্চা শাক	Enlydra fluctuance, Lour.	Compositae	পাতা, ডগা।
১৫৩	ক্ষেত পটপটি	ক্ষেত পাপড়া	Oldenlandia, cryombosa, Linn.	Rubiaceae.	(সমগ্র অংশ)।
১৫৪	ক্ষুৎকুসুৎতে				(সমগ্র অংশ)।

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাংলা গ্রন্থ

ক) মূলগ্রন্থ

১. অরুণ কুমার চক্রবর্তী : চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বাঙালী কলিকাতা, ১৯৭৫।

২. অসীমা চট্টোপাধ্যায় : ভারতের বনৌষধি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৩।

৩. আবদুল গণি : ছহি বড় তাজ ছোলেমানি, ঢাকা, ১৩৮৭।

৪. আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী : মুসলমান যুগে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা, ১৯৫৮।

৫. আশরাফ উদ্দীন : ছহি আজাএব ছোলেমানি ও তাবিজাত ফালনামা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৬. আশরাফ সিদ্দিকী : লোক-সাহিত্য, ১, খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ। ঢাকা, ১৯৭৭।

৭. --- : লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮০।

৮. আস্রাব আলী : সহজ লতাপাতার গুণ, ঢাকা, ১৯৬৭,

৯. এম. আকবর আলী : ইবনে সিনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫২।

১০. এম. এ. চৌধুরী : লতাপাতার গুণ ঢাকা, ১৩৮৪।

১১. এস.এন পাণ্ডে : ফার্মাকোলজি ও মেটেরিয়া মেডিকা, কলিকাতা, ১৩৮৭।

১২. ওয়াকিল আহমদ : বাংলার লোক সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪।

১৩. কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ : ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ক.বি. ১৯৭৩।

১৪. খন্দকার মোহাম্মদ বশীরউদ্দিন : অব্যর্থ মুষ্টিযোগ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, পাবনা, ১৯৬২।

১৫. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা, ১৯৭৮।

১৬. চারু চন্দ্র ভট্টাচার্য : ব্যাধির পরাজয়, কলিকাতা, ১৩৫৬।

১৭. সৈয়দ শাহ্ ছাদত আলী	:	ছহি এলাজে লোকমানি, বা লজ্জতে দুনিয়া, ঢাকা, ১৩৩৮।
১৮. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস	:	বাংলা ভাষার অভিধান, কলিকাতা, ১৩২৩।
১৯. তানসেন	:	কামরূপী টোট্কা চিকিৎসা, ঢাকা, প্রকাশ কাল অনুক্ত।
২০. দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী	:	ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ, কলিকাতা, ১৩৬০।
২১. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	:	লোকায়ত দর্শন, কলিকাতা, ১৩৬০।
২২. নীলমনি ঘটক	:	প্রাচীন পীড়া, তাহার কারণ ও চিকিৎসা, কলিকাতা, ১৯৭২।
২৩. ফজলুর রহমান	:	সহজ টোটকা চিকিৎসা, ঢাকা, ১৩৮৪।
২৪. বড়ু চণ্ডীদাস	:	শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ৭ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৭।
২৫. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	অ্যান্টিবায়োটিক, কলিকাতা, ১৯৫৭।
২৬. মওলানা মোয়াজ্জেম আলী	:	ছহি তেলেছমাত ছোলেমানী, ঢাকা, ১৯৬৯।
২৭. মাওলানা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ	:	নাফেউল খালায়েক, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৫।
২৮. মওলানা রুহুল আমীন	:	তাবিজাতে রুহুল্লা, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮১।
২৯. মতিলাল ওঝা	:	কামরূপী মন্ত্র বা গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা, ১৯৭৯।
৩০. রমেশ কবিরাজ	:	সহজ কবিরাজি শিক্ষা, ঢাকা, প্রকাশকাল অনুক্ত।
৩১. রামাই পণ্ডিত	:	ধর্মপূজা বিধান, কলিকাতা, ১৩২৩।
৩২. শিবকালী ভট্টাচার্য	:	চিরঞ্জীব বনৌষধি, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৪।
৩৩. --	:	ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৯।
৩৪. ---	:	ঐ তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮।
৩৫. শোভারানী চক্রবর্তী	:	বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত. বিশ্বাসের ধারা, মেদিনীপুর, ১৯৭৬।
৩৬. সমরেন্দ্রনাথ সেন	:	বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮।
৩৭. হরিমোহন চৌধুরী	:	৫০-সহস্রতমিক পদ্ধতির ঔষধের প্রয়োগ বিজ্ঞান, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৮।

খ) অনুবাদ গ্রন্থ

৩৮. কেনেথ ওয়াকার, চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী, অনুবাদক, মোহাম্মদ মোর্ত্তজা, ঢাকা, ১৯৬৮।

৩৯. গোপাল ভট্ট, রসেন্দ্র সার সংগ্রহ, অনুবাদক, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন, ঢাকা, ১৯৭৯।

৪০. জেমস টেইলর কেন্ট : লেকচারস অন হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা, অনুবাদক, অজ্ঞাত, বাংলা ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৪১. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টর : পল্লী বাংলার ইতিহাস, অনুবাদক, ওসমান গণি, ঢাকা, ১৯৬৯।

৪২. ডাক্তার ইউ. এম. সামন্ত : বাইওকেমিক চিকৎসা-বিধান, অনুবাদক অজ্ঞাত, দ্বাদশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৬।

৪৩. ডাক্তার বোরিক ও ডিউই : বাইয়োকেমিক ভৈষজ্য সুধা, অনুবাদক, অজ্ঞাত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৮।

৪৪. মাধব কর : নিদান (সংস্কৃত থেকে) অনুবাদক, অজ্ঞাত, (নামপত্র ছিন্ন)।

৪৫. ক. সুশ্রুত : সুশ্রুত-সংহিতা (সংস্কৃত থেকে), অনুবাদক, অজ্ঞাত, (নামপত্র ছিন্ন)।

খ. চরক : চরক সংহিতা (সংস্কৃতি থেকে) অনুবাদক অজ্ঞাত (নামপত্র ছিন্ন)

৪৬. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, : অর্গানন, অনুবাদক, জি. দীর্ঘাঙ্গী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২।

গ) সংকলন-গ্রন্থ

৪৭. আলমগীর জলীল ও সামীয়ুল ইসলাম : লোক সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ১৭শ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৯।

৪৮. বদিউজ্জামান : লোক সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ১৩শ খণ্ড ঢাকা, ১৯৭৬।

৪৯. দীনেশ চন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ। কা.বি.- ১৯৭৩।

২. ইংরেজী গ্রন্থ

৫০. B. S. Bergersen : Pharmacology, In Nursing 13th Edition, U.S.A. 1976.

৫১. Dilling : Clinical pharmacology, 20th Edition, London.

৫২. E. Adamson Hobel & Everett Frost, : Cultural and Social Anthropology, U.S.A. 1976

৫৩. E.A. Farrington : Clinical Materia Medica 4th Edition, Re-print Delhi, 1975.

৫৪. Francois Cartier : Therapeutics of the Respiratory Organs. Indian Ist Edition, Calcutta-1960.

৫৫. Frank E. Poirier George Piecrre : In Search of ourselves U.S.A. 1974.

৫৬. Castile : North American Indians U.S.A. 1979.

৫৭. G.H. Jahr : The Homoeopathic treatment of the Diseases of Females and Infants at the Breasts. Indian 4th Edition, Calcutta, 1968.

৫৮. (Glasgo University) : Clinical Side-Room Methods U.S.A., 7th Edition 1958.

৫৯. H. Gross, Dr. : Comperative Materia Medica 2nd Edition, Re-print, Delhi, 1977.

৬০. Harvey Farrington : Homoeopathy and Homoeopathic Prescribing. U.S.A. 1955.

৬১. J.B. Chapman : Dr. Schuessler's Bio-Chemistry Indian Edition, Delhi,

৬২. J.H. Clarke : The Prescriber, 9th Edition, London, 1962.

৬৩. John Forbs & W. N. Mann : Clinical Examinations of the Patients. London, 1950.

৬৪. Kenneht Lemmon : The Golden Age of Plant Hunters London, 1967.

৬৫. M.A. Hanifi : A Survey of Muslim Institutions and Culture Re-print, Lahore, 1969.

৬৬. (M. Bhattacharyya & Co.) : The Pharmacentists Manual or Pharmacoposia, 10th Edition, Calcutta, 1944.

৬৭. Md. Zubayer Siddiqi : Studies In Arabic & Persian Medical Literature, Calcutta University, 1959.

৬৮. O.P. Jaggi : All About Allopathy, Homoeopathy, Ayurveda, Unani & Nature Cure (AAHAU), Delhi, 1976.

৬৯. — : Folk Medicine, Delhi, 1973,

৭০. — : Indian System of Medicine, Delhi, 1973.

৭১. (People's Republic of China) : Acupunchure Anaesthesia, Peking. 1972.

৭২. Robert B.Taylor : Introduction to Cultural Anthropology, Boston, 1973.

৭৩. Samuel Hahnemann : The Chronic Diseases (Theoritical Part) Delhi, 1978.

৭৪. Shaheb Lal Srivastava : Folk Culture and Oral Tradition, Delhi, 1974.

৭৫. Uday Chand Dutta : The Materia Medica of the Hindus, Revised Edition, Calcutta, 1922

৩. পত্র–পত্রিকা

ক) বাংলা পত্র-পত্রিকা

১. অজ্ঞাত নাম : ঔষধি প্রকৃতির অবদান, বিচিত্রা, ৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, ১৯৭৪।

২. আহমদ নূরে আলম : দেশীয় চিকিৎসা, বিচিত্রা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, ১৯৭৮।

৩. ইফতেখারুল ইসলাম : বাংলাদেশের বনৌষধি, বিচিত্রা, ৪২শ সংখ্যা।

৪. এস.এম. সামীয়ুল ইসলাম : ফাইকরালী ও ঝাড়ফুঁক, পূর্বাচল, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৮১।

৫. — : লোক-বিশ্বাস একদিকে আইন অন্য দিকে সুষ্ঠ জীবন–যাত্রার প্রতীক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২৩শ বর্ষ, ২য়–৩য় সংখ্যা, ১৩৮৫।

৬. খগেন্দ্রনাথ বসু–অনুদিত : আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ, হ্যানিম্যান, ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৪০।

৭. মতিউর রহমান ভূঁইয়া : দেশজ চিকিৎসা : বনজ ঔষধ, সচিত্র বাংলাদেশ, ১মবর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৯৮০।

৮. মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মসরুর ইসলামাবাদী : তিব্বে আরবীয় ইতিহাস, আল–হাকিম, জানুয়ারী, ১৯৬৭।

৯. জগলুল আলম : ঔষধ ব্যবসা, বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ, ২৩তম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৭৬।

১০. ফারুখ ফয়সল : ঔষধ সাম্রাজ্যবাদ : বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ, ২৩তম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৬।

১১. মনু ইসলাম : বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প, সচিত্র বাংলাদেশ, ১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮০।

১২. ড. আবদুল মান্নান : প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুল্মলতাজাত ঔষধ, স্বাস্থ্য, সাময়িকী, বর্ষ-০, সংখ্যা-৯, জানুয়ারী, ১৯৮১।

১৩. ড. এ.কে.আজাদ চৌধুরী : ঔষধ সংকট নিরসনে লোকায়ত ঔষধের ভূমিকা, ফার্মেসী বিভাগ স্মরণিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

১৪. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশী লোক-বিশ্বাস, বেতার বাংলা, মার্চ, ১ম পক্ষ, ১৯৮১।

১৫. — : লোক-চিকিৎসার বই, বই, ১৬শ বর্ষ, ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৯৮১।

১৬. সতীশ চন্দ্র সরকার : হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ-পরীক্ষা, হ্যানিম্যান, ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

১৭. হাকিম হাফেজ আজিজুল ইসলাম : ইউনানি চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও এর কার্যকারিতা, স্বাস্থ্য সাময়িকী, জানুয়ারী, ১৯৮১।

১৮. হরিমোহন চৌধুরী : হোমিওপ্যাথি তথা অর্গ্যাননের ক্রম-বিকাশ, হোমিও সমীক্ষা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৮০।

খ) ইংরেজী পত্র-পত্রিকা

১৯. Anthony R. Peile : Colours that Cure, Hemisphere, Vol. 23. No.4. July-August, 1979.

২০. Edward Rubenstein : Diseases Caused By Imperial Communication Among Cells. The Scientific American. Vol.242. No.3. March, 1980.

২১. Eric J. Trimmer : Medical Folkore and Quakery, Folklore, vol. 16. Auumn, U.S.A. 1976.

২২. George M. Foster : Relationship Between Spanish And American-Spanish Folk Medicine. The Journal of American Folklore, Vol, 66. U.S.A. 1933.

২৩. Hakim Mohammad Sayid : Ours In trust Only, Hemisphere, vol, 23 No. 4, July-August, 1979.

২৪.	Harold A. Gould	:	The Implications of Technological Change for Folk and Scientific Medicine, The American Anthropologist Vol. 59, No, 34, U. S. A. 1937
২৫.	Ho Peng Yoke	:	Traditional Chinese Medicine Up To Date, Hemisphere Vol. 23, No.4. July-August, 1979.
২৬.	Janice Reid	:	Health As Harmony Sickness As Conflict, Hemisphere, vol, 23, No, 4, July-August, 1979
২৭.	Jean Mulholland	:	Traditional Medicine In Thailand, Hemisphere, vol. 23, No.4, July-August, 1979.
28.	Lorna Cartwright	:	Health From Herbs, Hemisphere, Vol, 23, No, 4. July-Auhust, 1979.
29.	Margaret Bainbridge	:	Turkish Folk Medicine, Hemisphere, Vol. 23. No. 4, July-August, 1979.
30.	(People's Republic of China)	:	Medical Care For China's Millions, China Reconstructs Supplement, October, 1979.

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১৮৮	৩য়, ১৯	রক্তামশয়	রক্তামাশায়
১৮৯	৩য়	সেই রস তৈরী করে	এ-অংশ বাদ যাবে
১৯২	৫ম (শেষ দিক থেকে)	দু' তিন-চার বার	তিন-চার বার
১৯৮	হাগড়া-র শেষ	স্বাস্থ্য	বাহ্য
২০৭	২য়	মন্ত্রণা	যন্ত্রণা
২১১	(শিরোনাম ও বর্ণনায়)	অশখ-এর	অশখের
২৩০	২য়	ছট্‌কে	চট্‌কে
২৩১	২য় (আকছটির বর্ণনায়)	স্নানের	স্নানের
২৩৪	২য় (অর্জুনের বর্ণনায়)	সেঁকে	ছেচে
২৫৩	৭৬-সংখ্যক বিবরণে	জানা	নানা
২৫৫	তেলাকুচা-প্রসঙ্গে	সংঙ্গে	সঙ্গে
২৫৬	অনন্তমূল-প্রসঙ্গে	রোগরোগ্য	রোগারোগ্য
২৫৭	হরিতকীর বর্ণনায়	বেঁধে দিলে সঙ্গে	বেঁধে দিলে সঙ্গে সঙ্গে
২৬০	কলমিশাকের বর্ণনায়	ভরূ	ভ্রূ
২৬১	শেজির বর্ণনায়	শ্লষ্মা	শ্লেষ্মা
২৬৮	৯৭ সংখ্যক আলোচনায়	দুধের প্রদাহ	দুধের প্রবাহ
২৭০	৩য় (আকন্দ-প্রসঙ্গে)	অতপর	অতঃপর

উলট কম্বলের চারা

আদা গাছ

বিরোটি গাছ

আকন্দ গাছ

পাল্টে গাছ

শতমূল এর চারা

বেতড়ক লতা

রাঙা জট / শিবজটা

লজ্জাবর্তী লতা

পেপলশী গাছ

কালমেঘী গাছ

শ্বেতচন্দন গাছ

গেন্দা ফুলের গাছ

রামতুলসী গাছ

বহেড়া গাছ

বাসক গাছ

ডুমুর গাছের চারা

পুঁইশাক গাছ

আকান্দি লতা

বড়ইচা গাছ

মিছরিদ্রানা গাছ

গনিয়ারী গাছ

ডুমুর গাছ

পেঁপে গাছ

পেপলির ছোট লতা

লাল বিষোরি গাছ

কাঠ মল্লিকা গাছ

সোমরাইল / বানর লাঠি গাছ

রক্তজবা গাছ

শ্বেত ধুত্‌রা গাছ

করমচা গাছ

লবঙ্গ লতিকা গাছ

ছোট চান্দা / ইচা গাছ

হাড় ভাঙ্গা লতা

হাগড়া গাছ

মানকচু গাছ

মাঁদারের চারা

বেল গাছ

তেলা কুচা লতা

বিশল্যকরণী গাছ

পাথর কুচি গাছ

খেজুরের গাছ

শটি / বাও আদা গাছ

ঘোড়শ / গুলঞ্চ গাছ

বেড়েলা গাছ

বিষহরি গাছ

গাই গোয়ালা লতা

কাল বিষোরি গাছ

ঝাঁপি ট্যাপারী গাছ

নিসিন্দা গাছ

পঞ্চমুখী রক্তজবা গাছ

ঢাকি ভেন্না কচা গাছ

কাঁটা কচু গাছ

ভেন্না গাছ

মুক্তা ঝুরি গাছ

নিমভূত গাছ

দাদরাজ গাছ

বিষকচু গাছ

ঢেকি লতা

ভূতরাজ / ভূত আদা গাছ

হলুদ গাছ

কনক ধুত্‌রা গাছ

ভূঁই কুম্‌ড়ো গাছ

হাড়ভাঙ্গা লতা গাছ (পঞ্চপত্র)